আরবী-বাংলা অনুবাদ

আকিদাতুত ত্বহাবী

মূল

ইমাম আবু জা'ফর আত-ত্বহাবী রাহি.

দরসুল আকিদা

সংকলক

আরিফুল ইসলাম

হাদিস-তাখাসসুস ফিল ফিকহ;

দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

লেকচারার: আক্বিদা-ফিক্বহ ডিপার্টমেন্ট

Islamic Online Madrasah (IOM)

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা

মুফতি যুবায়ের আহমদ

প্রিন্সিপাল: ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক দাওয়াহ এবং IOM

মুগদা, মান্ডা শেষ মাথা, ঢাকা-1214

বই: দরসুল আকিদা

¤ সংকলক: আরিফুল ইসলাম

[Email. arifulislam39520@gmail.com]

¤ প্রচ্ছদ: জহিরুল ইসলাম সাদী

¤ প্রথম প্রকাশ: জুন 2021

¤ গ্রন্থস্বত্ব © সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; তবে কোনরূপ পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন ব্যতিত; লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে; দাওয়াহ'র জন্য যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবেন।

¤ পরিবেশক: [অনলাইন] Taqwaah Shop -তাক্বওয়াহ্ শপ

[www.facebook.com/taqwaahshop/

০১৭৬২৩১৬৮৬৭

¤ পরিবেশক: [অফলাইন] ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা [IOM]

মুগদা, মান্ডা শেষ মাথা, ঢাকা-1214

* ইসলামিয়া লাইব্রেরী; 30 নং মাদ্রাসা মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। এছাড়াও দেশের অভিজাত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে।

¤ মূল্য: 520 টাকা

এক নজরে দরসুল আকিদা

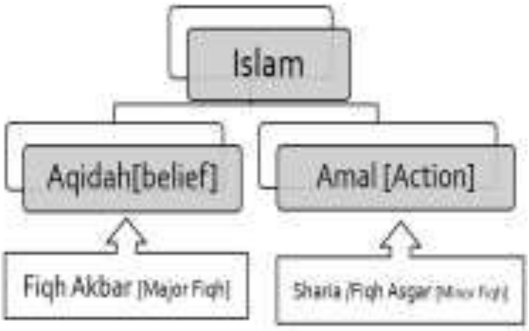

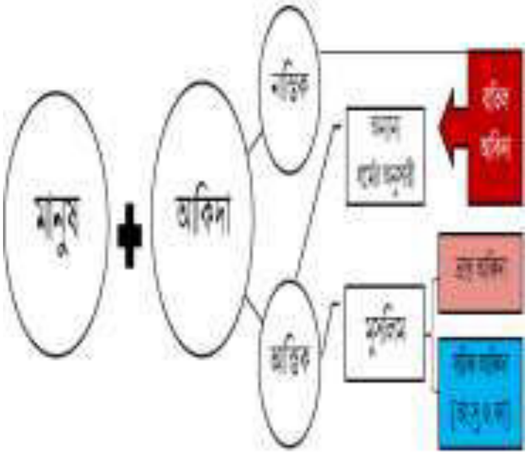

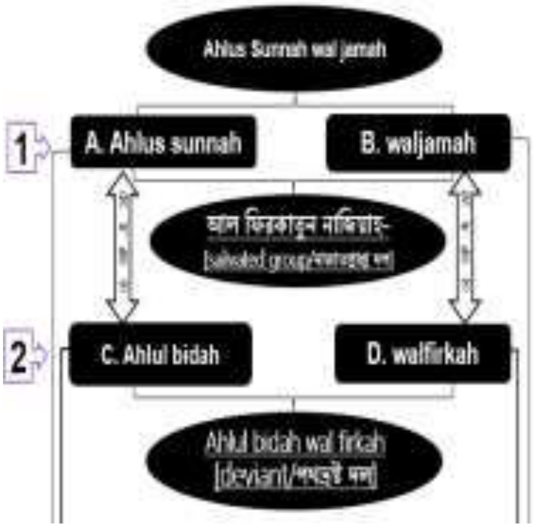

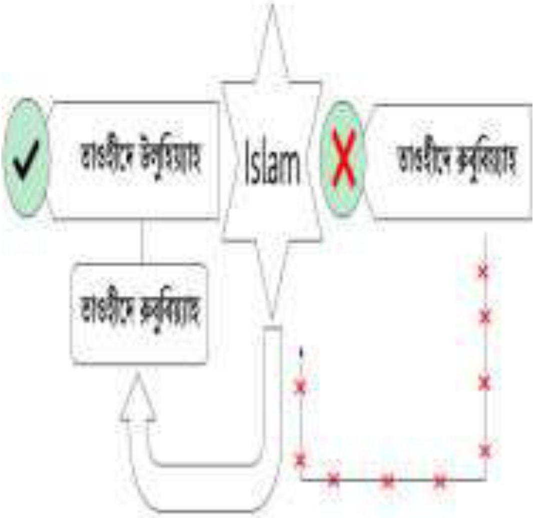

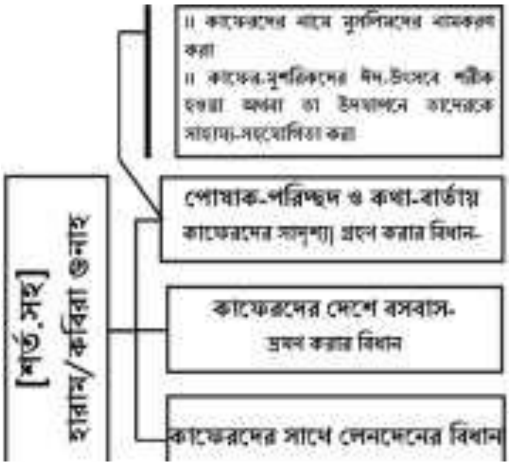

ইসলামি আক্বিদায় Democracy [গণতন্ত্র]

ইসলামী আক্বিদায়; পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

¤ [আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী] ভূমিকা (مقدمة)........................... 18

দরসুল আকিদা

- ইসলামী আক্বিদার সংজ্ঞা- বিষয়বস্তু এবং গুরুত্ব............................ 20
- ইসলামী আক্বিদার কিছু নাম-ইতিহাস ও আক্বিদার উৎস..................32
- আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয়...................................... 39

التوحيد

¤ [আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী] তাওহীদ... 46

দরসুল আকিদা

- তাওহীদ এর পরিচয় এবং তাওহীদের গুরুত্ব..................................50
- তাওহীদের প্রকারভেদ- তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ এর পরিচয়-দলীল........53
- তাওহীদের উলুহিয়্যাহ এর পরিচয়-দলীল......................................58
- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত-এর পরিচয়-দলীল........................61
- সিফাত সমূহের প্রকার...63
- [আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে]-
  আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূলনীতী.......................................64
- [সিফাতের ক্ষেত্রে] আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পন্থা ও দলীল......66
- আল্লাহর একটি সিফাতের উদাহরণ...80
- তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ; পরিচয়-দলীল...83

কালিমাতুত তাওহীদ

- কালিমার রুকন ও ফযীলত...85
- কালিমার শর্ত...89

﴿الولاءُ والبراءُ في الإسلام﴾

‘আল ওয়ালা’ [বন্ধুত্ব] ‘ওয়াল বারা’ [শত্রুতা]…………………..…..98

- ‘আল ওয়ালা’ ‘ওয়াল বারা’- পরিচয়..99
- কুরআন-সুন্নাহে আল-ওয়ালা ওয়াল বারা..................................100
- ইসলামী আক্বিদায়; ‘ওয়াল বারা’র গুরুত্ব..................................102
- ‘আল বারার’ আহকাম...103
    - কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার বিধান...................................104
    - কাফেরদের উৎসবে অংশগ্রহণ/অভিবাধান জানানোর বিধান.......105
    - কাফেরদের সভ্যতার সুনাম করার বিধান...............................107
    - কাফেরদের নামে; মুসলিমদের নামকরণ করার বিধান...............107
    - কাফেরদের জন্য দোআ করার বিধান....................................108
    - অমুসলিমকে সালাম দেয়ার বিধান...108
    - অমুসলিমদের দেশে বসবাস/নাগরিগত্ব/ভ্রমন করার বিধান..........109
- আল-ওয়ালা এবং আল-বারার মানদন্ডে মানুষের শ্রেণী বিভক্তি........115

ইসলামী আকিদায় ন্যাশনালিজম/জাতীয়তাবাদ…………...…119

- জাতীয়তাবাদের পরিচয়..120
- জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রকার..121
- জাতীয়তাবাদের অসারতা...123
- ইসলামের দৃস্টিতে জাতীয়তাবাদ...127
- ইসলামী আক্বিদায় জাতীয়তাবাদ...130
- জাতীয়তাবাদীদের পরিণতি...132
- ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি..136
- জাতীয়তাবাদ দূরীকরনে বিশ্বনবী সা. অবদান...............................139

¤ [আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী] শিরিক.................................... 143

দরসুল আকিদা

- শিরক-এর পরিচয়...144
- কুরআন-সুন্নাহে শিরকের পরিণতি..145
- শিরকের প্রকার এবং হুকুম...149

শিরকে আকবার

- শিরকে আকবারের পরিচিতি এবং প্রকারভেদ...............................149
- শিরিক ফির-রুবুবিয়্যাহ‘র উদাহরণ-১..153
- শিরিক ফির-রুবুবিয়্যাহ‘র উদাহরণ-২..158

ইসলামি আক্বিদায় Democracy [গণতন্ত্র]

- Definition of Democracy- গণতন্ত্রের পরিচয়.........................160
- ইসলামি আকিদায় গণতন্ত্র...162
- ইসলাম ও গণতন্ত্রের (আকিদাগত) পার্থক্য.................................167
- ইসলাম ও গণতন্ত্রের শাষক নির্বাচন পক্রিয়া...............................168
- ভোট বনাম পরামর্শ- পার্থক্য...172
- বিভিন্ন স্কলারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্র..173
- পরিশিষ্ট..176
- **শিরিক ফিল-উলুহিয়্যাহ‘র পরিচয় এবং দলীল...............178**
- **শিরিক ফিল-উলুহিয়্যাহ‘র ক্যাটাগরী [প্রকার]................179**

ইসলামী আক্বিদায় অসিলা

- অসিলার পরিচয়...190
- অসিলার হুকুম...190
- অসিলার প্রকার এবং প্রকারসমূহের হুকুম.................................191
- **একনজরে শিরিক ফিল উলুহিয়্যাহ‘র কিছু উদাহরণ.............218**

شرك في الأسماء والصفات
শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত
শিরক ফিল আসমা ওয়াস সিফাতের উদাহরণ

- 'ইলমুল গাইব' সম্পৃক্ত আক্বিদা..223
- 'হাযির-নাযির' সম্পৃক্ত আক্বিদা..224

শিরকে আসগার

- শিরকে আসগারের পরিচয় এবং হুকুম...................... 239
- শিরকে আকবার এবং শিরকে আসগারের মধ্যে পার্থক্য..................241
- শিরকে আসগারের প্রকার..242
- কথা সম্পৃক্ত; শিরকে আসগার...242
- কাজ সম্পৃক্ত; শিরকে আসগার...245
- শিরকে খফী [গোপন] শিরক..264

خَتم النُّبُوَّة

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** খতমে নুবুয়্যাত......................................265

القران كلام الله - ليس بمخلوق

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** আল-কুরআন আল্লাহর কালাম বা কথা-
মাখলুক [সৃষ্ট] নয়...................... 267

দরসুল আকিদা

- আল-কোরআনের পরিচয়...269
- আল-কোরআনের বৈশিষ্ঠ্য...270

صفات الله. ليست كصفات البشر

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** আল্লাহর গুণ; মানুষের গুণের মতো নয়.........281

رؤْية أهل الجنّة ربهم بغير إحاطة

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** জান্নাতে আয়ত্বহীন ভাবে আল্লাহকে দেখা.......281

التكلّم فى أمور الدين , بغيرعلم

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** ইলম [অহীর জ্ঞান] ব্যাতিত-
দ্বীন সম্পৃক্ত বিষয়াবালী; নিজ বুঝ অনুসারে ব্যাখ্যা করা।......................282

الإسراء والمعراج له صلى الله عليه وسلم باليقظة

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** জাগ্রত, স্ব-শরীরে নবী সা. এর ইসরা-মিরাজ.........284

الحوض

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** হাউয..284

الشفاعة

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** শাফায়াত.................................... 284

الميثاق الذى أخذه الله من ادم وذرّيَّتة

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদম-
এবং তার সন্তানদের- থেকে নেওয়া মী-ছাক (দৃঢ় অঙ্গীকার)........284

القضاء والقدر

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** কাযা-ক্বাদর.................................. 285

দরসুল আকিদা

- ক্বাযা এবং তাক্বদীরের পরিচয়...288
- তাক্বদীরের হুকুম..289
- তাকদীরের তাৎপর্য...290
- তাকদীরের রুকন...293
- তাক্বদীর লিপিবদ্ধের পাঁচটি পর্যায়..296

اللوح المحفوظ والقلم

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** লাওহে মাহফূজ এবং কলম.....................304

العرش والكرسىُّ

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** আরশ-কুরসী...305

اتخذ الله إبراهيم خليلا

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক-
ইবরাহীম আ. খলীল [অন্তরঙ্গ] বন্ধু হিসাবে গ্রহণ.......................306

الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** ফিরিশতাগণ, নাবীগণ-
এবং আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান................306

দরসুল আকিদা

- ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান...307

ইসলামী আক্বিদায়; পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ

- পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে ইসলামি আক্বিদা.................................312
- তাওরাত- ইনজিল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ (কুরআন থেকে).............314
- তাওরাত- ইনজিল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ (বাইবেল থেকে) 316
- কুরআন দিয়ে বর্তমান ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা দাবি!! 321
- তাওরাত-ইনজিলের শুদ্ধতা যাচাইয়ের মানদন্ড...........................322
- বর্তমান তাওরাত-ইনজিলের ব্যাপারে একটি মূলনীতি....................323

أهل القبلة مسلمون مؤمنون

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** কিবলার অনুসারীগণ মুসলিম ও মুমিন......325

أهل الكبائر

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী] যারা কবিরা গুনাহে জড়িত**......................326

দরসুল আকিদা

তাকফীর

- তাকফীর এর পরিচয়..328
- তাকফীরের শর্ত..332
- তাকফীরের প্রতিবন্ধক..332

▪ ইসলামে তাকফীরী সম্প্রদায়..355
▪ খারেজীদের কিছু বিভ্রান্তি..336

কুফর

▪ কুফরের পরিচয়...338
▪ কুফরের প্রকারভেদ..338
▪ কুফরে আকবার রূপ/প্রকাশ...339
▪ কুফরে আসগার [ছোট কুফুরী] পরিচয়; উদাহরণ..........................344

মডার্ণ কুফর

▪ Definition of Secularism [সংজ্ঞা] 347
▪ সেক্যুলারিজমের ভিত্তি..350
▪ History of Secularism...354
▪ ইসলামী আক্বিদায় সেক্যুলারিজম...357
▪ পরিশিষ্ট...359

নিফাক্ব

▪ নিফাকের পরিচয়...362
▪ নিফাকের বিষয়ে সালাফদের এওয়ারনেস.......................................362
▪ নিফাকীর প্রকারভেদ...366
▪ বড় নিফাকী ও ছোট নিফাকীর মধ্যে পার্থক্য...................................369
▪ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকদের কিছু চরিত্র............................371

الإيمان قول وقلب

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** জবানের এবং অন্তরের-
স্বীকারোক্তির নাম ঈমান...373

দরসুল আকিদা

ঈমান

- ইমানের পরিচয়..376
- ইমান-ইসলামের সম্পর্ক 378
- ইমান কি বাড়ে/কমে? 379
- ঈমান ভঙ্গের কারণ...381

الاجتناب عن الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ.

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া-
এবং জামা'আতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকা...........386

দরসুল আকিদা

- ইফতিরাক [Confliction] পরিচিতি-পরিণাম..............................388
- ইফতিরাকের কতিপয় উদাহরণ.. 391
- ইখতিলাফ [Difference of opinion and thought] পরিচিতি.........394
- ইখতিলাফ [মতভেদ] এবং ইফতিরাক [বিভক্তি] এর পার্থক্য........395
- ফিক্বহী মাযহাবের বিভিন্নতা বনাম ইফতিরাক..............................396
- হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধগুলোর প্রকৃত কারণ.......................400

المسح على الخفين فى السفر و الحضر

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** সফর এবং মুকীম অবস্থায় মোজার উপর মাসেহ.....407

17- আকিদাতুত্ব ত্বহাবী

الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** হজ্ব-জিহাদ কিয়ামাত পর্যযন্ত অব্যাহত.......... 407

عذاب القبر ونعيمه

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** কবরের শাস্তি ও সুখ....................................408

الإيمان باليوم الاخر

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস............................ 408

الاستطاعة تكون مع الفعل

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** সামর্থ্য; কর্মের সাথে হয়ে থাকে....................409

استجابة الله الدعاء

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** আল্লাহ; বান্দার দোআ কবুল করেন.................411

الثناء على الصحابة رض

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** সাহাবীদের প্রশংসা......................................411

فضيلة الأنبياء على الاولياء

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** আম্বিয়াদের শ্রেষ্ঠত্ব ওলীদের উপর................413

الإيمان بأشراط الساعة

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** কিয়ামাতের আলামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন........413

দরসুল আকিদা

- কিয়ামাতের আলামত সমূহের প্রকার..415
- বড় আলামত সমূহ..415
- ছোট আলামত সমূহ...416

كذب الكاهن والعرّاف

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** গণক ও জ্যোতিষীকে সত্য বলে গ্রহণ না করা...419

الجماعة حق. والفرقة زيغٌ

¤ **[আক্বিদাতুত্ব ত্বহাবী]** জামাআত হক্ব (সত্য) এবং বিচ্ছিন্নতা ভ্রষ্টতা......419

مقدمة [ভূমিকা]

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

''বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব।''

قَالَ الْعَلَّامَةُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَبُو جَعْفَرٍ الْوَرَّاقُ الطَّحَاوِيُّ -بِمِصْرَ- رَحِمَهُ اللَّهُ:

''প্রখ্যাত আলেম, হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু জাফর ওয়াররাক আত-ত্বহাবী রহ. মিসরে অবস্থানকালে বলেছিলেন,

هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ،

'এটা [এই বইটি] হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা বা দ্বীনী বিশ্বাস; সম্পর্কিত।

عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

''[যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে] ফুকাহায়ে মিল্লাত আবু হানীফা আন-নুমান ইবনে সাবেত আল-কুফী, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী এবং আবু আব্দুল্লাহ ইবন আল-হাসান আশ-শায়বানী রহ.-প্রমুখ ইমামদের মাযহাব [অনুসৃত নীতি] অনুসারে এবং তারা দ্বীন-ধর্মের যেসব মূলনীতিতে যে আকীদা পোষণ করতেন এবং সে সব নীতি অনুসারে; তারা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের মনোনীত দ্বীন-ইসলাম অনুসরণ করতেন সে অনুসারে''

দরসুল আকিদা

Introduction to Islamic Aqidah

- ইসলামী আক্বিদার পরিচয়- বিষয়বস্তু এবং গুরুত্ব।
- ইসলামী আক্বিদার কিছু নাম-ইতিহাস ও আক্বিদার উৎস।
- আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয়।

আক্বিদার পরিচয়; বিষয়বস্তু এবং গুরুত্ব

আক্বিদার শাব্দিক পরিচয়

كلمة "عقيدة" مأخوذة من العقد والربط والشدّ بقوة، ومنه الإحكام والإبرام، والتماسك والمراصة.

(العقيدة) আক্বিদা শব্দটি একটি আরবি শব্দ। (ع-ق-د) আইন, ক্বাফ ও দাল মূলধাতু থেকে গৃহীত বা উৎপন্ন। এর শাব্দিক অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা বা শক্ত হওয়া ইত্যাদি।[1]

قال الله تبارك وتعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ [المائدة: 89]

সাধারণ অর্থে আক্বিদার পরিচয়

العقيدة الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لمعتقده

আক্বিদা ঐ বিধান বা নির্দেশকে বলা হয় যা সন্দেহের অবকাশ ব্যতীত মানুষ গ্রহণ করে।[2]

هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريب، ولا يخالطها شك-فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة.

এমন কিছু বিষয়াবালী যার উপর মানুষ তার অন্তর দিয়ে দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস রাখে। যেখানে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না সেটাকেই আক্বিদা বলে। যদি এই পর্যায়ে তার অন্তর না পৌছে তাহলে তাকে আক্বিদা বলা হবে না অর্থাৎ মানুষ যে বিশ্বাসের সাথে নিজের অন্তরকে বেঁধে ফেলে এবং সন্দেহাতীতভবে সে তা বিশ্বাস করে সেটাই হচ্ছে তার আক্বিদা।[3]

---

[1] আল ওয়াজিয ফি আকিদাতিস সালাফ পৃ 24

[2] মু`জামুল ওয়াসীত

[3] আল-ওয়াজিয ফি আকিদাতিত সালাফ পৃ. 26

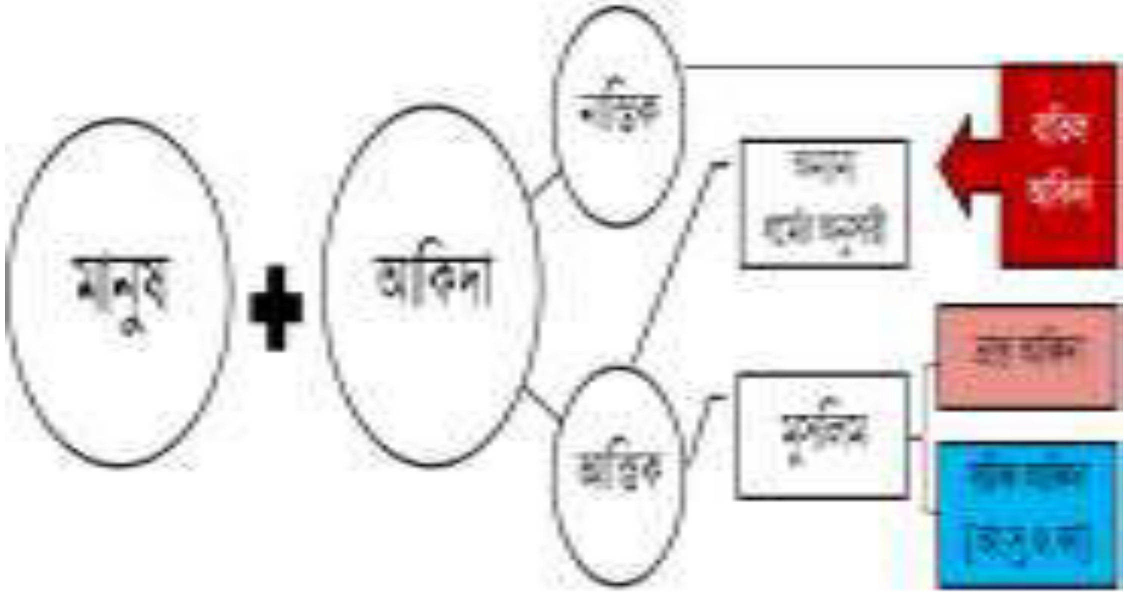

পারিভাষিক অর্থে ইসলামী আক্বিদার পরিচয়

শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামি আক্বিদা হচ্ছে-

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وبما جاء في القرآن الكريم، والسنة الصحيحة من أصول الدين ، وما أجمع عليه السلف الصالح-

`মহান আল্লাহ তাআলা (ইবাদাত-প্রতিপালন- গুণ- সিফাত), তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস তথা মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় বিষয় ও তাকদীরের ভাল-মন্দ- **প্রতি যা অদৃশ্য বিষয়াবালী সম্পৃক্ত এবং যা আল-কুরআনুল হাকিম ও সহিহ সুন্নাহে দীনের সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি;** অন্তরের সুদৃঢ় মজবুত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের নাম আকিদা।[4]

---

[4] আল-ওয়াজিয ফি আকিদাতিত সালাফ পৃ. 26

والعقيدة الإسلامية: إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله ديناً لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان

বি.দ্র- যখন `ইসলামী আক্বিদা বলা হবে তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য আক্বিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-কেননা এটিই আল্লাহ সুব. কর্তৃক মনোনিত দ্বীন-ইসলাম। এইসব আক্বিদাগুলিই অনুসরণীয় তিন যুগ তথা সাহাবী, তাবঈ-তাবে তাবঈন রাযি. দের।[5]

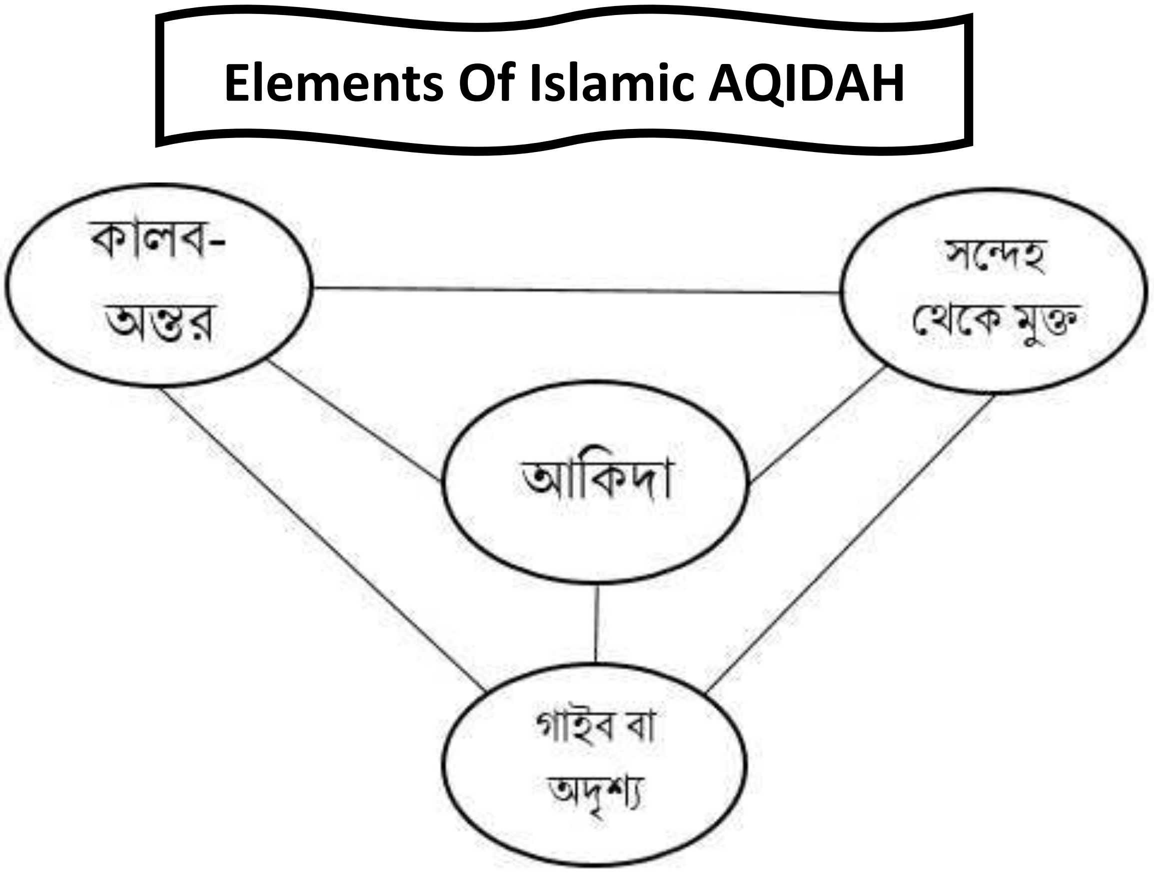

<u>সন্দেহ থেকে মুক্ত</u>

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

5 আদ-দুরারুসসানিয়্যাহ পৃ-৪

23- দরসুল আকিদা

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।[6]

গাইব বা অদৃশ্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।[7]

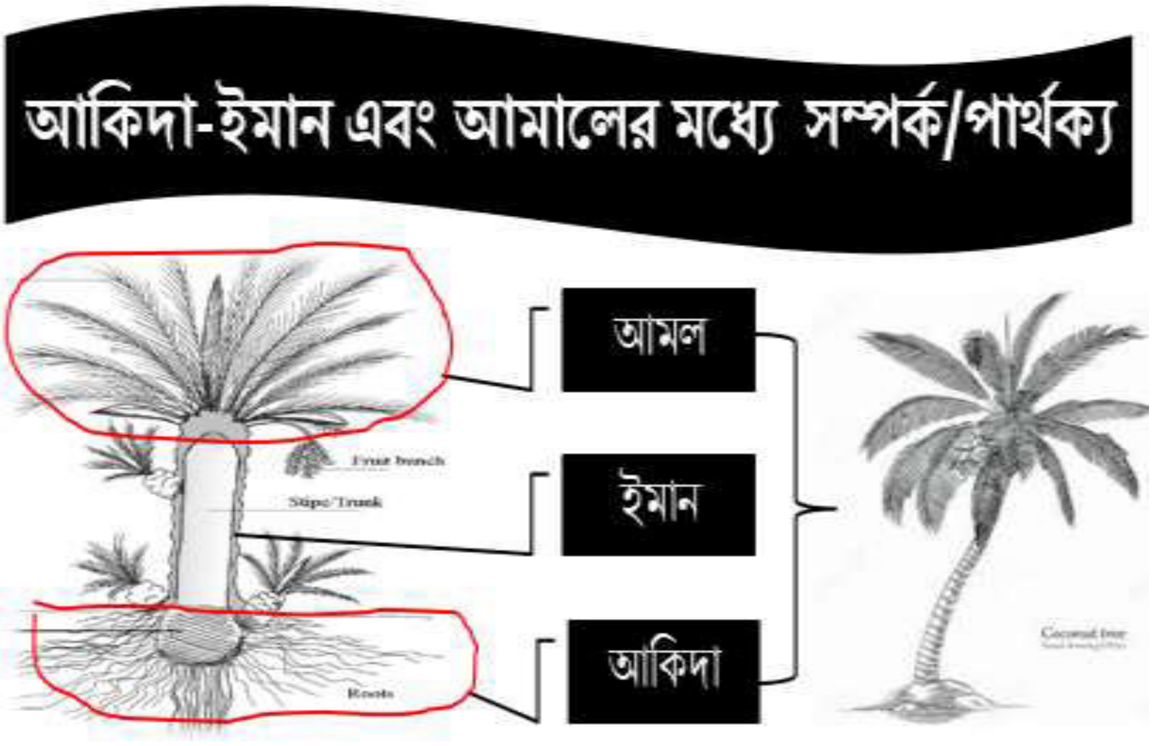

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء

তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেনঃ পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত।

---

[6] হুজুরাত-১৫

[7] বাকারা-২

ইলমুল আক্বিদার আলোচ্য বিষয়

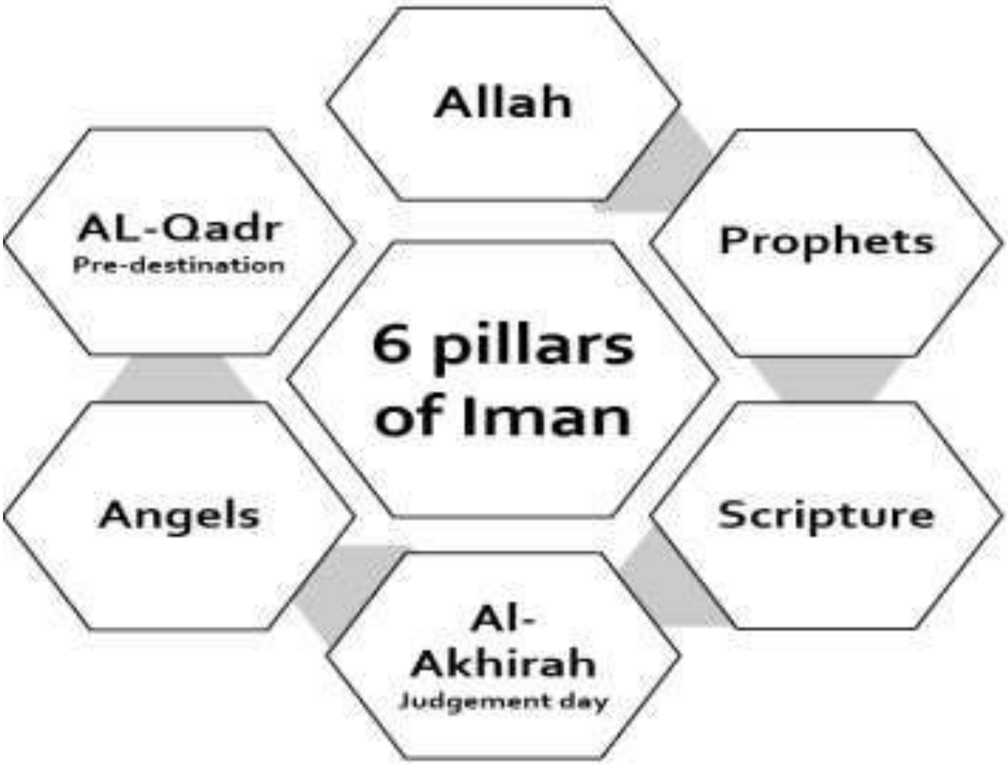

দলীল

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"[৪]

ইসলামী আকীদার গুরুত্ব

ইসলামী আকীদার পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি

[৪] (সূরা বাকারা ২৮৫)

১. বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব

❑ **আক্বিদা-ঈমান হচ্ছে দ্বীনের মূল এবং সকল নবীদের দাওয়াহ`র ভিত্তি।**

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون

"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।" [9]

❑ **জাগতিক সাফল্য ও আখিরাতের মুক্তির মূল ভিত্তি বিশুদ্ধ ঈমান।**

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।"[10]

ولَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।[11]

❑ **আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত শিরক ও কুফরমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান।**

কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে এ কথা বলা হয়েছে-

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।[12]

---

[9] আম্বিয়া. ২৫

[10] নাহল-৯৭

[11]আরাফ-৯৬

[12] বানী-ঈসরাঈল-১৯

❑ আল্লাহর বন্ধুত্ব ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম ধাপই বিশুদ্ধ ঈমান।

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে।[13]

২- ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানার গুরুত্ব

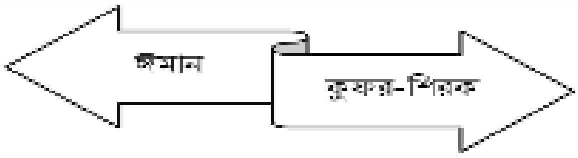

ঈমান অর্জন করা যেমন জরুরী সেরূপভাবে তা সংরক্ষণ করাও জরুরী। রাসূল সা. আসার পূর্বেকার যুগের অনেক নবীর উম্মাত তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান অর্জন করেছে কিন্তু তারা ঈমান সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা ঈমান বিধ্বংসী বিষয়াবলি মার্কিং করতে না পারার কারণে নিজেদের ঈমান সংরক্ষণ করতে পারে নি। উদাহরনস্বরূপ; কুরআন কারীমের ইহূদী, খৃস্টান, আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরা সকলেই নিজদেরকে খাঁটি মুমিন বলেই দাবি ও বিশ্বাস করত। তারা মুহাম্মাদ (সা) দ্বীনকেই বিভ্রান্তি ও পুর্বপুরুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত খাঁটি ধর্মের ব্যতিক্রম বলে মনে করত। অথচ তারা সকলেই ঈমান বিনষ্টকারী শিরক, কুফর ইত্যাদির মধ্যে লিপ্ত ছিল। তারা অনেক নেক কর্ম করত এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করত। আজকের বিশ্বেও ইয়াহুদি-খৃষ্টানরা তারা ইবরাহীম আ. এবং মুসা-যীশু (ইসা) আর. এর উত্তরসূরী হিসাবে ক্লাইম করছে অথচ তারা শিরকে লিপ্ত যা ঈমান-বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে বা শিরক কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থায় এ সকল কর্ম কখনোই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[13] ইউনুস ৬২

❑ সমস্ত আম্বিয়া আ. দেরকে `ঈমান এবং তাগুত` এই দুটি কর্মসূচী নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছি-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।[14]

❑ শিরিক আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না-এবং চিরকাল জাহান্নাম অবধারিত।

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।[15]

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুব. বলেন-

مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

'তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বাণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।'[16]

---

[14] নাহল ৩৬

[15] নিসা:৪৮

[16] মায়েদা ৭২

❑ কুফর সমস্ত সাওয়াব এবং নেক আমলকে ভস্ম করে দেয়

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[17]

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আপনি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।[18]

৩. বিভ্রান্তিকর আক্বিদাসমূহ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন-আমার উম্মত তা'ই করবে যা করেছে বনী ইসরাঈলের লোকেরা। এক জুতা অপর জুতার সমান হওয়ার মত। এমনকি যদি ওদের মাঝে কেউ মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জিনা করে থাকে, তাহলে এই উম্মতের মাঝেও এরকম ব্যক্তি হবে যে একাজটি করবে

وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي

''আর নিশ্চয় বনী ইসরাঈল ছিল ৭২ দলে বিভক্ত। আর আমার উম্মত হবে ৭৩ দলে বিভক্ত। এই সব দলই হবে জাহান্নামী একটি দল ছাড়া। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন-সেই দলটি কারা? নবীজী সাঃ বললেন-যারা আমার ও আমার সাহাবাদের মত ও পথ অনুসরণ করবে।''[19]

অবশ্য যারা জাহান্নামে যাবে; তারা কাফের নয়; বরং আক্বিদার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকার কারণে পাপী হয়েছে- যার ফলে পাপের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে; হ্যাঁ যদি ত্রুটিযুক্ত আকিদা কুফর-বা শিরক পর্যায়ে চলে যায় তাহলে ভিন্ন কথা-

---

[17] মায়েদা: ৫

[18] যুমার ৬৫

[19] সুনানে তিরমিযী, ২৬৪১

তাই আমাদের সঠিক আকিদা বিশ্বাষ যা ছিল নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. পোষন করেছিলেন- তা জানা সকল মুসলমানদের অত্যাবশক।

সালাফদের নিকট আক্বিদার গুরুত্ব

সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি। মহানবী ﷺ নবী হবার পরে মক্কায় সুদীর্ঘ তের বছর থাকাকালীন লোকদের সালাত ও যাকাত, রোযা ও হাজ্জ্ব এবং জিহাদ প্রভৃতি পালন করার আর সুদ ও ব্যাভিচার এবং মদ ও জুয়া ত্যাগ করার নির্দেশ দেবার আগেই আক্বিদাহ বিশুদ্ধ করার এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করার তাগিদ দিতে থাকেন। আর এই পদ্ধতীতেই সাহাবীরা গড়ে উঠেছেন।

সাহাবী জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন,

تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ

'আমরা নবী ﷺ এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা নব যুবক ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখতাম। তারপরে আমরা কুরআন শিখতাম। ফলে এর কারণে আমাদের ঈমান বেড়ে যেত।'[20]

এই পদ্ধতীতেই রাসূল ﷺ তার সাহাবীদের গড়ে তুলেছেন: প্রথমে ঈমান এরপর কুরআন।

- ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আগে দ্বীন সম্পর্কে বুঝ (অর্থাৎ তাওহীদ) এরপর শরীয়াহ সম্পর্কে বুঝ ঈমানের বিশ্বাসকে সর্বপ্রথম সঠিক করতে হবে। এরপর দ্বীন ইসলামের সকল দিকে বিচরণ করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, **শরীয়তের আহকাম বা বিধিবিধান বিষয়ক ফিকহ শিক্ষা করার চেয়ে বিশ্বাস বিষয়ক ফিকহ** ***অর্জন করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।*** তিনি বলেন:

"الفقه في الدين - يعني هذه المرتبة - أفضل من الفقه في الأحكام ...قلت فأخبرنى عن أفضل الفقة : أن يتعلم الرجل الايمان بالله تعالى والشرائع والسنن والحدود واختلاف الامة واتفاقها...

[20] ইবনে মাজাহ 61

দ্বীন বিষয়ে জ্ঞানাজর্ন আহকাম বিষয়ে জ্ঞানাজর্নের চেয়ে উত্তম। .... আমি বললাম: তাহলে আপনি আমাকে ফিকহের উত্তম বিষয় সম্পকের্ বলনু। আবূ হানীফা বলেন: শ্রেষ্ঠ ফিকহ এই যে, মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান শিক্ষা করবে, শরীয়তের বিধিবিধান, সুন্নাত, সীমারেখা এবং উম্মাতের মতভেদ ও ঐকমত্য শিক্ষা করবে।[21]

এখানে ইমাম আযম দ্বীন ও আহকামের পাথর্ক্য নিদের্শ করেছেন। দ্বীন হলো বিশ্বাস ও তাওহীদের নাম, পক্ষান্তরে আহকাম ও শরীয়াহ কর্ম বিষয়ক বিধানাবলির নাম। বিভিন্ন নবী ও রাসলূকে আল্লাহ বিভিন্ন শরীয়াহ দিয়েছেন, তবে সকলের দ্বীন দ্বীন এক ও অভিন্ন।

ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে সকল ইসলামী ইলম বা জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা আক্বিদার বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

---

21 (আল ফিকহুল আবসাত; ইমাম আবু হানীফা রাহি. পৃ ৪১)

ইসলামী আক্বিদার কিছু নাম- ইতিহাস এবং আক্বিদার উৎস

ইসলামী আক্বিদার কিছু নাম

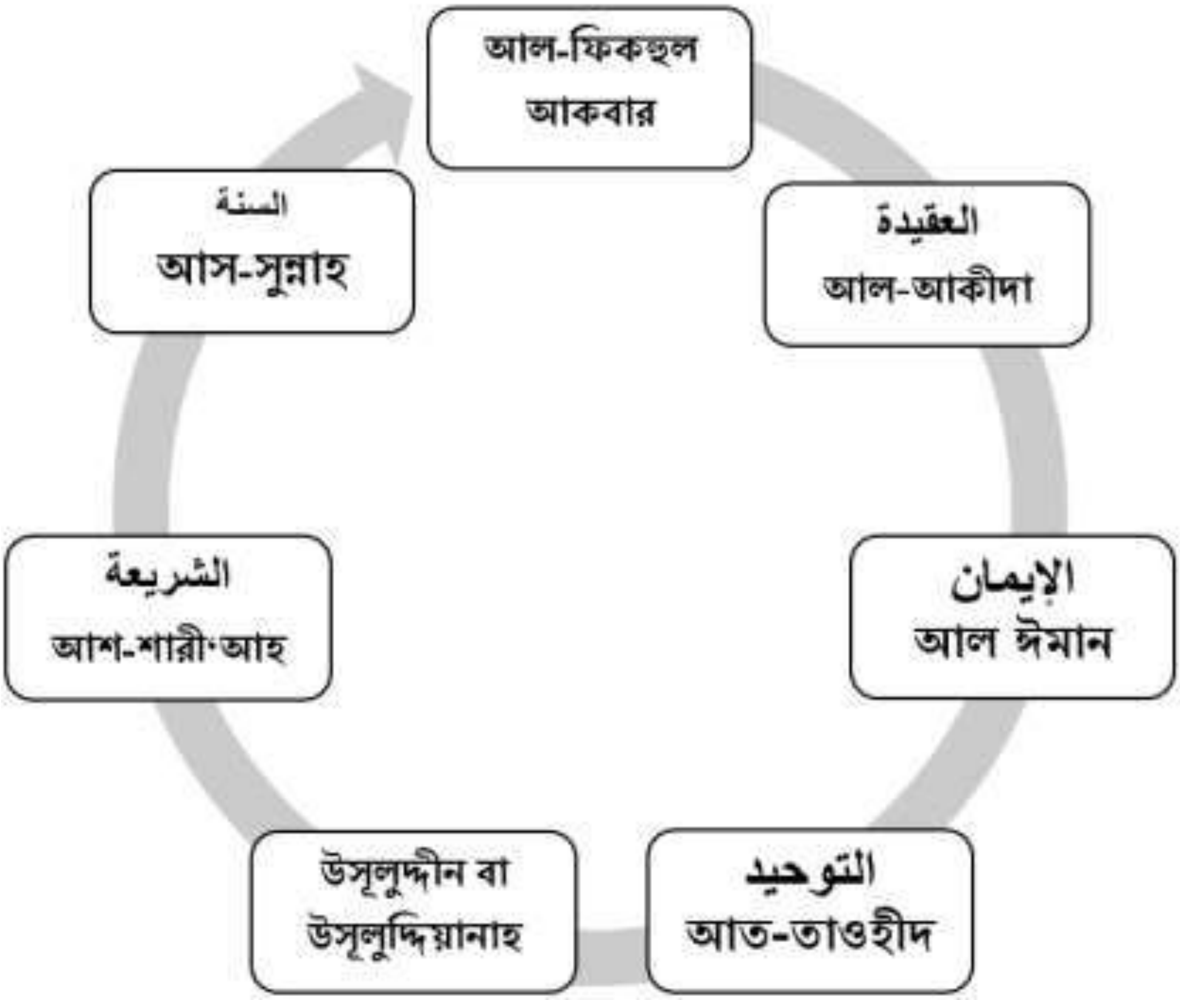

তাবিয়ীগণের যুগ থেকে আকিদার বিষয়ে বিভিন্ন পরিভাষা; বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলোর অন্যতম..

- **আল-ফিকহুল আকবার-** শ্রেষ্ঠতম ফিকহ। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আকীদার পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছেন 'আল-ফিকহুল আকবার'। সম্ভবত 'আকীদা' বুঝাতে এটিই প্রথম এবং প্রাচীনতম পরিভাষা।
- **আকীদা-** ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা 'আকীদা'।

33- দরসুল আকিদা

বিশ্বাস' বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে 'আকীদা' ও 'ই'তিকাদ' শব্দের ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে দেখা যায় না। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।[22]

`আক্কিদা` নামে আকিদার উপর সালাফদের লিখিত বই

¤ اعتقاد أهل السنة – এ`তেকাদু আহলিস সুন্নাহ- আবু বকর ইসমাঈলি [২৭৭-৩৭১]

¤ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد- আল-এ`তেকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবিলির রাশাদ-ইমাম বায়হাকী [৩৮৪-৪৫৮]

¤ لمعة الاعتقاد `লুমআতুল ইতিকাদ`- ইমাম ইবনে কুদামা [৫৪১-৬২০]

❑ **ঈমান-** শব্দটি থেকে নির্গত- অর্থ- তথা আন্তরিক বিশ্বাষ. আনুগত্য করা ইত্যাদি

`ইমান` নামে; আকিদার উপর সালাফদের লিখিত বই

¤ কিতাবুল ঈমান- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল [১৬৪-২৪১]

¤ কিতাবুল ঈমান- আবু বকর বিন আবি শাইবাহ [১৯৫-২৩৫]

¤ কিতাবুল ঈমান- মুহাম্মাদ বিন ইসহাক [৩১০-৩৯৫]

❑ **সুন্নাহ-**

সুন্নাহ বা سنة শব্দটি আরবি। এটি একবচন, বহুবচনে سنن বা সুনান। সুন্নাহ শব্দের আভিধিনক অর্থ নিম্নরুপ :

১. الطريقة المسلوكة – নিয়মনীতি, ২. কর্মনীতি, ৩. পথ, ৪. পদ্ধতি, ৫. রাস্তা ইত্যাদি: পবিত্র কুরআনে প্রায় প্রত্যেকটি অর্থে এর ব্যাবহার এসেছে।[23]

সুন্নাহের পারিভাষিক অর্থ.

ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح.

হাদীস এবং সুন্নাতের অর্থ একই। [কাশফুল বারী]

২. ফকীহগণের নিকট

عند الفقهاء على المأمور به أمراً غير جازم، وعند بعضهم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهره في ملإ وقام الدليل على عدم وجوبه، وهذا عند الذين يفرقون بين السنة والمندوب.

অর্থাৎ ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় সুন্নাত শব্দের অর্থ ভিন্ন। ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় সুন্নাত হল সেই কাজ যা করলে সওয়াব হবে কিন্তু না করলে গুনাহ নেই। উদাহরনস্বরূপ: প্রায়ই আমরা শুনে থাকি দাড়ি রাখা সুন্নাত আবার এও বলা হয় যে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা অনুযায়ী দাড়ি রাখা সুন্নাত, কেননা রাসূল (সাঃ) দাড়ি রাখতেন এবং রাখার নির্দেশ দিয়েছেন,অতএব এটা তাঁর কথা ও কাজের অন্তর্গত। পক্ষান্তরে ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় দাড়ি রাখা ওয়াজিব অর্থাৎ দাড়ি রাখলে সওয়াব হবে এবং না রাখলে গুনাহগার হতে হবে। এজন্য যখন একজন ফকীহকে অথবা একজন মুফতীকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে দাড়ি রাখা কি সুন্নাত না ওয়াজিব, তিনি বলবেন ওয়াজিব।

৩. আক্বিদা শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায়-

علم العقائد تطلق على ما يقابل البدعة.

সুন্নাত হচ্ছে বিদাতের বিপরীত। অর্থাৎ যা কিছুর পক্ষে শরীআতের দলিল আছে সেটাই সুন্নাত,সেটা কুরআন থেকেই হোক অথবা হাদীস থেকেই হোক। আর যে কাজের পেছনে কুরআন বা হাদীসের কোন দলিল নেই সেটা বিদাত,যাকে ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আকিদার উপর এই নামে সালাফদের লিখিত বই

¤ কিতাবুস সুন্নাহ- আবূ বকর আছরাম [২৭৩]

¤ কিতাবুস সুন্নাহ- আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহি. [২১৩-২৯০]

¤ কিতাবুস সুন্নাহ- আবূ আহমাদ আল-ইসবাহানী [২৬৯-৩৪৯]

35- দরসুল আকিদা

আক্বিদার ইতিহাস

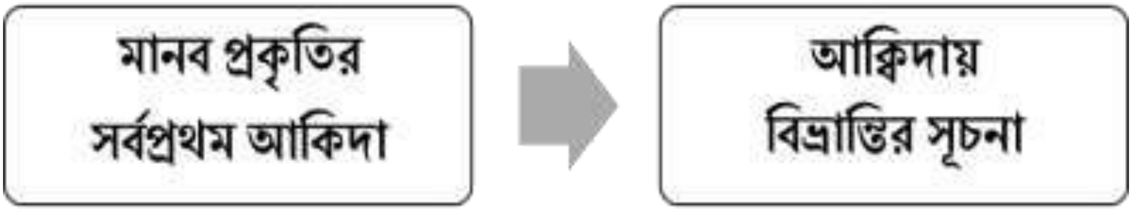

মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকিদা:

ইসলাম হচ্ছে স্বভাবজাত দ্বীন ও জীবন ব্যবাস্থা। ইসলামী আক্বিদার সাথে সামঞ্জস্য করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই সৃষ্টির শুরু থেকেই ইসলামী আক্বিদার সূচনা। এই দ্বীনের উপরই এই পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। কেননা আল্লাহ তাকে তার দ্বীনের জন্য মনোনীত করেছেন বলে কোরআনে নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন।[24]

এছাড়া মানুষের রূহ সৃষ্টি করার পরই; মহান আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের কাছ থেকে তার তাওহীদের স্বীকৃতি নিয়েছিলেন-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি।[25]

এই আয়াত থেকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, তাওহীদ তথা একত্ববাদের আকিদাই মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকিদা, পরবর্তীতে শির্কের জন্ম হয়। যেমন টি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করছেন-

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

---

[24] সূরা আলে-ইমরান ৩৩

[25] সূরা আরাফ ১৭২

আমি আমার বান্দাদের প্রত্যেককেই একনিষ্ঠ (মুসলিম) করে সৃষ্টি করেছি; তারপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন বিচ্যুত করে দিয়েছে। আমি তাদের জন্য যা হারাম করেছি; শয়তান এসে তা তাদের কাছে হালাল করে দিয়েছে; এবং আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে; যার ব্যাপারে আমি কোন দলীলই নাযিল করিনি।[26]

এই হাদীস থেকেও একথা প্রতিয়মান হয় যে সো জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ ইসলামী আকীদা পোষণ করে আসছে

আক্বিদায় বিভ্রান্তির সূচনা

আল্লাহ তখনই নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, যখন মানব সমাজে বিচ্যুতি ঘটেছে, নৈতিক পতন এসেছে, যখন তারা নিজদের সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত ও পূঁজা-অর্চনায় মগ্ন হয়েছে। যেমন, সূর্যের ইবাদত, কারণ সে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে সর্বদা উদিত হয়, এর দ্বারা তারা উপকৃত হয়। তদ্রূপ মানুষ এক সময় পিতার উপাসনা করেছে: কারণ, সে দুনিয়ায় আসার মাধ্যম, শক্তির আধার। আরেকটু অগ্রসর হয়ে গোত্রপতির উপাসনা শুরু করেছে। কারণ, সে সমাজপতি, তার ক্ষমতাই বেশি, তার শক্তিই প্রবল। যেমন, আদি মিসরবাসীরা ফির‘আউনের ইবাদত করেছে। [সূরা আন-নাজিআত, ২৩-২৪] পরবর্তীতে আক্বিদায় বিভ্রান্তি দেখা দিলে আল্লাহ তাআলা নুহ আ. কে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সো নূহ আ. এর যুগে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আক্বিদায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবর্তীণ

---

[26] সহীহ মুসলিম ৭৩৮৬

করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।[27]

“সকল মানুষ একই জাতি-সত্বার অন্তর্ভূক্ত ছিলো এই আয়াতের ব্যাখায় ইমাম ইবনে কাসীর রাহি. নিম্নোক্ত হাদীস দিয়ে ব্যখ্যায় করেছেন-

عن ابن عباس ، قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون ، كلهم على شريعة من الحق . فاختلفوا ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين

নুহ এবং আদম আ. এর মাঝে ছিলো ১০ শতাব্দি. এবং তার প্রত্যেকেই সত্য শরিআহ (ইসলামের) উপর ছিলেন। তারপর তার মতভেদ করলেন; তখন আল্লাহ নবী পাঠালেন সুংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।[28]

আক্বিদার উৎস

---

[27] বাক্বারা ২১৩

[28] ইবনে কাসীর ১/২১৮

ওহী

আকীদার একমাত্র উৎস ওহী। কারণ আকীদা বা বিশ্বাস অদৃশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর অদৃশ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ও সঠিক সত্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি দু প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং দু ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব বা কুরআন ও হিকমাহ বা হাদীস।

হাদীস

দ্বিতীয় প্রকারের ওহী "আল-হিকমাহ- হাদীস " বা প্রজ্ঞা। ***কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে যে শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞান প্রদান করেন তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীগণকে শিক্ষা দেন। তাঁর এ শিক্ষা "হাদীস" নামে সংকলিত হয়েছে।*** **হাদীসই ইসলামী আকীদার দ্বিতীয় ভিত্তি ও উৎস**। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে যে কথা বা হাদীস শুনতেন তা অন্যদেরকে শোনাতেন। কেউ তা লিখে রাখতেন এবং কেউ মনে রাখতেন এবং প্রয়োজনে বলতেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ সাহাবীগণ থেকে হাদীস শিখতেন এবং লিপিবদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

দ্বীনের সকল বিষয়ের ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও মূল ভিত্তি হলো কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস এবং এরপর সাহাবীগণের মত। আকীদা ও ফিকহের মৌলিক পার্থক্য হলো, ফিকহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, কিয়াস, যুক্তি বা আকলী দলীলের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে এর কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের অনুসরণই একমাত্র করণীয়। কারণ ফিকহের বিষয়বস্তু পরিবর্তনশীল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবীগণের যুগে ছিল না এমন কোনো নতুন বিষয়ে ফিকহী মত জানার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আকীদার বিষয়বস্তু মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, নবী-রাসূলগণ... ইত্যাদি। এগুলো অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রে মুমিনের একমাত্র দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের আকীদা জানা ও মানা।[29]

---

[29] কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আক্বিদা। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রাহি.

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয়

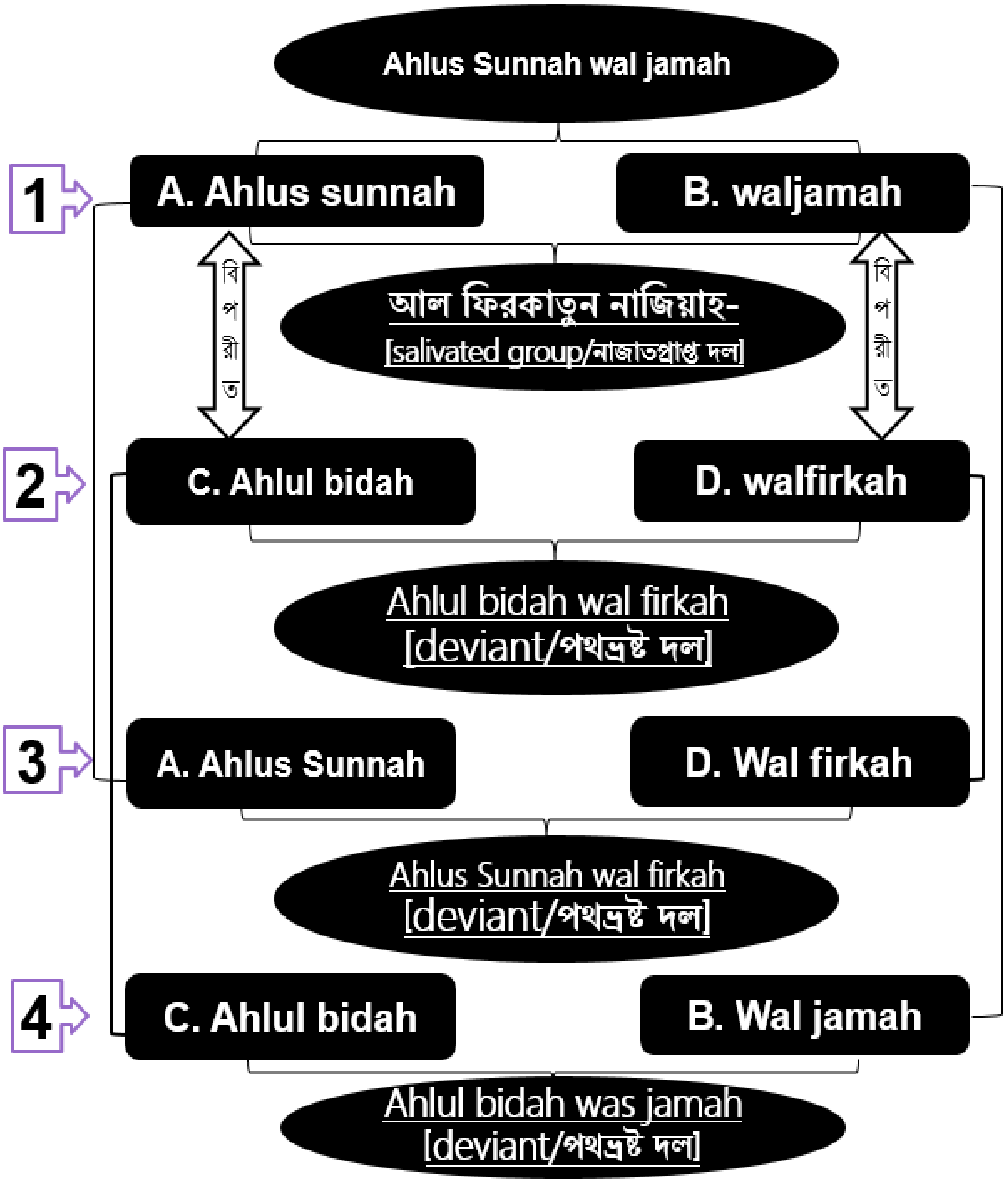

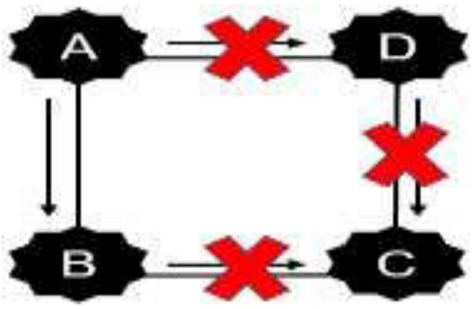

মোটকথা: A-B টিই হচ্ছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। বাকীসবগুলিই পথভ্রস্ট।

আহ্‌ল (أهـل)

প্রথম পার্ট `আহলুস সুন্নাহ
শাব্দিক -পারিভাষিক বিশ্লেষন

অর্থ, পরিজন, জনগণ, অনুসারী (relatives, folks, people, members, followers) ইত্যাদি।

সুন্নাত

وَالسُّنَّةُ: هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ، فَيَشْمَلُ ذَلِكَ التَّمَسُّكَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَخُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ مِنَ الِاعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ.

অর্থাৎ দ্বীনের যে পথ ও পন্থার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন, আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও কর্ম তথা দ্বীনের সকল বিষয়ে তাদের ঐ পথ ও পন্থাই হচ্ছে সুন্নাহ[30]

এর বিপরীতটি হচ্ছে বিদআত সুতরাং আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ বা সুন্নাতের অনুসারী এবং **আহলুল বিদ‘আত অর্থ বিদ‘আতের জনগণ বা বিদ‘আতের অনুসারী।**

‘সুন্নাহ’ উৎস সংক্রান্ত হাদিস

أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

---

30 জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব পৃ. ৪৯৫

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করলেন। এতে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হল এবং হৃদয় ভীতকম্পিত হল। একজন আরজ করলেন, আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়কালের উপদেশ। আপনি আমাদের (আরো) কী অসীয়ত করছেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, **তোমাদেরকে অসীয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং আমীর হাবাশী গোলাম হলেও তার আনুগত্য করার। কারণ আমার পর তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা বহু ইখতিলাফ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়েতের পথের পথিক খলীফাগণের সুন্নাহকে সর্বশক্তি দিয়ে ধারণ করবে। আর সকল নবউদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কারণ সকল নবউদ্ভাবিত বিষয় বিদআত। আর সকল বিদআত গুমরাহী।**[31]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটি মৌলিক হাদীস। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইখতিলাফ হলে আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে ধারণ করবে। তাহলে বুঝা গেল, **নাজাতপ্রাপ্ত দলের একটি মানদন্ড সুন্নাহ, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ।**

দ্বিতীয় পার্ট 'আলজামাআ'
শাব্দিক-পারিভাষিক বিশ্লেষন

জামা'আত শব্দটি আরবী জামঅ' (الجمع) থেকে গৃহীহ, যার অর্থ একত্রিত করা, জমায়েত করা, ঐক্যবদ্ধ করা (To gather, collect, unite, bring together, join) ইতাদি। 'জামা'আত' (جماعة) অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠি, বা সমাজ (community, society). **এর বিপরীতটি হচ্ছে ফিরকা বা বিচ্ছিন্নতা।**

---

31 মুসনাদ'-আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. ১৭১৪৫

❑ **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন**

"الجماعة ما وافق الحق، ولو كنتَ وحدك"؛

জামাআত হচ্ছে; যা হক্বের [কুরআন-সুন্নাহের] অনুগামী; যদিও তাতে একজন হয়।[32]

❑ ইবনে তাইমিয়া রাহি. বলেন,

فإن السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع، فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ হচ্ছে নস ও ইজমার অনুসারী। সুন্নাহ নসকে ধারণ করে আর জামাআ ধারণ করে ইজমাকে।[33]

❑ ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহি. বলেন-

السنة : الطريقة المسلوكة ؛ فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات، والأعمال، والأقوال.

যারা কথা-কর্ম এবং বিশ্বাসে নবীজী সা. খুলাফায়ে রাশেদীনের পন্থা আকড়েঁ ধরেছে; তারাই আহলুস সুন্নাহ।[34]

ইবনে আব্বাস রাযি. নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ}[35] قالت: "تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة"

আল্লাহর কথা `**সেদিন কিছু চেহারা আলোকিত থাকবে**` অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের উপর অটল যারা তাদের চেহারা আলোকিত হবে। এবং `**সেদিন কিছু চেহারা কালো থাকবে**` অর্থাৎ আহলুল বেদআতি এবং ওয়াল ফিরকা`র চেহারা কালো থাকবে।[36]

---

32 ورواه الترمذي في سننه (٤/٤٦٧
33 মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/৪৬৬
34 جامع العلوم والحكم 120/2
35 الآية 106 من سورة آل عمران
36 تفسير ابن كثير 390/1

'আল-জামাআহ'র উৎস সংক্রান্ত হাদিস

এ সংক্রান্ত হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ ও সুনানে দারেমী ইত্যাদি কিতাবে আছে। সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে হাদীসটি যেভাবে আছে তা হল- আবু আমির আবদুল্লাহ বলেন, আমরা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর সাথে হজ্ব করলাম। যখন মদীনায় এলাম যোহরের নামাযের পর তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا الواحدة، وهي الجماعة ... انتهى.

'পূর্বের দুই কিতাবধারী সম্প্রদায় তাদের ধর্মে বায়াত্তর মিল্লাতে বিভক্ত হয়েছিল। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে তেয়াত্তর মিল্লাতে। অর্থাৎ নিজস্ব খেয়াল-খুশির অনুসারী বিভিন্ন দল; **সবগুলো দল জাহান্নামী হবে একটি ছাড়া। আর সেটি হচ্ছে 'আলজামাআ'**[37]

'আল জামাআহ'- উল্লেখযোগ্য চারটি ব্যাখ্যা[38]

1. (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে) আমীরুল মুমিনীন বা সুলতানের কর্তৃত্ব স্বীকারকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং শরীয়তসম্মত বিষয়ে তার আনুগত্য বর্জন না করা। অর্থাৎ মুসলমানদের অধিকাংশ আহলুর রায় (أهل الحل والعقد) কোনো আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে একমত হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা অভিযান পরিচালনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।[39]
2. মুসলিম শাসনকর্তার অধীনস্ত মুসলমানদের জামাত।
3. শরীয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে উম্মাহর আমলে মুতাওয়ারাছ তথা সাহাবা-তায়েয়ীন যুগ থেকে চলে আসা কর্মধারা এবং উম্মাহর সকল আলিম

[37] মুসনাদে আহমদ ২৮/১৩৪/হাদীস ১৬৯৬৭;

[38] আল-কাউসার দ্রষ্টব্য-লিংক- https://www.alkawsar.com/bn/article/1864/

[39] ফাতহুল বারী ১৩/৩৭, হাদীস ৭০৮৪-

বা অধিকাংশ আলিমের ইজমা ও ঐক্যের বিরোধিতা না করা। কোনো ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

4. হাদীস-সুন্নাহ এবং ফিকহের ইলম রাখেন এমন উলামা-মাশাইখের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখা। ইমাম তিরমিযী রাহ. আহলে ইলম থেকে আলজামাআর যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তা এই-

أهل الفقه والعلم والحديث

অর্থাৎ জামাআ হচ্ছে ফিকহ ও হাদীসের ধারক আলিম সম্প্রদায়।[40]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আকাইদ, ইবাদত, ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই নিজের জন্য নতুন কোনো পথ নির্বাচন করবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো আকাইদ ও ইবাদতই গ্রহণ ও অনুসরণ করবে, যা গ্রহণ ও অনুসরণ করেছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরাম। সকল প্রকারের বিদআত ও রুসুম-রেওয়াজ থেকে দূরে থাকবে। লেনদেন, সামাজিকতা, আচার-ব্যবহার অর্থাৎ দ্বীন-দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহর শিক্ষাকেই অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিবে।

সুতরাং কেউ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ, সে দ্বীনের প্রতিটি বিভাগে উপরোক্ত বিষয় গুলো পাওয়া যেতে হবে।

পরিশিষ্ঠ

মোটকথা আজকে আমরা সালাফ থেকে নাজাতপ্রাপ্ত ও সুপথপ্রাপ্ত দলের পুরো নাম পেলাম। **অপর পক্ষের পূর্ণ নাম হল, আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা**। সাধারণত শুধু নামের প্রথম অংশ উল্লেখ করে **আমরা আহলুল বিদআ বা বিদআতী বলি,** যা সুন্নাহ ত্যাগের কারণে হয়। অপর অংশ আহলুল ফিরকা বা ফেরকাবাজ, যা জামাআ ত্যাগের কারণে হয়।

[40] কিতাবুল ফিতান, বাবু লুযুমিল জামাআ, হাদীস ২১৬৭

45- আকিদাতুত তাহাবী

বি.দ্র. মনে রাখতে হবে, **সুন্নাহ ও জামাআ একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত**। কারো মনে হতে পারে, কোনো দলের মাঝে জামাআ না থাকলেও সুন্নাহ থাকতে পারে। তাদের নাম হতে পারে-আহলুস সুন্নাতি **ওয়াল ফুরকা**। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কারণ ফুরকা বা বিভেদ হচ্ছে মারাত্মক সুন্নাহ পরিপন্থী বিষয়। কাজেই বিভেদ সৃষ্টিকারী কখনো সুন্নাহর অনুসারী নয়। তেমনি বিদআতী হয়ে জামাআ রক্ষাকারী কি হতে পারে? পারে না। কারণ বিদআতীর চরিত্রই হচ্ছে সুন্নাহ অনুসারীদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো। তো সুন্নাহ ত্যাগের কারণে এক বিভেদ তো প্রথমেই তৈরি করেছে, এখন সুন্নাহর অনুসারীদেরকে টার্গেট করে আরো বিভেদের জন্ম দিচ্ছে। মোটকথা সুন্নাহ ও জামাআ একট অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

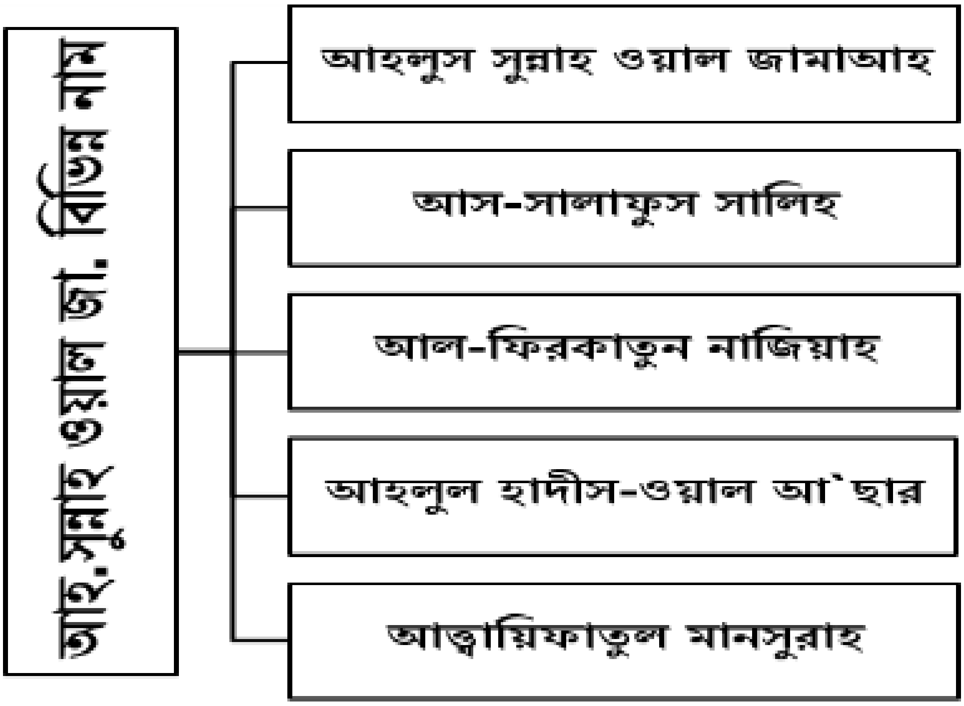

সমষ্টিগতভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের তিনটি ধারা;

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

তাওহীদ [التوحيد]

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন-

نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره

> ''মহান আল্লাহর তাওফীক কামনা করে তাঁর তাওহীদ -তথা একত্ববাদ সম্পর্কে আমরা [আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ] বলব, নিশ্চয় আল্লাহ এক, যাঁর কোনো শরীক (অংশীদার) নেই। তাঁর মতো কিছুই নেই। কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।''

قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ، دَائِمٌ بِلَا انْتِهَاءٍ. لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ. لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَيُّومٌ لَا يَنَامُ. خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلَا مَؤُونَةٍ. مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ.

> ''তিনি ক্বাদীম বা প্রাচীন, যার কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত, যার কোনো অন্ত নেই। তাঁর ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। কল্পনাসমূহ তাঁর (সম্পর্কে জানার জন্য) ধারে কাছে) পৌঁছুতে পারে না এবং বুঝ-জ্ঞান তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না। আর তিনি সৃষ্ট বস্তুর সদৃশ নন।
> তিনি চিরঞ্জীব, মারা যাবেন না, চির জাগ্রত, নিদ্রা যান না তিনি (এমন) সৃষ্টিকর্তা (যার সৃষ্টির প্রতি) কোনো প্রয়োজন (সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া) ছাড়াই, তিনি কোনো প্রকার ক্লান্তি ছাড়াই (সবার) রিযিকদাতা। তিনি নির্ভয়ে প্রাণ সংহারকারী এবং বিনা ক্লেশে পুনরুত্থানকারী।''

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا .

‘‘সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন, আর সৃষ্টির কারণে তাঁর নতুন কোনো গুণের সংযোজন ঘটে নি এবং তিনি তাঁর গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত থাকবেন।’’

لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْخَالِقِ"، وَلَا بِإِحْدَاثِه الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْبَارِي."

‘‘আল্লাহ তাআলা যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন; তখন থেকে তিনি ‘‘খালেক’’ (সৃষ্টিকর্তা) উপাধি গ্রহণ করেছেন এমন নয়; অথবা বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণে তাঁর গুণবাচক নাম ‘‘বারী’’ (উদ্ভাবক) হয় নি।’’

لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقَ.

‘‘প্রতিপাল্যের অবিদ্যমানতায়ও তিনি ছিলেন ‘রব’ বা প্রতিপালক, আর মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন ‘খালেক’ বা সৃষ্টিকর্তা।’’

وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَى اسْتَحَقَّ هَذَا الِاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

‘‘মৃতদেরকে জীবন দান করার ফলে যেমন তাঁকে ‘জীবনদানকারী’ বলা হয়ে থাকে তেমনিভাবে তাদেরকে জীবনদান করার পূর্বেও তিনি এই (জীবনদানকারী) নামের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্টিকুলের সৃজনের পূর্বেই ‘সৃষ্টিকর্তা’ নামের অধিকারী ছিলেন। এটা এই জন্য যে, তিনি সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহ ভিখারী; আর সব কিছুই তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। ‘‘তাঁর মত কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’’ [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]’’

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا.

''তিনি স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাদের (সৃষ্ট বস্তুর) জন্য সব কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। এবং তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করেছেন।''

وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ.

''সৃষ্ট জীবের সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না। জীব জগতের সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন।''

وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

''এবং তিনি তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যচরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।''

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ .

''আর সবকিছু তাঁর নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা কার্যকর হয়েই থাকে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার কোনো ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না।''

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا.

''তিনি (আল্লাহ) অনুগ্রহ করে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। আর যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন, অপমানিত করেন ও বিপদগ্রস্ত করেন।''

وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ.

''আর সকলেই তাঁর (আল্লাহর) ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরই এ অনুগ্রহ ও এ ন্যায়বিচারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে''

দরসুল আকিদা

তাওহীদ – শিরিক

সূ চি প ত্র

- তাওহীদ এর পরিচয় এবং তাওহীদের গুরুত্ব
- তাওহীদের প্রকারভেদ- তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ এর পরিচয়-দলীল
- তাওহীদের উলুহিয়্যাহ এর পরিচয়-দলীল
- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত-এর পরিচয়-দলীল
    - ¤ সিফাত সমূহের প্রকার
    - ¤ আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে
    - ¤ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূলনীতী
    - ¤ [সিফাতের ক্ষেত্রে] আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পন্থা ও দলীল
    - ¤ আল্লাহর একটি সিফাতের উদাহরণ
- তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ; পরিচয়-দলীল

তাওহীদের অর্থ-পরিচয়

তাওহীদের আভিধানিক অর্থ;

فالتوحيد لغة: مصدر وحّد يوحد توحيدا

তাওহীদ শব্দটি (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসকে একক হিসেবে নির্ধারণ করা। । এক বানানো, একত্রে যুক্ত করা, একত্রিত করা, একীকরণ (কোন কিছুকে এক করা), একত্বের ঘোষণা দেওয়া বা একত্বে বিশ্বাস করা (to be alone, unique singular, unmatched, without equal, incomparable)

واصطلاحا : إفراد الله - سبحانه - بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات

পারিভাষিক অর্থ- শারী'য়াতের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ হলো- আল্লাহ্‌কে তাঁর; অধিকার, কর্ম ও কর্তৃত্বে; এবং সুমহান যাত (সত্তা) সর্বসুন্দর নাম ও সিফাতে (গুণরাজি-বৈশিষ্ট্যে) এক, একক ও অদ্বিতীয় ঘোষণা ও সাব্যস্ত করা, এবং এসব ক্ষেত্রে নিজের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুন্ন রাখা।[41]

অর্থাৎ 'আসমান ও যমীনসহ এর ভিতর ও বাইরের জানা-অজানা সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এবং সকল প্রকার ইবাদাতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করা।

---

[41] القول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن صالح بن عثيمين - 1/ 11

তাওহীদের গুরুত্ব-তাৎপর্য

১. মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য : আল্লাহ মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি'[42]

আর ইবাদতের মূল তাওহীদের স্বীকৃতি। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদতে সর্বদা রত থাক, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাহ'লে তোমরা সংযমী ও মুত্তাক্বী হ'তে পারবে'[43]

তিনি আরো বলেন,

فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করো না, অথচ তোমরা জান।'[44]

মানবজাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে এক বলে জানা। কেননা আল্লাহকে এক বলে না জানা পর্যন্ত তাঁকে এক বলে মানাও যায় না।

২. নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের প্রতিষ্ঠা: তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ মানবজাতির নিকট যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাওহীদই হচ্ছে সমস্ত রাসূলদের দাওয়াতের মূল কথা, যার দিকে তাঁরা তাঁদের উম্মতদের ডেকেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدُونِ

'আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমরা পাঠাইনি যার প্রতি আমরা এই ওহী অবতরণ করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর'[45]

---

[42] সূরা যারিয়াত ৫১/৫৬

[43] সূরা বাক্বারাহ. ২১

[44] সূরা বাক্বারাহ. ২২

তিনি আরো বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতির নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে পরিহার কর'[46]

৩. তাওহীদ বিশ্বাস নিরাপত্তা ও হেদায়াত লাভের মাধ্যম : আল্লাহ সুব. বলেন-

الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُوْنَ

'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী'[47]

৪. দুনিয়া ও আখেরাতে দৃঢ়তা লাভের মাধ্যম : আল্লাহ সুব. বলেন

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

'যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন'[48]

৫. গোনাহ মাফের উপায় : আল্লাহ সুব. বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমরা অবশ্যই তাদের মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব'[49]

তিনি আরো বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

---

[45] সূরা আম্বিয়া ২৫

[46] নাহল ৩৬

[47] আন'আম ৮২

[48] সূরা ইবরাহীম ২৭

[49] আনকাবূত ৭

‘আর যদি আহলে কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত, তবে আমরা তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নে‘মতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করতাম’[50]

৬. জান্নাত লাভের মাধ্যম : আল্লাহ সুব. তা‘আলা বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ সমূহ করেছে, তুমি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসাবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধাচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে’ (বাক্বারাহ ২/২৫)

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ নিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং যা নিয়ে কিতাব নাযিল হয়েছে -তার তিনটি অংশ রয়েছে

[50] মায়েদাহ ৫/৬৫

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ এর পরিচয়

توحيد الربوبية يعني الإقرار بأنَّ الله سبحانه وتعالى هو ربّ كل شيءٍ ومليكه، وأنّ الله تبارك وتعالى هو الخالق، والرازق، والمحيي، والمميت، والنافع، والضار، والمتفرّد بإجابة دعاء المضطرين، والإقرار أيضاً بأنّ الأمر كلّه لله، وأنّه بيده الخير كلّه، وأنّ الله هو القادر على ما يشاء، وليس له في ذلك أي شريك –

'দৃঢ়ভাবে এই বিষয়ের উপর এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন এক ও একক। তিনিই স্রষ্টা, অর্থাৎ এ ঈমান রাখা যে মহান আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা, সৃষ্টিজগতের সকলের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী। এগুলোতে তার কোনো শরীক নেই।[51]

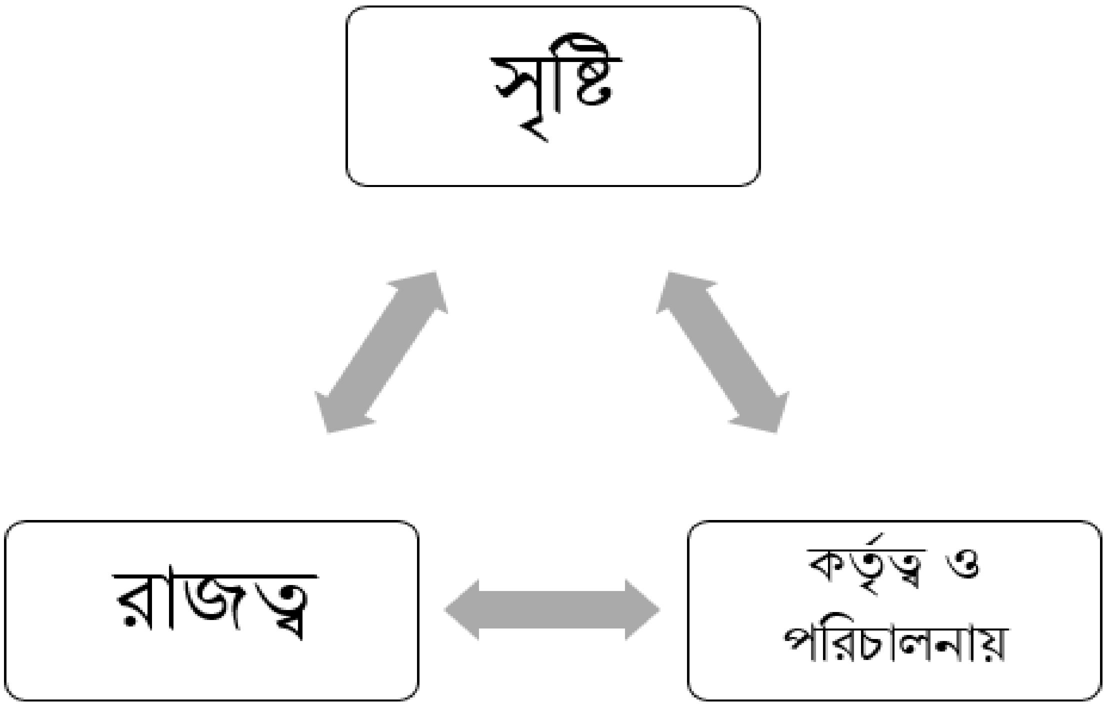

51 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 33

দলীল

১. সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্ব:

ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ

"আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা"।[52]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۖ

"নিশ্চয় তোমাদের রব তো আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয়দিনে, তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন, তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন"।[53]

২. রাজত্বে আল্লাহর একত্ব:

মহান রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। বলেন,

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

"সেই মহান সত্ত্বা অতীব বরকতময়, যার হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।"[54]

আল্লাহ আরো বলেন,

قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ

"হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার ওপর কোনো আশ্রয় দাতা নেই।"[55]

৩. পরিচালনায় আল্লাহর একত্ব:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল মাখলূকাত এবং আসমান-যমিনের সব কিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[52] সূরা আয-যুমার, ৬২

[53] সূরা ইউনুস, ৩

[54] সূরা আল-মুলক: ১

[55] সূরা আল-মুমিনূন,: ৮৮

أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

"সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। সৃষ্টকুলের রব আল্লাহ তা'আলা অতীব বরকতময়।"[56]

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

'বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।'[57]

বি.দ্র- শুধুমাত্র তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ মুসলিম হওয়া বা ইসলামে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট নয়

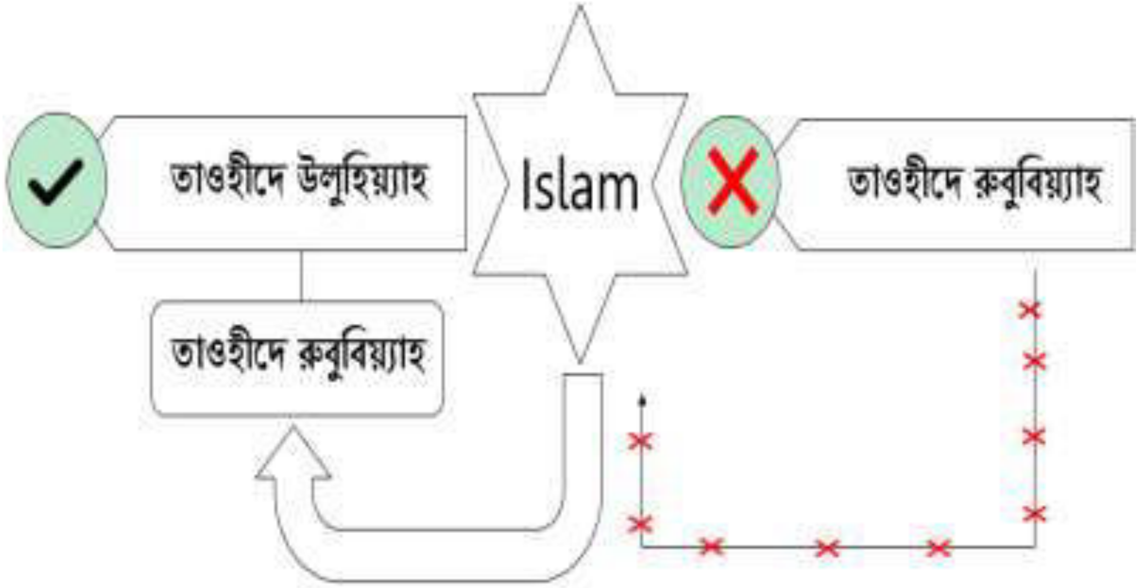

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাকে মক্কার কিছু কিছু মুশরিকরাও ঈমান রাখত। যদিও তাদের অধিকাংশই পুনরুত্থান ও হাশর-নশর অস্বীকার করত;
কিন্তু এ ঈমান তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায় নি। নিম্নে কিছু আয়াত পেশ করা হল।

- ❑ **তারা স্বিকার করত, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ-**

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

---

[56] সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪

[57] সূরা ইউসূফ: ৪০

'বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবেঃ সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?'[58]

❑ **তারা স্বিকার করত সপ্তাকাশ ও আরশের মালিক আল্লাহ-**

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ -سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

'বলুনঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?[59]

❑ **তারা বিশ্বাষ করত সব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে-**

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

'বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহর। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?[60]

❑ **তারা বিশ্বাস করত, তাদের স্রষ্টা আল্লাহ, আসমান যমিনের স্রষ্টা আল্লাহ, চন্দ্র সূর্যের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ এবং আসমান থেকে আল্লাহ তাআলাই পানি বর্ষণ করেন এবং মৃত যমিনকে জীবিত করেন।**

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ, অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?'[61]

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

'আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।'[62]

---

[58] সুরা মুমিনুন:৮৪-৮৫

[59] সুরা মুমিনুন: ৮৬-৮৭

[60] সুরা মুমিনুন: ৮৮- ৮৯

[61] সুরা ঝুখরুফ: ৮৭

[62] সুরা ঝুখরুফ:৯

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে তার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।'[63]

এত কিছু বিশ্বাস করার পরও তারা মুশরিক ছিল।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

তাওহীদুল উলুহিয়্যার পরিচয়

إفراد الله جل وعلا بالتعبد في جميع أنواع العبادات

`সব ধরণের ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই এক ও একক হিসেবে মানা। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই দ্বীনকে নির্ধারণ করা।[64]

ইবন কাসীর রাহি. বলেছেন,

الخالق لهذه الاشياء - هو المستحق للعبادة

"যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।"[65]

যে ব্যক্তি এ প্রকার তাওহীদে ত্রুটি করবে, সে কাফির মুশরিক। যদিও সে তাওহীদে রুবূবীয়্যাহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। সুতরাং কোনো মানুষ যদি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী, একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক, কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতে যদি অন্য কাউকে শরীক করে, তবে তার এ স্বীকৃতি ও বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, একজন মানুষ তাওহীদে রুবূবীয়্যাতে এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতে পূর্ণ বিশ্বাস করে; কিন্তু সে কবরের কাছে যায় এবং কবরবাসীর ইবাদাত করে কিংবা তার জন্য কুরবানী পেশ করে বা পশু জবেহ করে তাহলে সে

---

[63] সুরা আনকাবুত: ৬৩

[64] 170/1 ((رسالة في معنى العبادة لأبي بطين ضمن مجموعة التوحيد)).

[65] উসুলুস ছালাছা; মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহি. পৃ- 3

কাফির এবং মুশরিক। মৃত্যুর পর সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।[66] আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[67]

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর দলীল

যিনি রব হবেন তিনিই হবেন মা'বুদ বা উপাস্য। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

"হে মানুষ! তোমরা ইবাদাত করবে সেই মহান রবের যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ আর আসমানকে করেছেন ছাদ স্বরূপ। আর যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা উদগত করেন নানা প্রকার ফলশস্য তোমাদের জীবিকা হিসেবে। অতএব, তোমরা কোনো কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ তথা অংশীদার করো না, অথচ তোমরা অবগত আছ।"[68]

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।'[69]

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

---

[66] আরকানুল ইসলাম-শায়খ সালেহ আল-উসাইমিন রাহি.

[67] সূরা আল-মায়েদা ৭২

[68] সূরা আল-বাকারা ২১-২২

[69] সূরা বায়্যিনাহ: ৫

জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[70]

তাওহীদের এ অংশটিই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে উল্লেখ করেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে,

وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهٗا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٞ

"আর কাফিররা আশ্চর্য হয়েছিল যে, তাদের কাছে তাদের থেকেই একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী আসলো এবং কাফিররা বলল, এ তো জাদুকর মিথ্যাবাদী। সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে দিয়েছে? নিশ্চয় এটি এক আশ্চর্য বিষয়"। [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৪-৫] তাওহীদের এ অংশ ইবাদতকে খালেস বা নিষ্ঠাসহকারে একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য সত্তা হওয়া এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা যে বাতিল এসব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাওহীদের এ অংশই কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রকৃত অর্থ। কেননা এ কালেমা অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত হক কোনো মা'বুদ নেই, মহান আল্লাহ বলেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ

"এটা এজন্যই যে, আল্লাহ, একমাত্র তিনিই সত্য (মা'বুদ), তাঁকে ছাড়া তারা অন্য যাকেই আহ্বান করে সেসবই বাতিল"।[71]

---

[70] সুরা ঝুমার: ৩

[71] সূরা আল-হাজ ৬২

61- দরসুল আকিদা

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত

هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة، والإيمان بمعانيها وأحكامها

যে সমস্ত আসমাউল হুসনা [আল্লাহর নামসমূহ] এবং তার সিফাত [গুণ] সমূহ; কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে; সেসবের প্রত্যেকটি; একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।[72]

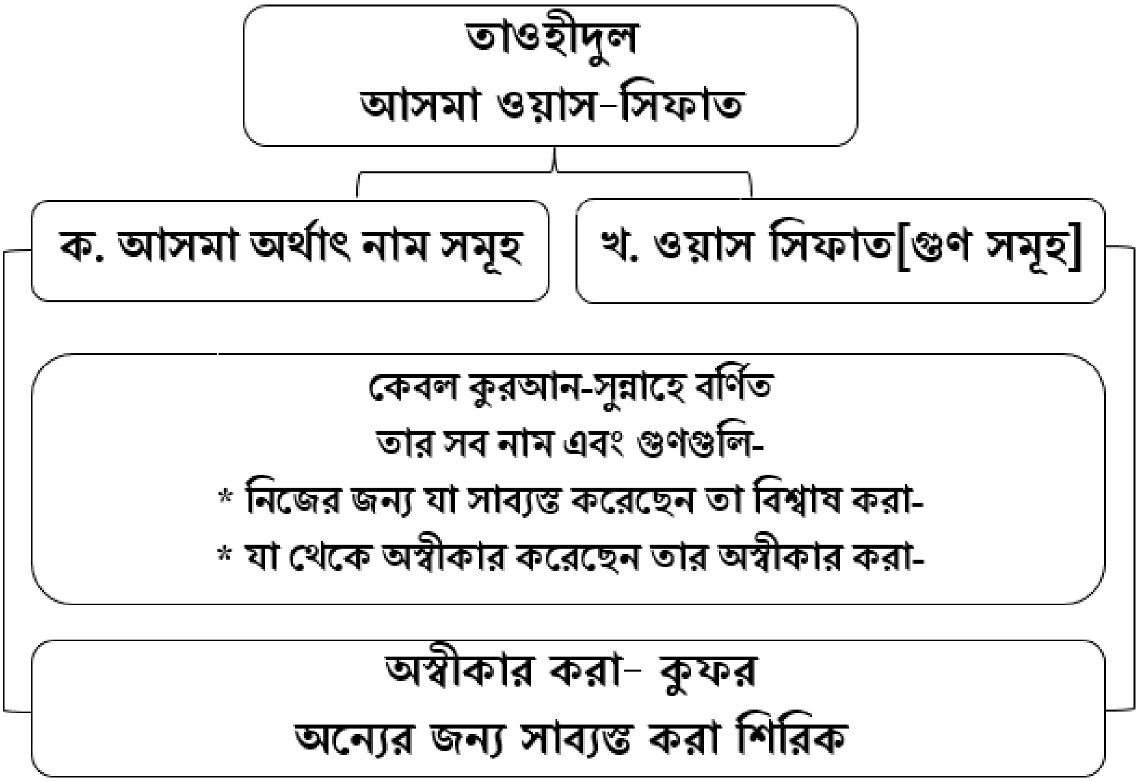

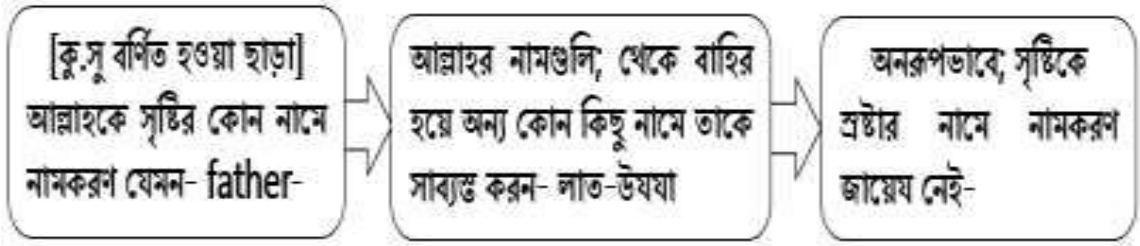

---

72. 19 في توحيد الأسماء والصفات معتقد أهل السنة والجماعة

দলীল

وَلِلَّـهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে সব নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।"[73]

হাদীস- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

আমি আপনার সেই সকল নাম ধরে প্রার্থনা করছি, যে নামগুলো আপনি নিজেই নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অথবা সৃষ্ট জগতের কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনার কিতাবে নাজিল করেছেন অথবা আপনার নিজের কাছেই ইলমে গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান)এ সংরক্ষিত রেখে দিয়েছেন।"[74]

বিবিধ

- ❑ আমাদের কর্তব্য হল, আল্লাহ তাআলা নিজে যে সকল নাম নিজের জন্য পছন্দ করেছেন সেগুলোর ওসিলায় তার নিকট দুআ করা এবং তাকে আহ্বান করা। এমন নাম ধরে ডাকা উচিৎ নয় যা তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেন নি বা যেগুলো কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত হয় নি।
- ❑ অন্য ভাষায় তার নামের অর্থ ধরে আহ্বান করায় কোন আপত্তি নাই। যেমন দয়ালু-করুনাময়-পালনকর্তা ইত্যাদি
- ❑ অনুরূপভাবে অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে বা কাউকে বুঝানোর প্রয়োজনে -খোদা, গড, ঈশ্বর-ভগবান- ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

---

[73] সূরা আরাফ: ১৮০

[74] মুসনাদ আহমদ, হা.৩৭০৪

- ঈশ্বর: (এর স্ত্রী-লিঙ্গ ঈশ্বরী) খৃষ্টানরা যিশুখ্রিস্ট (ঈসা আলাইহিস সালাম) কে ঈশ্বর বলে।
- গড: (এর বহুবচন গডেজ) খৃষ্টানরা যিশুখ্রিস্ট (ঈসা আলাইহিস সালাম) কে ঈশ্বর বলে। এছাড়া
- ভগবান: (এর স্ত্রী লিঙ্গ ভগবতী) হিন্দুরা তাদের পুরুষ দেবতাকে ভগবান আর স্ত্রী দেবতাকে ভগবতী বলে বলে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে বুঝাতে যথাসম্ভব খোদা, গড, ঈশ্বর ইত্যাদি শব্দ পরিত্যাগ করাই ঈমানের দাবী।

সিফাত সমূহের প্রকার

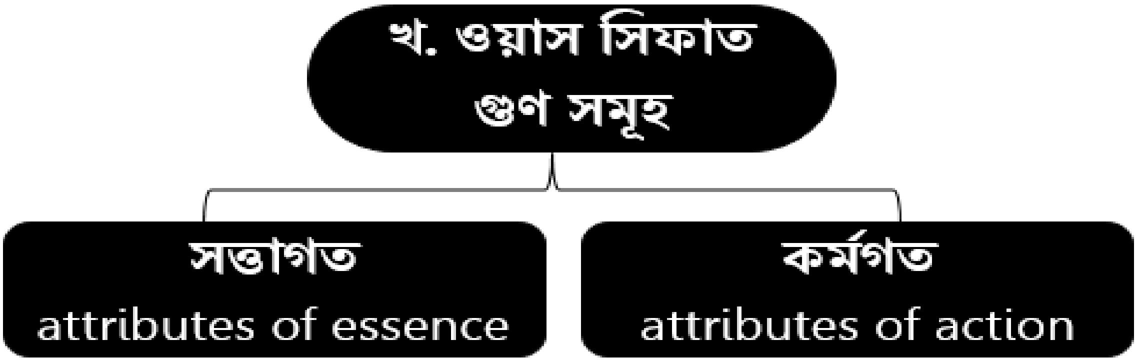

ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন; সিফাতসমূহ দু ভাগে বিভক্ত

1. [সত্তাগত] attributes of essence

(১) হায়াত (জীবন), (২) কুদরাত (ক্ষমতা) (৩) ইলম (জ্ঞান), (৪) কালাম (কথা), (৫) সাম' (শ্রবণ), (৬) বাছার (দর্শন) ও (৭) ইরাদা (ইচ্ছা)। 'আল- ফিকহুল আকবার' ও 'আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থে অন্যান্য যে সকল যাতী সিফাত উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে: (৮) উলুও (العلو) উচুঁ- ৯) ইয়াদ اليد হাত (১০) আল-ওয়াজহ (الوجه): মখুমণ্ডল ও (১১) নাফস (النفس): সত্তা।[75]

[75] আল-ফিক্বহুল আকবার 301

2. [কর্মগত] attributes of action

(১) সৃস্টি করা, (২) রিযক প্রদান করা, (৩) নব-সৃষ্টি করা, (৪) উদ্ভাবন করা ও (৫) তৈরি করা। (৬) ইসতিওয়া (الاستواء) বা আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া, (৭) নুযুল (النزول) বা অবতরণ করা, (৮) গাদাব (الغضب) বা ক্রোধ, (৯) রিদা (الرضا) সন্তুষ্টি, (১০) মহব্বত (المحبة) ভালবাসা, ইত্যাদি।

আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূলনীতী[76]

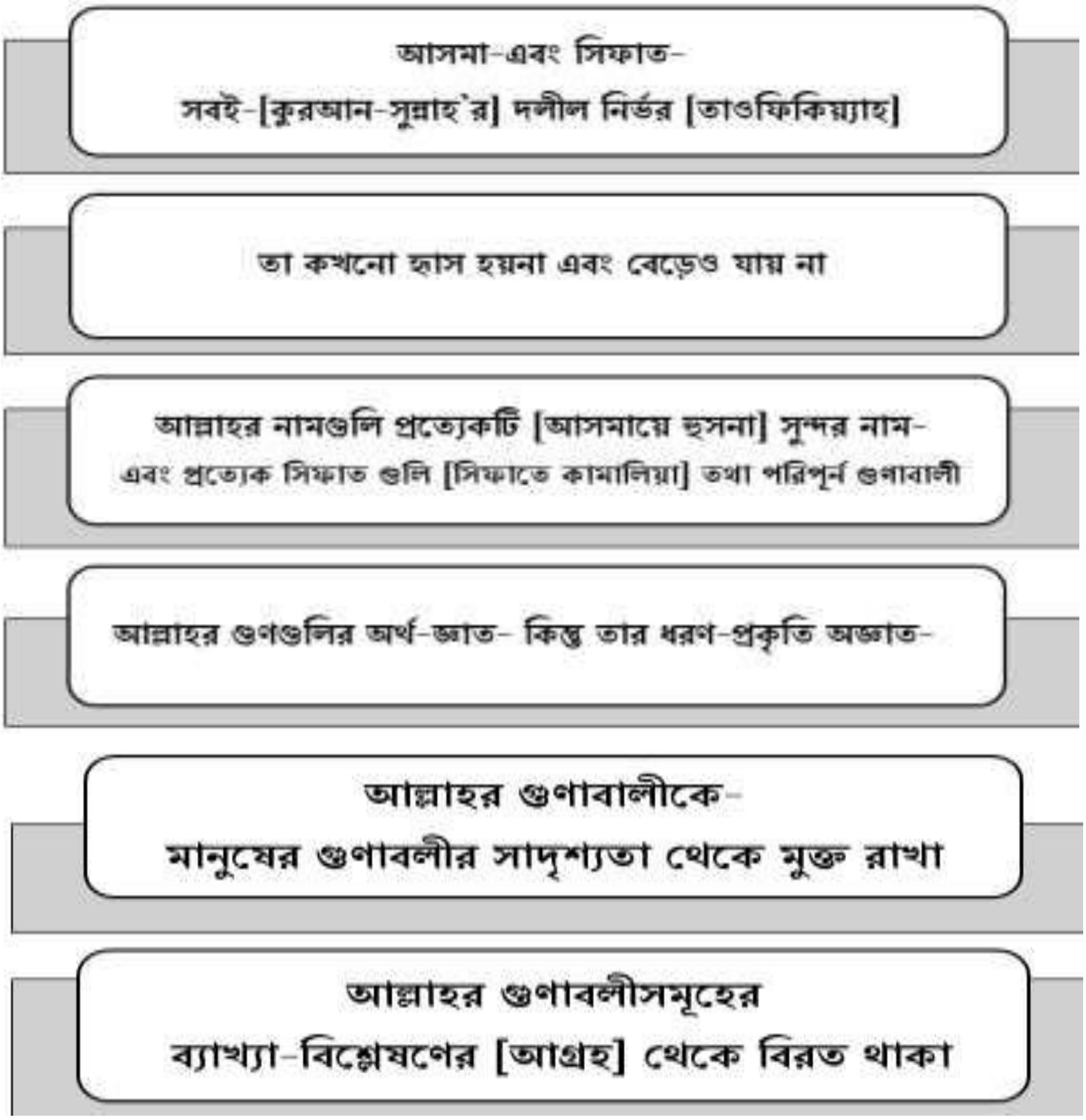

---

[76] منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص 25

65- দরসল আকিদা

কুরআন সুন্নায় বর্নিত বাহ্যিকভাবে আল্লাহর অঙ্গ-প্রতঙ্গ বুঝায়; অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন يد (আক্ষরিক অর্থে হাত) إصبع ইসবা'আ (আক্ষরিক অর্থে আঙুল) وجه ওয়াজহ (আক্ষরিক অর্থে মুখ) ইত্যাদি।

তো আল্লাহর ক্ষেত্রে সম্বন্ধের সময় এসবের অর্থ কি হবে? বিশ্বাস কি বাহ্যিক আক্ষরিক অর্থে হবে নাকি অন্য কিছু?

এসব নিয়ে পূর্বকাল থেকেই তর্ক-বিতর্ক চলেই আসছে। এ তর্ক শুধু বাতিলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো বিষয়টি এমন নয়। হকপন্থীদের ভিতরও আলোচনা পর্যালোচনা, খন্ডন-পাল্টা খন্ডন চলে আসছে। এক্ষেত্রে প্রত্যকে নিজ নিজ ইজতেহাদ ও গবেষণামতে রায়/মতামত দিয়ে গেছেন। কিন্তু হকপন্থীদের সবাই আল্লাহ তায়ালাকে মানুষের আকার-আকৃতি থেকে তানযীহ/পুতঃপবিত্র ভাবেন। তাই এক্ষেত্রে প্রান্তিকতা মুক্ত হয়ে; এক পক্ষ আরেক পক্ষকে হক থেকে বিচ্যুত মনে করা অনুচিত। **তবে এক্ষেত্রে মারাত্মক বিষয় হলো এসব মুতাশাবিহাত দ্বারা আল্লাহর দেহ, আকার, নির্দিষ্ট অবয়ব প্রমাণিত করা হয়। কেউ এমন অমূলক দাবীও করেন যা মুজাসসিমা তথা দেহবাদী আকীদার সাথে মিলে যায়। কেউ আবার বিশাল কলেবরে বই লিখেন আল্লাহর দেহ, আকার, অবয়ব প্রমাণে। আবার অনেকে আল্লাহকে নির্ধিদ্বায় নিরাকার বলে বসছেন।** আল ইয়াযু বিল্লাহ।

উলামায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ [আশআরী-মাতুরিদী-আছারী] আল্লাহর সিফাত এর ব্যাখ্যায়-তাদের ৪টি পন্থা অবলম্বন করেছেন-

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ র সিফাতের ক্ষেত্রে ৪টি পন্থা

1. অর্থ ও মর্ম উভয়টি আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করণ
2. বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ কিন্তু মর্ম আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করণ
3. তাউইল/রূপক ব্যাখ্যা গ্রহণ [আল্লাহর শানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে]
4. আরবি ভাষার রীতি ও বাকধারা অনুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ। নতুবা তাফবীয

1. সালাফের অধিকাংশ; আল্লাহর সিফাতের মাসআলায় ‘তাফবিয’ করেছেন।

তাফবিয [تفويض] পরিচয়

فهو شرعاً: ردُّ العلم بهذه المتشابهات إلى الله تعالى وعدم الخوض في معناها وذلك بعد تنزيه الله تعالى عن ظواهرها غير المرادة للشارع.

‘মুতাশাবিহাত সিফাত; [যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন] এর ক্ষেত্রে তার অর্থ ও ইলমকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা; প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থ থেকে বিরত থাকা। এবং তার অর্থ-তত্ত্ব অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকা।[77] উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলার ‘সিফাতে ইয়াদ [হাত] রয়েছে। ‘ইয়াদ’ অর্থ কী? তা আল্লাহই ভালো জানেন। ‘ইয়াদ’ কেমন? তা মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এবং এর প্রকৃত ইলমও আল্লাহরই কাছে। অর্থাৎ, ইয়াদের অর্থ এবং এর বাস্তবতা উভয়টা আল্লাহর ইলমের দিকে ন্যস্ত করা এবং মাখলুকের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নিরোধ করা।

তাফবিয হলো তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এক সরল পথের নাম।

১. শরিয়াহ যা-কিছু প্রয়োগ করেছে, তা সাব্যস্ত করা।

২. আল্লাহ তাআলার যে-সকল সিফাত এর অর্থ করতে গেলে মাখলুকের [সৃষ্টের] সাথে আকার-আকৃতি,গঠনের দিক দিয়ে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোর হাকিকত বা বাস্তবতা আল্লাহ তাআলার ইলমের দিকে ন্যস্ত করা।

৩. এমন সব বাহ্যিক অর্থ নিরোধ করা, যা তাশবিহ (সাদৃশ্য)-এর সংশয় সৃষ্টি করে। যেমন যা-কিছু অঙ্গের সাদৃশ্যের সংশয় সৃষ্টি করে এবং যা-কিছু ‘নতুন সৃষ্ট` হওয়ার সংশয় সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাআলা থেকে তা নিরোধ করা।

---

[77] الكتاب :أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم وأدلتهم :التفويض والتأويل

‘তাফবিযে’র ক্ষেত্র

আল্লাহ তাআলা`র এমন সিফাত, যার বাহ্যিক অর্থ মানব দেহের গুণ-বিশেষণের দিকে ইঙ্গিত করে। এসব সিফাতের একাধিক অর্থ থাকে। মহান সালাফগণ এগুলোর কোনো একটা অর্থ; প্রকৃত বা রূপক; নির্ধারণ না করে এর ইলম সরাসরি আল্লাহ তাআলার দিকে ন্যস্ত করেন। এ প্রকার সিফাতই হলো ‘তাফবিযে’র একমাত্র ক্ষেত্র।

অধিকাংশ সালাফ ও মাযহাবের ইমামগণ এই [তাফবিয] পন্থাই অবলম্বন করেছেন, এ ধরনের নসগুলো মুতাশাবিহের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং এসব নসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা ও কোনো নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ না করাটাই উচিত। এর ব্যাখ্যার সন্ধানে ডুব দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমরা এর ওপর ইজমালি [ওভারাল] ইমান (ইমানে মুজমাল) রাখবো, অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেছেন তা সত্য এবং এর অর্থ তিনিই জানেন। আমরা বিশ্বাস করবো, আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যবান হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আমরা এ নসগুলোর এমন অর্থ নেবো না, যা সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তা’আলার সাদৃশ্য দাবি করে। বরং আমরা এর সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ করবো না। এর অর্থ আল্লাহ তা’আলার ইলমে ন্যস্ত করবো। যেমনটি আল্লাহ সুব বলেছেন-

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমার ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার অনেক আয়াত ‘মুহকাম’, তা-ই কিতাবের মূল অংশ আর কিছু আয়াত ‘মুতাশাবিহ’ যাদের অন্তরে সত্য লঙ্ঘন প্রবণতা-বক্রতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার মানসে কিতাবের ‘মুতাশাবিহ’ আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এসবের ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী, তারা বলে ‘আনরা এর প্রতি ইমান রাখি। সব আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত’ বোধশক্তির অধিকারীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।”[78]

---

[78] সুরা আলে ইমরানের আয়াত-৭

সালাফদের নিকট 'তাফবীয'

❑ ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন;

لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله تعالى ربّ العالمين.

'কারো পক্ষে এটা উচিত নয়; যে, আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে; নিজ নিজ বুঝ অনুসারে ব্যাখ্যা করবে; বরং আল্লাহ যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন; [তা অস্বীকার করা ব্যতিত] তা তার জন্য সাব্যস্ত করা।'[79]

❑ বিখ্যাত তাবে-তাবয়ী ইমাম সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ রাহ. বলেন;

وَصَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ فَقِرَاءَتُهُ تَفْسِيرُهُ ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلا بِالْفَارِسِيَّةِ

'আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, **সেগুলো পাঠ করাই হল এর তাফসীর।** কারও জন্য এগুলোকে আরবীতে বা ফার্সীতে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়।'[80]

❑ **ইমাম বায়হাকী রাহি. বলেন**

أمضوا الأحاديث على ما جاءت

'এ সংক্রান্ত হাদিসগুলি তার গতিতে চালিয়ে দাও'[81]

❑ ইমাম নববি রহ. বলেন, 'সিফাতের আয়াত এবং হাদিসে আলিমগণের দুটি অভিমত রয়েছে:

وفيها مذهبان، أحدهما، والإمساك عنه مع الإيمان بها ومع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد- وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم

والثاني، تأويله بما يليق

ক. অধিকাংশ সালাফ, বরং সকল সালাফের মাযহাব হলো, তার অর্থের ব্যাপারে কিছু বলা হবে না। বরং তারা বলেন যে, 'আমাদের ওপর অপরিহার্য হলো, আমরা

---

[79] شرح العقيدة الطحاوية ج2 ص427

[80] আল-আসমা ওয়াস সিফাত, লিল বাইহাকী, পৃ:৩১৪

[81] প্রাগুক্ত পৃ. 418

এগুলোর প্রতি ইমান রাখবো। এটি সালাফ এবং জমহুর [সংখ্যাগরিষ্ঠের] মত এটিই সবচেয়ে নিরাপদ

খ. এবং আমরা এর এমন অর্থের আকিদা রাখবো, যা মহান আল্লাহর বড়ত্ব এবং মাহাত্ম্যের সঙ্গে সুসমঞ্জস্য।[82]

❑ ইমাম ত্বাহাবী রাহি. বলেন

تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সীমানা, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং উপকরণ থেকে পবিত্র।[83]

❑ আহমদ বিন হাম্বল-

أنكر على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الأسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل

মহান আল্লাহ তায়ালার শানে দেহ (নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি) আছে বলে সম্পৃক্ত করা হলে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. অস্বীকার করেন এবং এই মতবাদের প্রতিবাদ করে বলেন;

"নিশ্চয়ই বিভিন্ন বস্তুর নাম শরীয়ত এবং ভাষাতত্ত্ব থেকে নেয়া হয়। ভাষাতত্ত্ববিদরা এই সমস্ত শব্দ (দেহ বুঝায় এমন শব্দ) কে প্রনয়ণ করেছেন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, উচ্চতা, গঠন, আকার-আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুর জন্য। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এসব আকার-আকৃতি ও দৈহিক অবয়ব থেকে মুক্ত। সুতরাং দেহ, আকার-আকৃতি বুঝায় এমন শব্দ আল্লাহ তায়ালার শানে প্রযোজ্য হবেনা। যেহেতু তিনি দৈহিক অবয়ব বুঝায় এমন অর্থ থেকে মুক্ত।

এবং শরীয়াতেও মহান আল্লাহকে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় নি। তাই মহান আল্লাহ তায়ালার শানে দেহবিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ বাতিল ও ভ্রান্ত ধারণা।"[84]

---

[82] শারহুল মুসলিম: 5/24

[83] আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

[84] আল আকীদাহ ১/১১১ আবু বকর খল্লালের রিওয়ায়েত, ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল পৃ. ৪৭

❑ ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসী রহ. বলেন;

أمروها كَمَا جَاءَت وردوا علمهَا إِلَى قَائِلِهَا ومعناها إِلَى الْمُتَكَلّم بهَا

আল্লাহ তায়ালা সিফাতসমূহ যেভাবে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই প্রয়োগ হবে, আর তার ইলম ও অর্থ আল্লাহ ও তার রাসূল স. এর উপর ন্যস্ত হবে।[85]

তিনি আরও বলেন; ইমাম আহমাদ রাহ. বলেছেন;

نؤمن بها، ونصدق بها بلا كيف، ولا معنى

(আল্লাহ তায়ালার সাদৃশ্যপূর্ণ) সিফাতসমূহকে কোন প্রকার আকার অবয়ব নিরূপণ করা ও তার অর্থ করা ব্যতীত আমরা বিশ্বাস করি, সত্যায়ন করি।[86]

❑ ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, 'এটা তো সুবিদিত যে, সালাফের মাযহাব হলো- পর্যালোচনা না-করা, পাশাপাশি এটা অকাট্যভাবে দাবি করা যে, এগুলোর বাহ্যিক অর্থ অসম্ভব। তাই তারা বলেন যে, 'এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দাও।'[87]

❑ ইমাম হাফিয ইবনু হাজার রাহ. বলেন

وقد اختلف في معنى النزول على أقوال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة

আল্লাহর নুযুল (শাব্দিক অর্থে অবতারণ করা বুঝা যা একটি মুতাশাবিহাত কেননা ইহা মাখলুকের সাথে নড়াচড়া ও অবস্থান পরিবর্তনের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ) অর্থ নিয়ে অনেক মত আছে।

এর মধ্যে যারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয় তারা মুশাব্বিহা নামক বাতিল ফেরকাভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই বক্তব্য থেকে পবিত্র।

আরেকদল আছে যারা সার্বিকভাবে এসমস্ত হাদীসের শুদ্ধতাকে অস্বীকার করে তারা হলো খারেজী আর মু'তাজেলা নামক বাতিল ফেরকা।[88]

---

[85] যাম্মুত তাউইল ১/১১

[86] লুম'আতুল ই'তিকাদ পৃ. ৭

[87] তাফসিরে কুরতুবি: ৪/১২

- ইমাম গাজালী রাহ. বাহ্যিক অর্থ নিরূপণ করে তাদের গোমরা বলেছেন।

وقد تحزب الناس فيه فضل فريق واجروه على الظاهر وتبعهم آخرون إذ ترددوا فيه وان لم يجزموا وفاز من قطع بنفي الاستقرار فإن تردد في مجمله ورآه فلا يعاب عليه وتكلف تعلم الادلة على نفي الاستقرار

ইমাম গাযালি রহ. বলেন, ‘এ ব্যাপারে লোকেরা কয়েক দলে ভাগ হয়েছে। তাদের একদল গোমরাহ হয়েছে এবং তারা এগুলোকে বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করেছে। আরেক দল তাদের অনুগামী হয়েছে। তারা দ্বিধা করেছে, যদিও দৃঢ় হতে পারেনি। সফল হয়েছে সে, যে অকাট্যভাবে ‘স্থিরতা’কে নিরোধ করেছে।’[89]

- মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে ইমাম খাত্তাবী রাহ. সালাফ ও ফুকাহাদের মানহাজ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন;

وأن لا يريغوا لها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها.

সালাফগণ এসব শব্দের অর্থ জানতে চায় না। এবং নিছক নিজের জানামতে এসব শব্দের তাউইল/ব্যাখ্যা করেন না। যেহেতু তারা এসব শব্দের প্রকৃতজ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম নন।[90]

- বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম সূয়ুতী রহ: বলেন,

من المتشابه آيات الصفات... وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له – تعالى – عن حقيقتها

অর্থ: সিফাতের আয়াতগুলো মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভূক্ত। সালাফ এবং মুহাদ্দিসগণসহ অধিকাংশ আহলে সুন্নতের মাজহাব হল, এসব শব্দের উপর ইমান রাখতে হবে। শব্দের উদ্দেশ্য ও অর্থকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করতে হবে (যাকে তাফউইদ্ব বলে)এগুলোর কোন বিশ্লেষণ করা হবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে, শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত ও পবিত্র।[91]

---

[88] ফাতহুল বারী ৩/৩০

[89] আল মানখুল ১/২৫১

[90] মা'য়ালিমুস সুনান ৪/৩৩১

[91] আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, খ: ২/১০

২. বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ কিন্তু মর্ম আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

সালাফদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো- আমরা বিশ্বাস করব এ সব নসের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে সৃষ্টির দিকে নিসবত হলে এ শব্দগুলোর যে অর্থ হয়, আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত হলে এ শব্দগুলোর অর্থ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। কারণ "কোনো কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয় (সুরা শুরা. ১১) হাঁ, আল্লাহ তা'আলারও হাত, চোখ ইত্যাদি রয়েছে, তবে আল্লাহর এই গুণগুলোর সাথে সৃষ্টির হাত, চোখের কোনোই মিল নেই। এগুলোর আকৃতি কেমন তা জানার কোনোই পথ নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তা জানেন।

- ❁ প্রথম গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, কোনো ধরনের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ না করে প্রথমেই এই নসগুলোর অর্থ আল্লাহর তা'আলার ইলমে ন্যস্ত করা।
- ❁ আর দ্বিতীয় গ্রুপের প্রথমে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেছেন। এরপর-

তার রূপ ও আকৃতির জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলমে ন্যস্ত করেছেন। তবে উভয় দলই মনে করেন, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার এসব গুণাবলির কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই। এসব নসের ব্যাখ্যায় প্রচলিত কোনো অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই।

- ❑ **ইমাম মালিক রাহি. কে আল্লাহ তাআলার এসব গুণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন-**

معناها معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب

"এসবের অর্থ - **পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত**, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত এবং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী।"

- ❑ ইমাম তিরমিযী রাহি. রাহি.

وَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الأَئِمَّةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الأَشْيَاءَ ثُمَّ قَالُوا تُرْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَنُؤْمِنُ بِهَا وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ

الْحَدِيثِ أَنْ تُرْوَى هَذِهِ الأَشْيَاءُ كَمَا جَاءَتْ وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلاَ تُفَسَّرُ وَلاَ تُتَوَهَّمُ وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ .

সুফইয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, ইবনু মুবারাক, সুফইয়ান ইবনু উআইনা ও ওয়াকী (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ **এই জাতীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, তা বর্ণনা করা যাবে এবং আমরা এগুলোতে বিশ্বাস করি। কিন্তু এগুলো কেমন হবে তা প্রশ্ন করা যাবে না।**

মুহাদ্দীসগণও এই মতামত গ্রহণ করেছেন যে, যেভাবে এই জাতীয় হাদীস বর্ণিত হয়ে এসেছে, ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা যাবে এবং এই বিষয়ের উপর বিশ্বাসও রাখতে হবে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং সংশয় পোষণও করা যাবে না, তার হাত-পা এগুলো কেমন তাও বলা যাবে না। আলিমগণ এই অভিমতই অবলম্বন করেছেন। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "তিনি তাদের সামনে তার পরিচিতি উপস্থাপন করবেন"-এর তাৎপর্য এই যে, তিনি তাদের সামনে নিজের নূরের তাজাল্লী প্রকাশ করবেন।[92]

3. তাউইল/ব্যাখ্যা: সালাফদের মুষ্ঠিমেয়; খালাফ [পরবর্তী] সময়ের কিছু ইমামগণ; কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত; আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে; একান্ত প্রয়োজন সাপেক্ষে আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী [তাউইল/রূপকার্থে] কিছু ব্যাখ্যা করেন। তবে তারাও সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার গুণের কোনো সাদৃশ্য গণ্য করেন না। মূলত. খাইরুল কুরূনের পর যখন ফেতনা আর ভ্রান্ত মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তখন উলামায়ে কেরাম মানুষকে বুঝানোর সুবিধার্থে তাউইলের প্রয়োজন বোধ করেন।

কুরআন থেকে কিছু উদাহরণ

আল্লাহ তায়ালার শানে আক্ষরিক অর্থ ব্যতিরেকে রূপক অর্থ প্রয়োগ সালাফ-খালাফ উলামাদের মধ্যে প্রচুর পাওয়া যায় নিম্নে কিছু পেশ করা হলো

- ❑ ইবনে আব্বাস রাযি. সুরা কলামের ৪২ আয়াত

[92] প্রাগুক্ত- হাদিস নং- 2557

يوم يكشف عن ساق

এর তাফসিরে সরাসরি আল্লাহর ‘সাক্ব’ (যা শাব্দিক অর্থে পায়ের গোছা বুঝায়) উদ্দেশ্য না নিয়ে তাউইল উল্লেখ করেছেন।[93]

- ইমাম বুখারী রাহি. সহীহ সনদে ইমাম সুফইয়ান সাওরী রাহ. এর ভাষ্যমতে সূরা হাদীদের ৪নং আয়াতে তাউইল [রূপক অর্থ] উল্লেখ করেছেন।

وقال ابن معدان، سألت الثوري: {وهو معكم أينما كنتم} ، قال: علمه

‘বান্দার সাথে আল্লাহর অবস্থান/থাকা নিয়ে ইবনে মা`দান বলেন আমি সুফইয়ান সাওরী রাহি. কে জিজ্ঞাস করেছিলাম এই আয়াত **‘তোমরা যেখানে আল্লাহ তুমাদের সাথে আছেন’** সম্পর্কে; তিনি বলেন এর অর্থ ; **আল্লাহর ইলম [জ্ঞান] সর্বত্র।**

- অনুরূপভাবে সহীহ বুখারীতেও সূরা কাসাসের ৮৮নং আয়াতের তাফসিরে `আল্লাহর ওয়াজহ’ (যা শাব্দিক অর্থে চেহারা বুঝায়) তাউইল করে তার অর্থ `রাজত্ব’ উল্লেখ করেছেন।’

{كل شيء هالك إلا وجهه}:إلا ملكه،

- ইমাম ইবনু কাসীর রাহ. সুরা ইনসান/দাহরের ৮নং আয়াতের তাফসিরে আল্লাহর ওয়াজহ (যা শাব্দিক অর্থে চেহারা বুঝায়) তাউইল উল্লেখ করেছেন।

إنما نطعمكم لوجه الله أي: رجاء ثواب الله ورضاه

‘আল্লাহর সন্তুষ্টির এবং সাওয়াবের জন্য আমরা অপরকে খাওয়াই’[94]

- ইমাম জাওহারী রাহ. বলেন; ইয়াদের (রূপক) অর্থ শক্তি। যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন;

(والسماءَ بَنيناها بأيْدٍ) أي طاقةٌ.

আকাশকে আমি নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।[95]

- ইমাম রাগেব ইসফাহানী রাহ.

---

93 তাফসীরে তবারী ২৩/৫৫৩, তাফসীরে ইবনু কাসীর ৯/১৯৮

94 তাফসীরে ইবনে কাসীর ৮/২৮৯

95 আস সিহহাহ ৬/২৫৪০

وقوله: يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ أي: نصرته ونعمته وقوّته،

সুরা ফাতহের ১০ নং আয়াতে ইয়াদের অর্থ সাহায্য করা , নেয়ামত দান ও শক্তি দ্বারা করেছেন।[96]

- অনুরূপভাবে আল্লাহর ইরশাদ

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

`পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই; যা তার পূর্ণ আয়ত্বাধীন নয়'[97]

অথচ ` نَاصِيَة অর্থ মাথার চুলের অগ্রভাগ; কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে রূপক অর্থ নেওয়া ছাড়া এখানে কোন উপায় নেই।

- ইমাম নববী রাহ. যথার্থ বলেন;

فَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى التَّأْوِيلِ لِرَدِّ مُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ تَأَوَّلُوا حِينَئِذٍ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ العلماء فِي هَذَا والله أعلم

যদি কোন ভ্রান্ত মতালম্বীর খন্ডনে তাউইলের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন উলামায়ে কেরাম তাউইল করে থাকে।[98]

হাদিস থেকে তাউইল করার কিছু উদাহরণ

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ وَالأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)"

তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ কিয়ামতের দিন আসমানকে এক **আঙ্গুলের ওপর**, পৃথিবীকে এক **আঙ্গুলের ওপর**, পর্বতমালাকে একটি **আঙ্গুলের ওপর,** বৃক্ষলতা ও নদ্বীনালাকে **আরেকটি আঙ্গুলের ওপর** এবং সকল সৃষ্টিকে **এক**

[96] আল মুফরাদাত. ৮৯১

[97] সূরা হুদ/৫৬

[98] আল মাজমুউ ১/২৫

<u>**আঙ্গুলের ওপর রেখে দিবেন**</u> এবং <u>**নিজ হাতে**</u> ইশারা দিয়ে বলবেন, সম্রাট একমাত্র আমিই। এর সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন এবং বললেনঃ তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি।[99]

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখিত হাদীসে ইসবা'আ [আঙ্গুল] ও ইয়াদ [হাত] শব্দদ্বয় ব্যবহার হয়েছে।

ইসবা'আ এর অনুবাদ নিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসের শব্দতত্ত্ববিদ ইমাম ইবনুল আসীর রাহ. বলেন

الأَصَابِع :جَمْعُ أَصْبُع، وَهِيَ الجَارحة. وَذَلِكَ مِنْ صِفات الأَجْسام، تَعَالَى اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَتَقَدَّسَ.

وإطلاقُها عَلَيْهِ مجازٌ كإطْلاق اليدِ، واليمين، والعَين، وَالسَّمْع، وَهُوَ جَارٍ مَجْرَى التَّمْثِيلِ والكِنَايَة عَنْ سُرَعة تقلب القُلُوب، وَإِنَّ ذَلِكَ أمرٌ معقُود بمشيئَةِ اللهِ تَعَالَى. وتخصيصُ ذِكر الأَصَابِع كِنايةٌ عَنْ أَجْزَاءِ القُدْرة والبَطْش، لأنَّ ذَلِكَ باليَدِ، والأَصَابِع أجزاؤُها.

``আসাবি'ঈ/আঙুলসমূহ। ইহা ইসবা'উন/আঙুলের বহু বচন। দেহের একটি অঙ্গ। **আঙ্গুলি থাকা দেহের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা এসব থেকে পুতঃপবিত্র।** আল্লাহ তায়ালা শানে ইহা মাজাজী/রূপক অর্থে ব্যবহৃত। যেমন; ইয়াদ (হাত) ইয়ামীন (ডানহাত) ইত্যাদীর প্রয়োগ মাজাজী/রূপকার্থে হয়ে থাকে।[100]

আল মু'জামুল ওয়াসীত্বে উল্লেখ আছে

الإِصْبَعُ، والأُصْبُع : أَحَدُ أطراف الكفّ أو القدم. والجمع : أصابعُ .وتطلق الإصبعُ على الأثرِ. يقال: عليه من الله إصبعٌ حسنةٌ: أثرُ نعمَةٍ .وهو حَسَنُ الإصبعُ في ماله .وله في هذا الأمر إصبع.

হাত অথবা পায়ের একটি অঙ্গ। বহুবচন: আসাবি'ঈ। আরবী ভাষায় ইসবা'আ/আঙুল কোন কিছু চিহ্ন/নিদর্শন বুঝাতেও ব্যবহার হয়। (এরপর কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে)

---

[99] সহীহ বুখারী হা. 6943

[100] আন নিহায়া 3/9

ইয়াদ [হাত] অনুবাদ নিয়ে

বহুল প্রচলিত আরবি অভিধান আল মু'জামুল ওয়াসীত্বে আছে

اليَدُ : (معجم الوسيط) : اليَدُ :من أَعضاء الجسد، وهي من المنكب إِلى أَطراف الأَصابع [مؤنثة].

"ইয়াদ অর্থ শরীরের একটি অঙ্গ। কাঁধ থেকে নিয়ে আঙুলের মাথা পর্যন্ত অঙ্গকে ইয়াদ (হাত) বলে।"

৪ .কিছু সংখ্যক আলিম উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝে সমন্বয় করেন- অর্থাৎ, আরবি ভাষার রীতি ও বাকধারা অনুযায়ী যদি সহজেই তা ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তারা ব্যাখ্যা করেন। আর যদি স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে তারা নসের অর্থ আল্লাহ তা'আলার ইলমেই ন্যস্ত করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বুঝার তাওফিক দান করেন।

هذا إن كان الصواب فمن الرحمن و إن كان الخطأ فمني و من الشيطان. و الله تعالي أعلم بالصواب

আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি দা. বা. বলেন-

- `বাস্তব কথা হল, আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির সাথে সবধরনের সাদৃশ্য থেকে- পবিত্র ঘোষণা করে উপরিউক্ত চার পন্থা যে-কোনোটাই গ্রহণ করা হলে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে চলনসই। কোরআন-সুন্নাহর আলোকে কোনোটাকেই পাইকারিভাবে ভুল ও ভ্রান্ত বলার অবকাশ নেই। পন্থা বিভিন্ন হলেও আদতে আকিদায় ভিন্নতা নেই। কেননা আকিদা হলো- আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। একই আকিদা প্রকাশের ভাষা কেবল ভিন্ন ভিন্ন। যদিও সবচে নিরাপদ প্রথম মাযহাব, যা অধিকাংশ আকাবির-আসলাফের মানহাজ। অন্যান্যগুলোকেও ভুল বা ভ্রান্ত বলার সুযোগ নেই।
- তবে তিক্ত বাস্তবতা হলো, এই মাসআলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান চরম সীমালঙহন করেছে। এমনকি এই চার মতের অনুসারীরা পরস্পর পরস্পরকে গালমন্দ করেছে, গোমরাহ বলে অভিহিত করেছে, 'মুশাববিহা' 'মুআততিলা' আখ্যা দিয়েছে। নিজেরাও এতো পরিমাণ বাড়াবাড়ি করেছে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত

হয়েছে যে, নিজেদের মতের সীমারেখা অতিক্রম করে বাতিল ফিরকার ত্রি-সীমানায় পৌঁছে গেছে। যেমন আমরা একটু আগে দেখিয়ে এসেছি, প্রথম এবং দ্বিতীয় মাযহাবের মাঝে মৌলিকভাবে তেমন পার্থক্য নেই। প্রাথমিক যুগগুলোতে এমনভাবেই চলেছে। অথচ পরবর্তীতে বিবাদ-বিতর্ক বেড়ে এর অনুসারীদের মুখ থেকে এমন এমন কথা-মন্তব্য বেরিয়েছে, যা শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। দ্বিতীয় মাযহাবকে তাশবিহ-তাজসিম বলে অভিহিত করা হয়েছে আর প্রথম মাযহাবের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে তা’তিল। যা ছিলো অধিকাংশ সালাফের মাযহাব; তাকেই দ্বিতীয় মাযহাব (তাবিল) এর থেকেও নিকৃষ্টতর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

❑ উপরিউক্ত চারওটা মাযহাব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহরই মাযহাব; যার ওপর সাহাবা-তাবেয়িন চলে গেছেন। সুতরাং সবগুলোই হক। কোনোটাকে ভুল বলার অবকাশ নেই। আমার কাছে যেটাকে অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়, আমি সেটাকে গ্রহণ করবো। কিন্তু বিপরীত মাযহাবগুলোর ব্যাপারেও যথাযোগ্য শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখবো। আজকাল তো দেখা যায়, দীনের মৌলিক জ্ঞানই নেই, দু-চার কট্টর লেখকের কিতাব পড়েই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্যান্য সব মাযহাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে থাকে, সভ্যতা বর্জন করে যাচ্ছেতাই মন্তব্য করে বসে। আর সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে আর কী বলবো, উম্মাহর বিদগ্ধ আলিমগণের কেউও কখনো কখনো সীমালঙ্ঘন করে এমন কথা বলে বসেন, যা হাজারো বরং লাখো মানুষের গোমরাহির কারণ হয়ে যায়।

❑ শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহি. তার একটি লেখায় বলেছেন- “তাফবিয (ওপরে বর্ণিত প্রথম মাযহাব, যা অধিকাংশ সাহাবা-তাবেয়িনের মাযহাব) বেদআতি মুলহিদদের বক্তব্যের থেকেও নিকৃষ্টতর”। [দারউ তাআরুজিল আকলি ওয়ান নাকলিঃ ১/২০৫] শুধু এই এক জায়গায়ই নয়, আরো অনেক জায়গায়ই শায়খ রাহি. এমন বক্তব্য-মন্তব্য পাওয়া যাবে। আল্লাহ শায়খ রহ. কে জান্নাতের উঁচু মর্যাদায় আসীন করুন। তার এবং তার অনুসারী আরো অনেক আলিমদের এমন কিছু কিছু বক্তব্য-অভিমত হাজারো মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে এবং হচ্ছে। আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। সিরাতে মুসতাকিমের ওপর

অবিচল রাখুন। প্রান্তিকতা থেকে বেঁচে ভারসাম্যের সাথে যিন্দেগি গুজরান করার তাওফিক দান করুন। আমিন।[101]

আল্লাহর একটি সিফাতের উদাহরণ

[কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْۘ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ

"ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, বরং তাদের হাতই বন্ধ। তাদের উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, বরং আল্লাহর উভয় হাত সদা উম্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন।"[102] **এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য দু'টি হাতের কথা বলেছেন, যা দানের জন্য সদা প্রসারিত।** এর ওপর ঈমান [ইজমালি] আনতে হবে; অস্বীকারা করা যাবেনা [মুয়াত্তিলাদের মতো] কিন্তু আমাদের উচিৎ আমরা যেন অন্তরে আল্লাহর হাত কেমন হবে সে সম্পর্কে কোনো কল্পনা না করি এবং কথার মাধ্যমে যেন তার ধরণ বর্ণনা না করি ও মানুষের হাতের সাথে তুলনা না করি। [মুজাস্সিমাদের মতো] অর্থাৎ, অর্থ-জ্ঞাত- কিন্তু তার ধরণ-প্রকৃতি অজ্ঞাত' [এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মত][103] কেননা আল্লাহ বলেছেন,

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[104]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর হাত দু'টিকে মানুষের হাতের সাথে তুলনা করল, সে আল্লাহর বাণী "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়" একথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং

فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡثَالَۚ

"তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না"।[105] এর বিরুদ্ধাচরণ করল।

---

101 মাকালাতুল উসমানিঃ ১ম খণ্ড

102 সূরা আল-মায়েদা ৬৪

103 আরকানুল ইসলাম পৃ-২৬-২৭

104 সূরা আশ-শূরা. ১১

তাই 'মুশাববিহা' (মুজাসসিমা) এবং 'মু'আত্তিলা' উভয় গোষ্ঠীই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে গোমরাহ-ভ্রান্ত।

[হাদিস]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

"يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلاَ يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ . فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ أَلاَ تَتَّبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا .وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ-

'কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন, তারপর রাব্বুল আলামীন তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলবেনঃ পৃথিবীতে যে যার অনুসরণ করতো, এখন কেন সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না? অতএব, ক্রুশ পূজারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তি পূজারীদের জন্য মূর্তি, অগ্নি উপাসকদের জন্য আগুন উপস্থাপন করা হবে এবং সকলেই নিজ নিজ পূজনীয় মা'বুদদের সাথে চলবে। আর মুসলিমগণ তাদের জায়গাতেই থেকেই যাবে। রাব্বুল আলামীন তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে হয়ে বলবেন,

أَلاَ تَتَّبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا

তোমরা কেন ঐসব মানুষদের অনুসরণ করছে না? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, নাউযুবিল্লাহ মিনকা (আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) আল্লাহ তা'আলাই আমাদের প্রভু। আর এটা আমাদের জায়গা। আমরা আমাদের প্রভুর সাক্ষাৎ পাবার পূর্বমুহুর্ত পর্যন্ত এ স্থান ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিবেন এবং তাদেরকে নিজ জায়গায় অটল রাখবেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা কেন ঐ সব মানুষের অনুসরণ করছে না? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, আল্লাহ আমাদের রব এবং এটা

---

[105] সূরা আন-নাহল, ৭৪

আমাদের অবস্থানস্থল। আমরা আমাদের রবের দেখা পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ জায়গা ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে আদেশ দিবেন এবং স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা কি আমাদের প্রভুর দেখা পাবো? তিনি বললেনঃ

"وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ"

তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে অন্যদেরকে কষ্ট দিতে হয়? তারা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি,বললেনঃ অনুরূপভাবে সে সময় তোমরা তাকে দেখার জন্য তোমাদের কাউকেও যন্ত্রণা দিতে হবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আড়ালে চলে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে নিজের পরিচিতি উপস্থাপন করে বলবেন? আমিই তোমাদের প্রভু। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মুসলিমগণ উঠে দাড়াবে। চলার পথে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তারা তা খুব সহজেই দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের মতো অতিক্রম করবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবেঃ সাল্লিম সাল্লিম' জাহান্নামীরা অতিক্রম না করতে পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং জাহান্নামকে প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? আবার আরেকটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? এভাবে সমস্ত জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে,

وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا وَأُزْوِيَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ

তখন দয়ালু প্রভু আল্লাহ তা'আলা তার পা এর উপর রাখবেন এবং এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলবেন, যথেষ্ট হয়েছে তো। জাহান্নাম বলবে, হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন মৃত্যু'-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফাআত লাভের আশায় আত্মপ্রকাশ

করবে। তারপর জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চিনো? জান্নাতী ও জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা মৃত্যু যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এরপর আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই।[106]

সমসাময়িক কোন কোন উলামা তাওহীদের আরেক প্রকারকে আলাদা করেন উল্লেখ করেন-

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ

তাওহীদুল হাকিমিয়্যার সংজ্ঞা: ‘বিধান ও রাষ্ট্র- সংবিধান প্রনয়েণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক ও একক মানা।’

তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ`র দলীল-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

‘বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।’[107]

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

‘আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।’[108]

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

‘তিনি কাউকে নিজ বিধানের ক্ষেত্রে শরীক করেন না।’[109]

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

---

[106] তিরমিযী ২৫৫৭

[107] সুরা ইউসূফ: ৪০

[108] সুরা রা’দ: ৪১

[109] সুরা কাহফ: ২৬

'তারা কি জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম বিধান কার রয়েছে?'[110]

তাওহিদ সম্পৃক্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কালিমাতুত তাওহীদ

সূ চী প ত্র

- **কালিমার রুকন ও ফযীলত**
- **কালিমার শর্ত**
- **'আল ওয়ালা' [বন্ধুত্ব] ওয়াল বারা [শত্রুতা]**
  ﴿الولاءُ والبراءُ في الإسلام﴾
- **ইসলামী আকিদায় ন্যাশনালিজম/জাতীয়তাবাদ**

কালিমার রুকন

❑ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহি. বলেন-

''কালিমার দু'টি দিক রয়েছে, একটি নেতিবাচক, অপরটি ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকটি হচ্ছে, 'কোনোই মা'বুদ নেই' এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত

---

110 সুরা মায়েদা: ৫০

করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, ‘আল্লাহ ব্যতীত’ এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহ’র জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোনো অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোনো অংশীদার থাকতে পারে না।’’ [111]

আল্লাহ তা‘আলা সকল মানুষের ওপর তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা ফরয করে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “**তাগুত**” বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, কোনো বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা অতিক্রম করেছে; হতে পারে তা কোনো উপাস্য অথবা অনুসৃত ব্যক্তি অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা। বস্তুত তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি:

(১) শয়তান (তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত

(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়।

---

[111] উসুলুস সালাছা পৃ 18

(৪) যে ব্যক্তি গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবী করে।

(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো প্রকার জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ নেই নিশ্চয় হিদায়াত থেকে বিভ্রান্তি স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি "তাগুতকে" অমান্য করল এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোনো দিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ"[112]

ফযীলত

ক. 'কুতুবে সিত্তা' (হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে) আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন,

الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله

'ঈমানের সত্তরেরও কিছু অধিক শাখা আছে। যার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা।'[113]

খ. আবু হুরায়রা রা. থেকে এ হাদীস বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جددوا إيمانكم، قيل : يا رسول الله! وكيف نجدد إيماننا؟ قال : أكثروا من قول لا إله إلا الله.

'তোমরা নিজেদের ঈমান তাজা করতে থাক।' আরজ করা হল, আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আমাদের ঈমানকে তাজা করব? বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বেশি বেশি বল।[114]

গ. হযরত জাবির রা.-এর প্রসিদ্ধ হাদীস, রাসূল সা. বলেন-

---

[112] সূরা আল-বাকারা ২৫৬

[113] বুখারী

[114] মুসনাদে আহমদ, ৮৭১০; আলমুসতাদরাক, হাকিম ৪/২৫৬

أفضل الذكر لا إله إلا الله

সকল যিকরের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’[115]

ঘ. আবু সায়ীদ খুদরী রা.থেকে বর্ণিত. আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ. এর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন-

لو أن السموت السبع والأرض السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.

‘যদি সাত আসমান ও সাত যমীন এক পাল্লায় রাখা হয় আর ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা ভারি হবে।’[116]

কালেমার শর্ত

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।[117]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার হক ও ফরযসমূহ আদায় করা এবং তার শর্তসমূহ পূর্ণ করা জরুরি, যা কুরআন ও সুন্নাহয় রয়েছে। একটি বিষয় প্রত্যেক মুসলিম জানে যে, যেসব ইবাদত দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করি সেসব ইবাদাতের নিজস্ব কিছু শর্ত রয়েছে, যা ব্যতীত সংশ্লিষ্ট ইবাদাত গ্রহণ করা হয় না। যেমন, সালাত অযু ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না, অনুরূপ হজ তার শর্ত ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না, অনুরূপ সকল ইবাদাত নির্ধারিত শর্ত ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না, যেসব শর্ত কুরআন ও সন্নাহয় বিধৃত হয়েছে। অনুরূপ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণ করা হয় না, যতক্ষণ না বান্দা তার শর্তসমূহ পূরণ করবে, যার বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে।

---

115 সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৮০০; জামে তিরমিযী, ৩৩৮৩

116 সুনানে নাসায়ী ১০৬০২, ১০৯১৩; সহীহ ইবনে হিববান, ৬২১৮

117 সূরা বাক্বারা-৮

আমাদের সালাফ (পূর্বসূরিগণ) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তের ওপর জোর তাগিদ করেছেন। কারণ, শর্ত বাস্তবায়ন করা ব্যতীত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কালেমা) তার পাঠককে কোন উপকার করবে না। একবার হাসান বছরী রহ. কে প্রশ্ন করা হল, শায়েখ! কিছু লোক যে বলে,

من قال انة لاإله إلا الله دخل الجنة

যে ব্যক্তি পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' প্রতিউত্তরে বলেছিলেন-যে ব্যক্তি কালিমা পাঠ করল এবং তার হক ও ফরজ আদায় করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[118]

ইবনে আব্বাস রা. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন: অবশ্যই, তবে প্রত্যেক চাবির দাঁত রয়েছে, তুমি যদি দাঁত বিশিষ্ট চাবি নিয়ে আস তোমার জন্য খোলা হবে, অন্যথায় খোলা হবে না। তিনি দাঁত বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তের দিকে ইশারা করেছেন"[119]

---

[118] জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম- ইবনে রজব হাম্বলী

[119] আছার-কালিমাতুল ইখলাস পৃ.১৪

তাই উলামারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে `কালিমা’র নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আহরণ করেছেন..

কুরআন-সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত কালিমার শর্তসমূহ

প্রথম শর্ত - ইলম বা জ্ঞান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, فاعلم انه لا اله الا الله তুমি জেনে রাখো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)।” (মুহাম্মদ-১৯) [তাওহীদের] এলেম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের প্রথম শর্ত নিধারণ করা হয়েছে। তাই ইসলামের মৌলিক আকিদা সম্পর্কে জাহল বা মূর্খ থাকা এটি কোন এক্সকিউজ বা ওজর নয়।

কালেমার শব্দসমূহের জ্ঞান অর্জন - কালেমা দু'টি অর্থপূর্ণ বাক্যের সমষ্ঠি

১. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ (রব) নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। কালেমার প্রথম অংশকে "তাওহীদ" ও দ্বিতীয় অংশকে "রিসালাত" বলা হয় উভয় অংশে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"

- ❑ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ পাক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন নাযিল করা হয়েছে।
- ❑ রাসূল (সাঃ) এর প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে সুন্নাহ বলে যা- আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক অনুমোদিত; এটিও অহী। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাত অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। দলীল "সে [মুহাম্মদ (সাঃ)] মনের ইচ্ছায় বলেন না। বরং তা অহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।"[120]
- ❑ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিশ্বজগতের সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী সম্পন্ন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।
- ❑ আমাদেরকে অবশ্যই রাসূল (সাঃ)-কে সবকিছু (ব্যক্তি ও বস্তু) অপেক্ষা বেশি ভালবাসতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান এবং সমগ্র মানবকুল অপেক্ষা আমাকে বেশী ভাল না বাসবে।[121]

---

[120] আন-নাজম ৩-৪

দ্বিতীয় শর্ত - (আল-ইয়াক্বীন) তথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস স্থাপন আমাদেরকে অবশ্যই শাহাদার প্রথম শর্তের [তাওহীদ ও রিসালাত] উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর রাসূল (সাঃ), ফেরেস্তা, আসমানী কিতাবসমূহ, বিচার দিবস, তাক্‌দীর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির ব্যাপারেও কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই। আল্লাহ সুব. বলেন-

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾

"*প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ করে না* এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। শুধুমাত্র তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী।"[122]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তার রাসূল। যে কোনো বান্দা এ দু'টি বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ব্যতীত আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে যাবে"[123] এ হাদীসে তিনি কালেমার জন্য ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস শর্তারোপ করেছেন।

- ❑ আমাদেরকে আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় ঈমান আনতে হবে যেরূপ তিনি-

'ইসরা' ও 'মিরাজের' ব্যাপারে ঈমান এনেছিলেন। একদা আবু জেহেল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কেউ যদি তোমাকে এরূপ বলে যে, সে একরাতে মাসজিদুল আকসা, সাত আসমান, বেহেস্ত, দোযখ পরিভ্রমণ শেষে আবার ঐ রাতেই মক্কায় ফিরে এসেছে তবে তুমি কি তার কথা বিশ্বাস করবে? আবু বকর (রাঃ) জবাব দিলেন অবশ্যই নয়। তখন আবু জেহেল বলল যদি তোমার বন্ধু

---

[121] সহীহ্ বুখারী- মুসলিম

[122] আল-হুজুরাত ১৫

[123] সহীহ মুসলিম, ২৭

মুহাম্মদ (সাঃ) এইরূপ কথা বলে? এর জবাবে আবু বকর (রাঃ) বললেন যদি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এইরূপ কথা বলে থাকেন তবে ইহা অবশ্যই সত্য এবং নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করি। এই ঘটনার পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাকে আল-সিদ্দিক (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভুষিত করেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন সন্দেহের বেড়াজাল থেকে মুক্ত।

তৃতীয় শর্ত- (আল-কবুল) প্রকাশ্যে এবং গোপনে ঈমানের স্বীকৃতি আমাদের অবশ্যই তাওহীদ ও রিসালাতের ব্যাপারে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং যে কোন প্রেক্ষাপটের মোকাবেলায় মৌখিক স্বীকৃতি দান ও বাহ্যিকভাবে মেনে নিতে হবে। কেবলমাত্র অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনই যে যথেষ্ট নয় এবং মৌখিক ও বাহ্যিক স্বীকৃতিও প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক তা আবু তালেবের জীবনী থেকে জানা যায়। যিনি (আবু তালেব) অনেক প্রতিকুলতার মধ্যেও রাসূল (সাঃ) কে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারেও বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় কোরাইশ নেতাদের সম্মুখে ‘কালেমা শাহাদার’ মৌখিক স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ বিচারের দিনে তাকে (আবু তালেব) জাহান্নামের উত্তপ্ত জুতা পরানো হবে।

আল-কবুল বা গ্রহণ হচ্ছে প্রত্যাখ্যানের বিপরীত এবং কুরআনে গ্রহণের প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর (তায়ালা) এই কথা –

إِنَّهُمْ كَانُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ‎ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

“সত্যিই তাদেরকে যখন বলা হত - “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই।)” তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়ত। বলতঃ “আমরা এক বিকৃত মস্তিষ্ক কবির কথায় নিজেদের মাবুদদের ত্যাগ করব।”[124]

---

[124] আস-সাফফাত ৩৫-৩৬

চতুর্থ শর্ত - (আল-ইনকিয়াদ বা আত্মসমর্পণ)

কুরআন ও সুন্নাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ

“আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরল”।[125] অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে আঁকড়ে ধরা। এখানে আল্লাহ তা‘আলা কালেমার সাথে শরী‘আতের প্রতি আনুগত্য প্রদানকে শর্ত করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ করা। অনুরূপ আয়াত *“ফিরে এস (অনুতপ্ত হয়ে) তোমাদের রবের দিকে এবং আত্মসমর্পণ কর তার ইচ্ছার কাছে।”*[126] অনুরূপভাবে কিছু আয়াত মানা এবং বাকী আয়াত অমান্য করা যাবে না। অন্যথায় আমাদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে যা ইয়াহুদীদের হবে। যারা এরূপ করত এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন। *“তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর। যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে।”* (আল বাকারাহ্ - ৮৫) একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন - “তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু’মিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের কামনাবাসনাকে আমার আনীত শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে দেয়।”[127]

পঞ্চম শর্ত-সত্যবাদীতা বা আস-সিদক- সেই সত্য যা মিথ্যা বা মুনাফেকী কোনটাই অনুমোদন করে না।

إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ

---

[125] সূরা লুকমান ২২

[126] আয-যুমার ৫৪

[127] সহীহ বুখারী

"যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তার রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী"।[128]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন, কারণ তারা মুখে যা বলেছে তাদের অন্তরে সেটি ছিল না। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ

"মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না। আর আমরা তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী"?[129]

মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, নবী সা. বলেছেন:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

"এমন কেউ যে অন্তরের সততা থেকে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল, অবশ্যই আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন[130] এ হাদীসে তিনি কালেমার ভেতর সত্যতার শর্তারোপ করেছেন।

ষষ্ঠ শর্ত-আল-ইখলাস বা অন্তরে একাগ্রতা- নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য-

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে"।[131]

---

[128] সূরা আল-মুনাফিকূন, ১

[129] সূরা আল-'আনকাবূত ২-৩

[130] সহীহ বুখারী ১২৮;সহীহ মুসলিম ৩২

[131] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৫

95- দরসুল আকিদা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন:

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

“আমার সুপারিশ দ্বারা ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে, যে ইখলাসের সাথে অন্তর থেকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে”[132] এ হাদীসে নবীজী সা. কালেমার জন্য ইখলাস শর্ত করেছেন।

প্রতি নামাযে আমরা সূরা ফাতিহার এই কথারই স্বীকৃত দেই যে, “আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছে সাহায্য চাই।”[133]

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতই করি না সাথে সাথে তাঁর উপর পূর্ণ তাওক্কুল (ভরসা) করি। নিয়তের বিশুদ্ধতা (ইখলাস আল নিয়্যাহ) ইবাদত কবুলের জন্য অপরিহার্য। একটি হাদীসে আছে যে, “বিচার দিবসে তিন ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের একজন হবে আলেম, একজন দানশীল ও একজন শহীদ। তারা জাহান্নামী হবে এই কারণে যে, তাদের কর্মকান্ড আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল না বরং তা ছিল লোক দেখান (রিয়া)।” সুতরাং আমাদের ইবাদতসমূহ রিয়ামুক্ত করতে হবে কারণ রিয়াকারীর আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

সপ্তম শর্ত- (আল-মুহাববাত) *(আল ওয়ালা এবং ওয়াল বারা)* আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা। আমাদের যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর জন্য ভালবাসতে হবে এবং তাঁর জন্যই ঘৃণা করতে হবে। ইব্রাহিম (আঃ)-এর ঘটনা এর (আল ওয়ালা এবং আল বারা) উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি তাঁর পিতা আযরের মিথ্যা প্রভুদের অস্বীকার করে বলেছিলেন-

إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

“তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর

---

[132] সহীহ বুখারী ৯৯

[133] আল ফাতিহা. ০৪

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। তোমার ও আমার বিরোধ কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।”[134]

❑ মু’মিনকে অবশ্যই হক (সত্য) ভালবাসতে হবে এবং বাতিল (মিথ্যা) ঘৃণা-করতে হবে। যদিও `বাতিল` তার বাবা কিংবা আত্মীয় হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, *যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন,* যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।’[135]

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের জীবনী থেকেও হকের প্রতি ভালবাসা এবং বাতিলের প্রতি ঘৃণার ভুরিভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। যুদ্ধের ময়দানে নিঃর্দ্বিধায় কাফের পিতা বা পুত্রকে হত্যা করে অনেক সাহাবী এর যথাযথ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন কারণ তাঁরা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালবাসতেন বা ঘৃণা করতেন। আল্লাহ সুব বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

---

[134] সুরা মুমতাহিনা ৪

[135] সুরা মুজাদালাহ ২২

97- দরসুল আকিদা

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।[136]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

"মানব জাতির মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি) কে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্যরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ ভালবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকগণ আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে।"[137]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন - যারই নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকবে সেই ঈমানের মাধুর্য লাভ করবে - (১) তার কাছে আল্লাহ ও তার রাসূল অন্য যে কোন কিছুর তুলনায় অধিক প্রিয় হবে। (২) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছাড়া কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ভাল না বাসবে। (যখন কাউকে ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে) (৩) অবিশ্বাসের (কুফর) দিকে প্রত্যাবর্তনকে ঘৃণা করবে, কেননা আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করেছে এবং সে দোজখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া ঘৃণা করে।"[138]

Note. কালেমার উদ্দেশ্য কখনো শব্দ গণনা ও বাক্য মুখস্থ করা নয়। এমন অনেক সাধারণ লোক আছে, যার ভেতর কালেমার সবক'টি শর্ত বিদ্যমান এবং সে তা আঁকড়ে ধরেছে, যদি তাকে বলা হয়: গণনা কর সে ভালো করে তা গণনা করতে পারবে না, পক্ষান্তরে কালেমার শব্দ মুখস্থকারী অনেক আছে, যে তীরের মত কালেমা উচ্চারণ করতে সক্ষম, তবে তাদের অনেকে কালেমা পরিপন্থী বস্তুতে

---

136 সুরা বাকারা ১৬৫

137 আল-বাকারাহ ১৬৫

138 সহীহ মুসলিম

লিপ্ত। অতএব কালেমার জন্য ইলম ও আমল উভয় জরুরি, তবেই ব্যক্তি সত্যিকারভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা তাওহীদের কালেমার পরিবারভুক্ত হবে, যার তাওফীক দাতা ও সাহায্যকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আমরা তার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তার তাওফিক দান করেন, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্যই নিবেদিত।

কালেমার সপ্তম শর্ত থেকে উদ্ভুত...
‘আল ওয়ালা’ [বন্ধুত্ব] ‘ওয়াল বারা’ [শত্রুতা]
﴿الولاءُ والبراءُ في الإسلام﴾

সূচীপত্র

- ‘আল ওয়ালা’ ‘ওয়াল বারা’- পরিচয়
- কুরআন-সুন্নাহে আল-ওয়ালা ওয়াল বারা
- ইসলামী আক্বিদায়; ওয়ালা বারার গুরুত্ব
- আল বারার আহকাম
- আল-ওয়ালা এবং আল-বারার মানদন্ডে মানুষের শ্রেণী বিভক্তি

‘আল ওয়ালা’ ‘ওয়াল বারা’- পরিচয়

❑ ‘আল ওয়ালা’ শাব্দিক অর্থ-

النصرة، والمحبة، والمتابعة، والموافقة

অর্থাৎ মহব্বত করা ও সাহায্য করা। নিকটাত্মীয় থাকা।[139]

পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ তায়ালা ইসলাম যে সত্তা বিশ্বাস কথা ও কাজকে ভালোবাসেন এবং যা কিছুর ওপর সন্তুষ্ট। বান্দাও সে সবকে ভালোবাসা; তার ওপর সন্তুষ্ট থাকাকে বলা হয়।

❑ ‘ওয়াল বারা’ শাব্দিক অর্থ-

قال ابن فارس .التباعد من الشيء ومُزايَلَتُه،

শাব্দিক অর্থ- সরে যাওয়া ও সম্পর্ক ছিন্ন করা; দূরে থাকা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ তায়ালা ইসলাম যে সত্তা বিশ্বাস কথা ও কাজকে অপছন্দ ও ঘৃণা করেন; বান্দাও সেসব কে অপছন্দ ও ঘৃণা করাকে আল-বারা বলা হয়।

❑ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহি. বলেন

الولاية: ضد العداوة، وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل العداوة: البغض والبعد.

তথা আল-ওয়ালা এটি শত্রুতার বিপরীত এবং এর উৎস; প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতা, শত্রুতার উৎস: বিদ্বেষ এবং দূরত্ব।

---

[139] مقاييس اللغة ৬/১৪১-৪২

কুরআন-সুন্নাহে আল-ওয়ালা ওয়াল বারা

- বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠি হচ্ছে ইসলাম অন্য কিছু নয়। এবং একজন মুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে সে যেখানেই থাকুক না কেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।'[140]

- কাফেরের সাথে শত্রুতা রাখতে হবে যেখানেই থাকুক না কেন-আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য ঈবরাহীমের জীবনী অনুসরনের আদেশ দিয়ে বলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ **তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।** কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর

[140] মায়েদা ৫৫

ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।[141]

- আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সাথে সম্পর্ক রাখতে মানা করেছেন (বারা) যদিও তারা মা-বাবা হয় না কেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, *যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।* বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।[142]

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা,

---

141 সূরা মুমতাহিনা ৪

142 তাওবা-২৪

পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।[143]

ইসলামী আক্বিদায় ওয়ালা বারার আকীদাহর গুরুত্ব

- ইহা কালিমায়ে শাহাদাতের একটি অংশ। তা হচ্ছে- (لا إله) অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত অন্য যাদেরকেই ইবাদাত করা হয় তা থেকে বা'রা বা শত্রুতা।
- ইহা ঈমানের একটি শর্ত । যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ترى كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرًا منهم فاسقون.

আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।[144]

- এই আকীদাটি হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। নবী সা. বলেন-

قال رسول الله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله

ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।[145]

---

143 মুজাদালাহ ২২

144 মায়েদাহ-৮০-৮১

145 মুসনাদে আহমাদ ৪/২৮৬

❑ ঈমান ও ইয়াক্বীনের স্বাদ আস্বাদনের মাধ্যম। হাদীসে এসেছে-

لما جاء عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار

তিনটি জিনিস যে পাবে সে ঈমানের স্বাদ পেয়ে যাবেঃ আল্লাহ ও রাসূল তার কাছে সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া, একমাত্র আল্লাহর জন্য অন্যকে মহাব্বত করা, আল্লাহ তাকে কুফুর থেকে রক্ষা করার পর সেদিকে ফিরে যেতে তেমন অপছন্দ করা যেমনটা জাহান্নামে নিক্ষেপিত হওয়াকে করে থাকে।[146]

আল বারা এর আহকাম-1

---

146 বুখারী-মুসলিম

আল বারা এর আহকাম-2

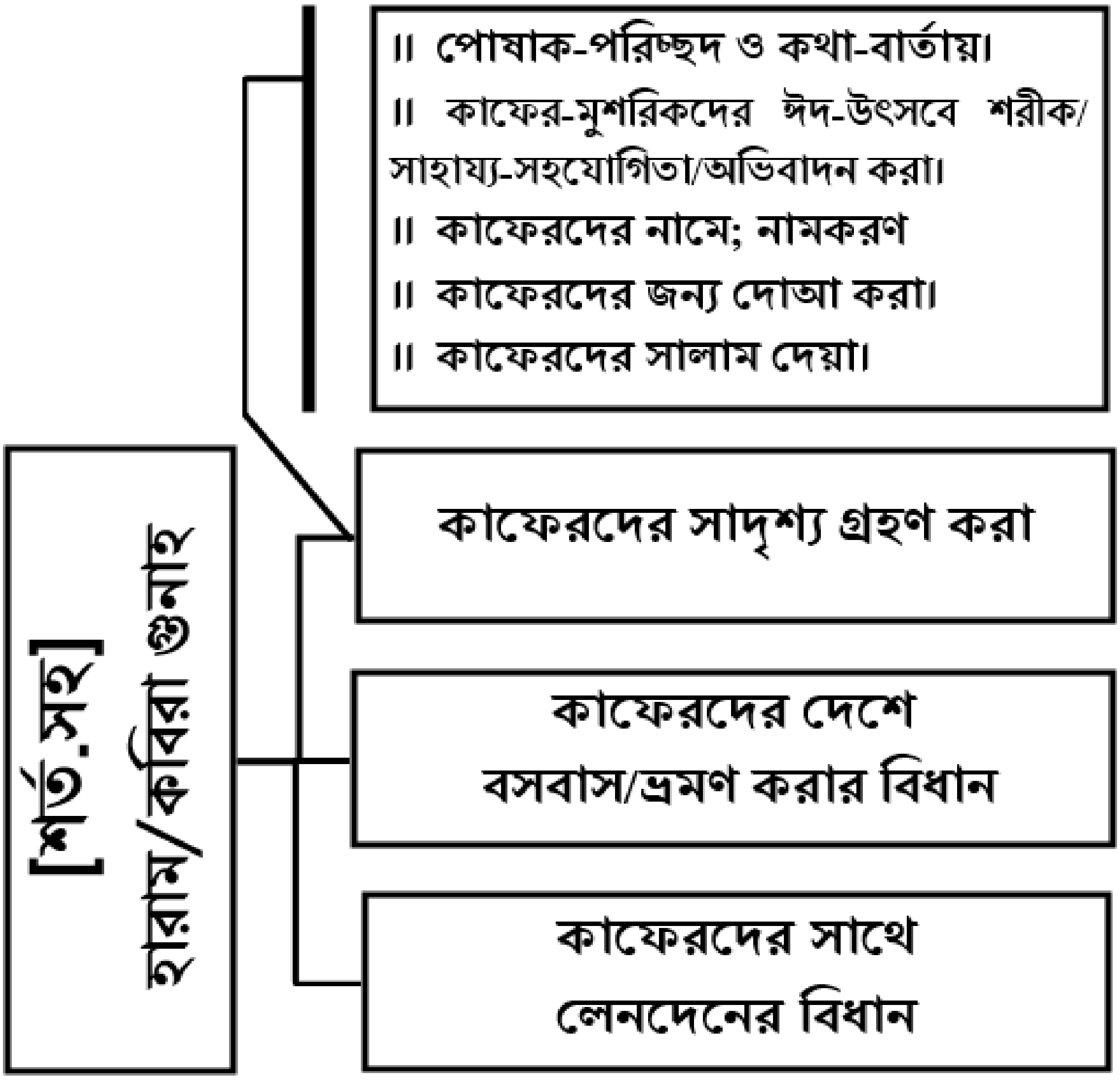

কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার বিধান

পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তায় কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কেননা পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা ও অন্যান্য বিষয়ে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা নাজায়েয। এবং তাদেরকে ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে।

দলীল

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

‘‘যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে’’[147]
সুতরাং কাফেরদের নির্দিষ্ট স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, তাদের অভ্যাস, ইবাদত, পথ-পদ্ধতি ও আখলাক-চরিত্রের সাদৃশ্য গ্রহণ হারাম।
উল্লেখ্য, যে জিনিস বিজাতির প্রতীক, যে জিনিস দেখলে তাদেরকে বিজাতি বলে সহজে চিহ্নিত করা যায়, কেবল সেই জিনিসেই সাদৃশ্য অবলম্বন নিষেধ। তাছাড়া যে জিনিস মুসলিম অমুসলিম এর মাঝে কোন পার্থক্য নির্ধারণ করে না, বরং সকলের মাঝে ব্যাপক, তাতে সাদৃশ্য অবলম্বন প্রশ্নই থাকে না। যদিও সে জিনিস মুলতঃ কাফেরদের নিকট থেকে আগত সভ্যতা কিন্তু ইসলামে তা হারাম নয় এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব সাধারণের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে।

কাফেরদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা; অভিবাধন জানানোর বিধান

কাফের-মুশরিকদের ঈদ-উৎসবে শরীক হওয়া অথবা তা উদযাপনে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াও `আল বারা লঙন। এবং হারাম।

দলীল

আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ لاَيَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

‘‘এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না কিংবা মিথ্যা কথা বলে না’’[148] এর ব্যাখ্যায় তাবঈন এবং মুফাস্সিরগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো; ‘তারা কাফেরদের ঈদ-উৎসবে উপস্থিত হয় না।’[149]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি অনারব তথা অমুসলিম দেশে বাসস্থান নির্মাণ করে এবং তাদের নওরোজ ও মেহেরজান[150]

---

[147] আবু দাউদ ৪০৩১

[148] সূরা ফুরকান ২৫:৭২

[149] ইবনে কাসির 6/118

[150] নওরোজ ও মেহেরজান ইরানের অগ্নিপূজারীদের বিশেষ দু’টি উৎসব ছিল। এতে বিভিন্ন শিরকি ও কুফরি কর্মকাণ্ড থাকার পাশাপাশি তা বিজাতীয় ঐতিহ্য হওয়ায় মুসলমানদের জন্য তা পালন করা ও তাতে অংশগ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

উৎসব পালন করে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, অতঃপর এ অবস্থার ওপরই তার মৃত্যু হয়, তাহলে ওই সব কাফেরদের সাথেই তার হাশর হবে।'[151]

হজরত ওমর রা: বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর দুশমনদের উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকো।' (অন্য বর্ণনায় তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'কারণ এ ক্ষেত্রে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নাজিল হয়ে থাকে।[152]'

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন, 'কাফেরদের উৎসবের নিদর্শন এমন কিছুতে অংশ নেয়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়।'[153]

এ ছাড়াও এতে অংশগ্রহণ করার দ্বারা তাদের কুফরি ও মন্দ কাজে সহযোগিতা পাওয়া যায়। অথচ কুরআনে আল্লাহর অবাধ্যতা ও মন্দ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

'আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো এবং পাপ সীমালঙ্গনে একে অপরকে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানে কঠোর।'[154]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির রহ: বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে উত্তম তথা সৎকর্ম করার এবং অসৎকর্ম পরিত্যাগ তথা তাকওয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর ভ্রান্ত কাজে পরস্পরকে সাহায্য এবং পাপ ও হারাম কাজে একে অপরকে সহায়তা করতে নিষেধ করছেন।'[155]

---

[151] আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/৩৯২

[152] আসসুনানুল কুবরা, ১৮৮৬২

[153] মাজমুয়ুল ফাতাওয়া-২৯:১৯৩

[154] সূরা মায়িদা: ২

[155] তাফসিরে ইবনে কাসির:৩/১০

কাফেরদের সভ্যতার সুনাম করার বিধান

কাফেরদের তামাদ্দুন, সভ্যতার সুনাম করা এবং তাদের বাতিল আকীদা ও ভ্রান্ত দ্বীনের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই শুধু তাদের স্বভাব-চরিত্র, অভিজ্ঞতা ইত্যাদিকে পছন্দ করা। এটিও 'আল-বারা' লঙন।

দলীল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

''আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী''[156]

কাফেরদের নামে; নামকরণ করার বিধান

কাফেরদের নামে মুসলিমদের নামকরণ করাও তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার নামান্তর। পিতা মাতা, দাদা-দাদি ও মুসলিম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ নামগুলো বাদ দিয়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য বিদেশী নাম চয়ন করা কাফের-মুশরিকদেরকে বন্ধু বানানোর অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। ইসলামী নাম পরিবর্তন করার কারণেই বর্তমানে এমন প্রজন্ম দেখা যাচ্ছে, যারা অদ্ভুত ও অপরিচিত নাম রাখে। মুসলিমদের নাম পরিবর্তন করা এমন একটি বিষয়, যা তাদের নতুন প্রজন্মকে পূর্ববতী লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কারণ হতে পারে এবং যেসব পরিবার বিশেষ নামের মাধ্যমে পরিচিত ছিল, তারাও অপরিচিত হয়ে যেতে পারে।[157]

---

[156] সূরা ত্বহা: ১৩১

[157] আল-ইরশাদ শায়খ সালেহ আল ফাউযান হাফি.

কাফেরদের জন্য দোআ করার বিধান

কাফেরদের জন্য [হেদায়াতের দোআ ব্যাতিরেখে] ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং তাদের জন্য রহমত কামনা করাও তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এহেন কর্মকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

''নবী ও ঈমানদারদের জন্য উচিত নয় যে তারা কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়। যখন পরিস্কার হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী'' (সূরা তাওবা: ১১৩) কেননা কাফের-মুশরেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তাদেরকে ভালোবাসা এবং তাদের দীনকে সঠিক বলার লক্ষণ। **বি.দ্র. কাফেরদের মৃত্যুতে শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়া যাবে।**

অমুসলিমকে সালাম দেয়ার বিধান

কোনো অমুসলিমকে; মুসলিমদের মতো সালাম দেয়া জায়েয নেই। প্রয়োজনে তাদেরকে সালাম দিতেই হলে 'আসসালামু আলা মানিত্ত্বাবাআল হুদা' [যারা হেদায়াত অবলম্বন করে; তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক] বলবে। তবে কোনো অমুসলিম আগে সালাম দিয়ে ফেললে উত্তরে 'অয়া আলাইকুম' বলবে।

দলীল

রাসূলুল্লাহ সা. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام

'তোমরা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের প্রথমে সালাম দেবে না।'[158] রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন,

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم

'আহলে কিতাবগণ তোমাদের সালাম দিলে, তার উত্তরে তোমরা শুধু 'অয়া আলাইকুম' বলবে।'[159]

[158] মুসলিম ২১৬৭

অমুসলিমদের দেশে বসবাস/ভ্রমণ/নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান

অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য অবশ্যই দুইটি প্রধান শর্ত

নিম্নের প্রত্যেকটিতে; উপরোক্ত দুটি শর্ত বিদ্যমান থাকার শর্তে-

অমুসলিম দেশে বসবাস/ভ্রমণ জায়েয

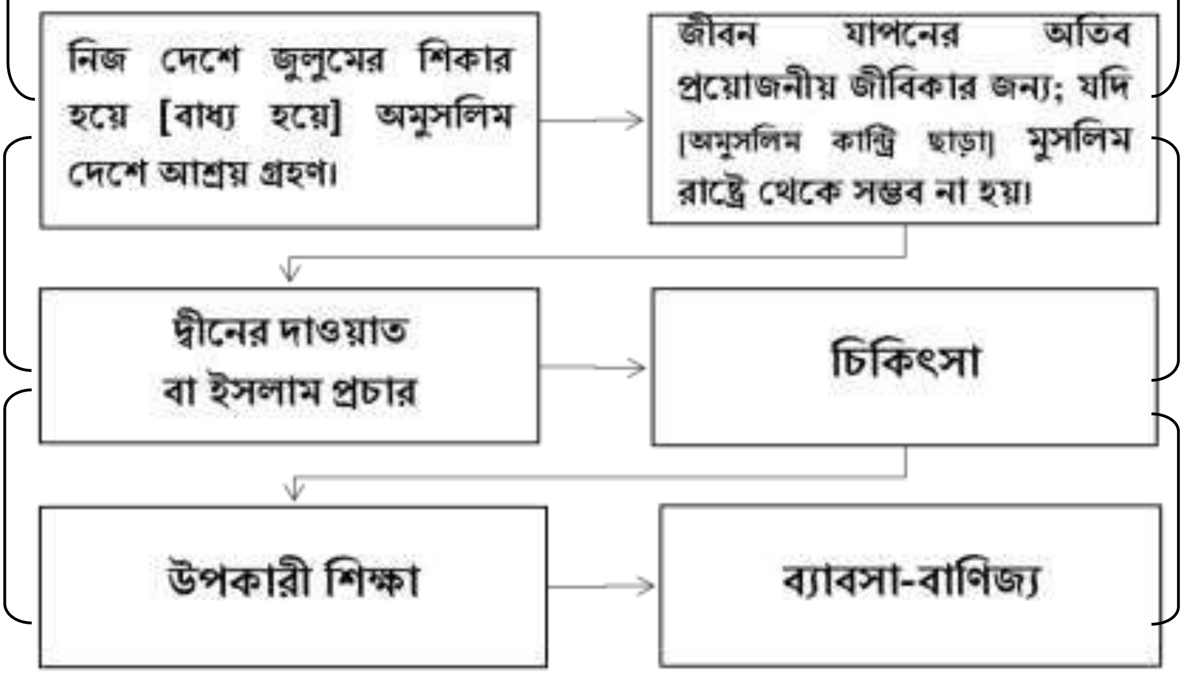

যেসব ক্ষেত্রে বসবাস ও ভ্রমণ নাজায়েয

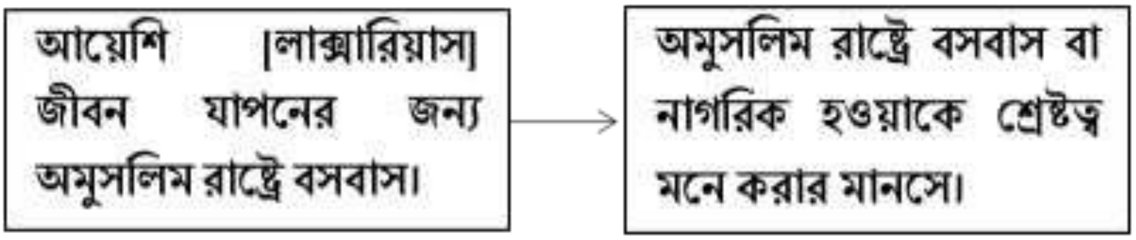

---

159 বুখারি ৬২৫৮ মুসলিম ২১৬৭

জায়েয হওয়ার শর্ত[160]

প্রথম শর্ত: বসবাসকারীকে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তার এমন ‘ইলম, ঈমান ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে, যা তাকে দ্বীনের ওপর অটল থাকার মতো এবং বক্রতা ও বিপথগামিতা থেকে বেঁচে থাকার মতো আত্মবিশ্বাসের জোগান দেয়। আর কাফিরদের প্রতি; তাদের কুফরের কারণে; অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকতে হবে। অনুরূপভাবে কাফিরদের সাথে মিত্রতা ও তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। কেননা তাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিপন্থি।

দলীল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

“হে মু’মিনগণ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে অবশ্যই তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, ‘আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে।’ অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে।”[161]

---

[160] মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, শায়খ উসাইমিন রাহি. ৩/২৫-৩০

[161] সূরা মায়েদা: ৫১-৫২

রাসূল সা. বলেছেন, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ "মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবে।"[162]

দ্বিতীয় শর্ত: নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, বসবাসকারী ব্যক্তি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ইসলামের নিদর্শনাবলি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। নামাজ, জুমু'আহ ও জামা'আত; যদি তার সাথে জামা'আতে নামাজ ও জুমু'আহ প্রতিষ্ঠা করার মতো কেউ থেকে থাকেন; প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। অনুরূপভাবে যাকাত, রোজা, হজ ও অন্যান্য শার'ঈ নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। যদি এসব কাজ করার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে তখন হিজরত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে বসবাস করা জায়েজ হবে না।

দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

''যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না

---

[162] সহিহ বুখারী, ৬১৬৯; সহিহ মুসলিম ২৬৪০

এবং কোনো পথও পায় না তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল''[163]

যেসব দুর্বল লোকেরা হিজরত করার সামর্থ রাখে না, তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফেরদের দেশে বসবাস করার অনুমতি দেননি।

জায়েযের কারণসমূহ[164]

- কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়। যেমন স্বদেশে বিনা কারণে তাকে কঠোর শাস্তি-

ভোগ করতে হয়, জেলে যেতে হয় বা মাল-সম্পদ ক্রোক করা হয়। এবং উক্ত সুরতে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থলও না থাকে; তাহলে তার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়েজ। তবে শর্ত হচ্ছে, মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, ব্যক্তিগত জীবনে সে দ্বীনের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলবে এবং ওই সকল দেশে যে সকল বেহায়পনা ও নির্লজ্জ কাজ ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

দলীল

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর হিজরত। সাহাবায়ে কেরাম মক্কাবাসীর পক্ষ হতে কঠোর নির্যাতন ভোগ করার পর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। দেশটির বর্তমান নাম হচ্ছে 'ইথিওপিয়া' ওই সময় যারা দেশটি শাসন করতো তারা ছিলো কাফের। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) সেখানে হিজরতের পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসবাস করেন। এমনকি রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরতের পর পরিবেশ যখন মুসলমানদের অনুকূলে আসে তখনও অনেক সাহাবী সেখানে অবস্থান করছিলেন।

সাহাবী হজরত আবু মুসা আশয়ারী (রাযি.) সপ্তম হিজরিতে সেখান থেকে ফিরে আসেন। প্রত্যেকের উপর তার আত্মারও হক আছে। আত্মার একটি হক হচ্ছে, তাকে যাবতীয় জুলুম-নির্যাতন থেকে হেফাজত করা। অতএব কোনো মানুষ যদি অমুসলিম দেশে হিজরত করা ব্যতিরেকে নিজের নিরাপত্তা না পায় তাহলে শরয়ী

---

163 সূরা আন-নিসা: ৯৭-৯৯

164 ই'লাউস সুনান ১২/ ১৪৯-১৬৮ এবং আল মাওসূয়াতুল ফিক্কহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ ২০/২০৬-২১৯

দৃষ্টিকোন থেকে হিজরত করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে ওই শর্তে, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

- জীবন যাপনের অতিব প্রয়োজনীয় জীবিকা যদি মুসলিম রাষ্ট্রে থেকে নির্বাহ-করা না যায় এবং তা অমুসলিম কোনো-রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে অতিব প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ বৈধ হবে। এখানেও পূর্বের শর্ত প্রযোজ্য। অর্থাৎ মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, ব্যক্তিগত জীবনে সে দীনের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলবে এবং ওই সকল দেশে যে সকল বেহায়পনা ও নির্লজ্জ কাজ ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

দলীল

আল্লাহ তায়ালা জীবিকা নির্বাহকে ফরজ করেছেন। শরীয়ত এখানে কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়নি যে, ওমুক স্থানে জীবিকার জন্য কাজ করা বৈধ আর ওমুক স্থানে বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

‘তিনি ওই সত্তা যিনি যমীনকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা এর উপর বিচরণ কর এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ কর। (আর মেন রেখো) তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।[165]

- দীনের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের জন্য ওই সকল দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ-করা কোনো মুসলমানের ওই দেশগুলোতে নাগরিকত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য যদি থাকে অমুসলিমদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার দ্বারা সে সওয়াব পাবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে- নিজের ও আপন পরিবারের দ্বীনদারিতার ব্যাপারে শতভাগ সুনিশ্চিত হওয়া।

---

[165] সূরা মুলক ১৫

দলীল

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর আমল। রাসূল সা. এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। এ জন্য চীনের মতো দূর দেশেও সাহাবায়ে কেরাম (রাদি.) এর কবর রয়েছে। এটাকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার মানদন্ড ধরা হয়। এবং সেসব দেশে গিয়েও সাহাবাদের ঈমান ও আমলে সামান্য পরিমাণেও ভাটা পরেনি।

নাজায়েযের কারণসমূহ

❑ আয়েশি [লাক্সারিয়াস] জীবন যাপনের অর্থ যোগানোর জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে-বসবাস না জায়েয; অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের মানে; নিজের জীবনকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা যদি স্বদেশে থেকে নির্বাহ করতে পারে; তাহলে আয়েশি জীবন যাপনের অতিরিক্ত অর্থ যোগানোর জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকা বৈধ হবে না। কারণ, এতে গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়াই, সেখানকার ছড়িয়ে পড়া নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার সামনে নিজেকে পেশ করে দীনি ও চারিত্রিক ধ্বসের ঝুঁকি নেয়া হয়।

অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, যারা শুধু আয়েশি জীবন যাপনের জন্য ওই সকল দেশের নাগরিকত্ব নেয়; তারা বা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে দীনি দায়িত্ববোধ দিন দিন উধাও হয়ে যায়। অমুসলিমদের বিভিন্ন প্ররোচনার সামনে মোমের মতো গলে যায়। এ কারণে, অতিব প্রয়োজন ছাড়া কাফেরদের সঙ্গে ওঠা-বসা করা থেকে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

কেননা হাদীসে এসেছে, নবী সা. বলেছেন,

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

"যে ব্যক্তি কোনো মুশরিকের সাহচর্যে থাকে এবং তার সাথে বসবাস করে, সে মূলত তারই মতো।"[166] নবী সা. আরও বলেছেন-

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا

---

166 আবূ দাউদ, হা. ২৭৮৭

“আমি ওই সকল মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহ’র রাসূল, এরূপ কেন?’ তিনি বললেন, ‘যাতে করে তাদের দুজনের আগুনকে এক দৃষ্টিতে দেখা না যায়’’’[167]
ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী রহঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَ هَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَن عَلَى دِينه

‘কাফেরদের রাষ্ট্রে যাদের দ্বীনদারিতার নিশ্চয়তা নেই এই হাদিসটি তাদের জন্য প্রজোয্য হতে পারে।’[168]

❑ মর্যাদার বিষয় মনে করে অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ অমুসলিম রাষ্ট্রের-নাগরিকত্বকে সম্মান বা গর্বের বিষয় মনে করা, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের তুলনায় অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে শ্রেষ্ঠ মনে করা বা ব্যক্তিগত জীবনে তাদের মতো হওয়া ইত্যাদি কারণে যদি কেউ অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাহলে তা হারাম। নবী সা. বলেছেন-

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

“মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবে।”[169]

আল-ওয়ালা এবং আল-বারার মানদন্ডে মানুষের প্রকার[170]

---

[167] আবূ দাউদ ২৬৪৫; তিরমিযী, ১৬০৪

[168] ফাতহুল বারী ৬/৪৬, ২৮২৫

[169] সহীহ বুখারী, ৬১৬৯; সহীহ মুসলিম, ২৬৪০

[170] আল-ইরশাদ; শায়েখ সালেহ আল ফাউযান হাফি.

সর্বদা আল-ওয়ালা এর প্রাপ্য

যাদেরকে শুধু ভালোবাসতে হবে: তারা হলেন ঐসব লোক, যাদের সাথে খালেস ভালোবাসা রাখা আবশ্যক এবং কোনো প্রকার শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। তারা হলেন খাঁটি মুমিন। যেমন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। তাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাকে নিজের জীবন, সন্তানাদি, পিতা-মাতা এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসা আবশ্যক। অতঃপর মুমিনদের জননী তার সম্মানিতা স্ত্রীগণ, তার পবিত্র আহলে বাইতগণ, সম্মানিত সাহাবীগণ, বিশেষ করে খেলাফায়ে রাশেদীনগণ, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী, আনসার ও মুহাজিরগণ, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, বাইআতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী অতঃপর অবশিষ্ট সাহাবীগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন। অতঃপর তাবেঈগণ, সম্মানিত তিন যুগের লোকগণ, এ উম্মতের সালাফগণ এবং ইমামগণ যেমন চার ইমামকে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

''যারা অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু'' (সূরা হাশর: ১০)

যার অন্তরে ঈমান আছে, সে এই উম্মতের সাহাবী ও সালাফদেরকে মোটেই ঘৃণা করতে পারে না। বক্র অন্তরের অধিকারী, মুনাফেক ইসলামের শত্রু যেমন রাফেযী, খারেজী ইত্যাদি পথভ্রষ্ট লোকেরাই তাদেরকে ঘৃণা করতে পারে।

সর্বদা আল-বারা এর প্রাপ্য

যাদেরকে শুধু ঘৃণা করতে হবে: সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করতে হবে এবং যাদের সাথে ভালোবাসা ও অভিভাবকত্বহীন; আল-বারা পোষণ করতে হবে, তারা হলো নিরেট কাফের, মুশরিক, মুনাফেক মুরতাদ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নাস্তিক। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে দোষারোপ করতে গিয়ে বলেন,

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

‘‘তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম এতো নিকৃষ্ট, যে কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে। যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, নবী এবং নবীর উপর যা নাযিল হয়েছিল তা মেনে নিতো তাহলে কখনো কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেক লোক আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে’’ সূরা মায়িদা: ৮০-৮১

একদিকে আল-ওয়ালা এর হকদার অপরদিকে আল-বারা‘র প্রাপ্য

যাদেরকে একই সঙ্গে ভালোবাসতে হবে এবং ঘৃণা করতে হবে: অর্থাৎ যাদেরকে এক দৃষ্টিকোন থেকে ভালোবাসতে হবে এবং অন্যদিক মূল্যায়ন করে ঘৃণা করতে হবে। এ রূপ ব্যক্তির মধ্যে একসঙ্গে ভালোবাসা ও ঘৃণার স্বভাব একত্রিত হয়। এরা হলো পাপাচারী মুমিন। তাদের মধ্যে ঈমানের যে বিশেষণ রয়েছে, তার কারণে তাদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের মধ্যে শিরক ও কুফুরী ব্যতীত অন্যান্য যেসব পাপাচার রয়েছে, তার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে।

এ শেণীর লোকদেরকে ভালোবাসার দাবি হলো তাদেরকে নসিহত করা এবং তাদের অন্যায়গুলোর প্রতিবাদ করা। তাদের পাপাচারগুলোর সামনে চুপ থাকা মোটেই বৈধ নয়; বরং তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হবে, তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয়া হবে এবং তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হবে। তারা যেন অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে ও মন্দকাজ থেকে তাওবা করে সে জন্য ইসলামী শরী‘আতের দন্ডবিধি কার্যকর করতে হবে এবং শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এই শ্রেণীর লোকদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করা যাবে না এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। যেমন শিরকের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কবীরা গুনাহতে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে খারেজীরা বলে থাকে। ঠিক তেমনি তাদের সাথে খালেস ভালোবাসা পোষণ করে তাদেরকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণও করা যাবে না। যেমন বলে থাকে মুর্জিয়ারা। বরং তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত পন্থায় মধ্যপন্থা

অবলম্বন করা হবে। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মাযহাব। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী রশি। যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে। যেমনটি হাদীছে উল্লেখ আছে।

একটি সতর্কতা

❑ যেসব কাফের মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় না, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে-না এবং মুসলিমদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করেও দেয় না, মুসলিমগণ তার বিনিময় স্বরূপ তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং দুনিয়াবী বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাদের সাথে ইনসাফ করবে। **তবে তারা তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসবে না।** কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

‘‘যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন’’

উল্লেখ্য এখানে আল্লাহ তাআলা ‘‘তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না’’ তিনি এটি বলেননি যে, তাদেরকে বন্ধু বানাতে এবং ভালোবাসতে নিষেধ করেন না।

মুসলিমদের কাফের পিতা-মাতার ব্যাপারেও আল্লাহ তা‘আলা অনুরূপ বলেছেন।

وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

‘‘তোমার পিতা-মাতা যদি এমন কিছুকে আমার সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সৎভাবে বসবাস করো এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো’’[171]

---

[171]সূরা মুমতাহিনা: ৮ [171] সূরা লুকমান: ১৫

119- দরসুল আকিদা

একদা আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে তার মা এসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার আবেদন করলো। সে ছিল কাফের। তিনি এ ব্যাপারে রাসূল সা. কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে বললেন, صلي أمك তোমার মার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো।

আল ওয়ালা-বারা বনাম ন্যাশনালিজম

ইসলামী আকিদায় ন্যাশনালিজম/জাতীয়তাবাদ

সূচিপত্র

- জাতীয়তাবাদের পরিচয়
- জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রকার
- জাতীয়তাবাদের অসারতা
- ইসলামের দৃস্টিতে জাতীয়তাবাদ
- ইসলামী আক্বিদায় জাতীয়তাবাদ
- জাতীয়তাবাদীদের পরিণতি
- ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি
- জাতীয়তাবাদ দূরীকরনে বিশ্বনবী সা. অবদান

জাতীয়তাবাদের পরিচয়

১. জাতীয়তাবাদ শব্দটি ইংরেজি ন্যাশনালিজম এবং আরবী `আসাবিয়্যাহ` শব্দের বাংলা পরিভাষা।

জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যেখানে জাতিকে মানব সমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করা হয়, এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে জাতিগত আদর্শের পরে স্থান দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদ একটি জাতির সংস্কৃতি রক্ষার্থে ভূমিকা পালন করে এবং জাতির অর্জনসমূহকে সামনে তুলে ধরে। ন্যাশনালিজম শব্দটি ১৮৪৪ সালে থেকে ব্যবহৃত হতে থাকে, যদিও জাতীয়তাবাদ মতবাদটি আরও আগে থেকে চলে আসছে। ১৯শ শতাব্দীতে এই মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[172]

জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যেখানে জাতিকে মানব সমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করা হয়। সহজভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যখন শুধুমাত্র নিজের জাতির উন্নতি কামনা করে, নিজের দেশ জাতি ভাষা কিংবা পতাকা নিয়ে গর্ব বোধ করে, অন্যান্য দেশ ও জাতিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করে, অন্য জাতিকে ঘৃণা করে কিংবা কম ভালোবাসে যদিও তারা মুসলিম হয়, অন্যান্য দেশ ও জাতির তুলনায় নিজের দেশ ও জাতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তখন তার সেই মনোভাব বা আদর্শকে জাতীয়তাবাদ বলা হয়।

২. ‘জাতীয়তা’ চিন্তামূলক একটি মতবাদ, যার বিশ্বাস একতা ও ভ্রাতৃত্ব হবে স্বজাতি চেতনা অথবা স্বদেশপ্রীতির উপর।[173]

3. এনসাইকো্লপিডিয় অব ব্রিটিনিকার মতে

`Nationalism is an ideology that emphasizes loyalty, devotion, or allegiance to a nation[174]

‘জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যা একটি জাতির প্রতি আনুগত্য, নিষ্ঠা বা আনুগত্যকে জোর দেয়’

---

[172] উইকিপিডিয়া

[173] জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবাদ ড. সফর ইবনে আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালি

[174] ENCYCL. Britannica

4. অক্সফোর্ড লার্ণারস অনুযায়ী,

`Nationalism a feeling of love for and pride in your country; a feeling that your country is better than any other[175]

‘জাতীয়তাবাদ আপনার দেশে ভালবাসার এবং গর্বের অনুভূতি; একটি অনুভূতি যে আপনার দেশ অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে ভাল।’

জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রকার

[175] oxford learners

জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান

ঐক্য ও সম্মিলনের বহু কারণের মধ্যে বিশেষ একটি জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে- সে যে কারণেই হোক না কেন। কিন্তু শর্ত এই যে, তাতে এমন বিরাট সংযোজক শক্তি বর্তমান থাকতে হবে-যা বিভিন্ন মানুষকে একই বাণী, একই চিন্তা ও মতবাদ, একই উদ্দেশ্য ও কর্মের জন্যে একত্রিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং একদিকে জাতির বিভিন্ন ও অসংখ্য অংশকে জাতীয়তার দুচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে-পরস্পর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত করে সকলকে এক সুদৃঢ় ও অটল পর্বতের ন্যায় মজবুত করে দিবে। অপরদিকে ব্যক্তির মন মস্তিষ্কের উপর এমন প্রভূত্ব করবে যে, সমগ্র জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে তারা যেন সকলেই একত্রি এবং প্রয়োজন হলে সর্বপ্রকার আত্মদানের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ঐক্য ও সংগঠনের অসংখ্য দিক থাকতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত যতো জাতীয়তাই প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার মধ্যে ইসলামী জাতীয়তা ভিন্ন অন্যান্য সকল জাতীয়তারই ভিত্তি নিম্নলিখিত বিষয়ের কোনো এক প্রকার ঐক্যের উপর স্থাপিত হয়েছে। এবং অন্যান্য আরো বহুবিধ ঐক্য সাহায্যকারী হিসাবে তার সাথে মিলিত হয়েছেঃ

এথনিক (গোত্র-বংশীয় জাতিয়তাবাদ)- এর ভিত্তিতে বংশীয় জাতীয়তা গঠিত হয়।

ভৌগলিক (দেশীয়) - এর ভিত্তিতে অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে উঠে।

লিঙ্গুইস্টিক (ভাষাভিত্তিক) - এটা চিন্তা ও মতের ঐক্য বিধানের এক বলিষ্ঠ উপায় হওয়ার কারণে জাতি প্রতিষ্ঠার এর বিরাট প্রভাব রয়েছে।

রাজনৈতিক (শাসন কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ) - এটা একই রাজ্যের অধিবাসী প্রজাগণকে একই প্রকার শাসন-শৃংখলার সম্পর্ক সূত্রে সংযোজিত করে এবং অন্য রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণের প্রতিকূলে দূরত্বের সীমা নির্ধারণ করে।

প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু করে বিংশ শতকের এ উজ্জ্বলতম যুগ পর্যন্ত জাতিগঠনের যতো মৌলিক উপাদান সন্ধান করা সম্ভব হয়েছে, তার সবগুলোরই মধ্যে উলিখিত উপাদান নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাবে।

আজ থেকে দু-তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রীক, রোমক, ইসরাঈল ও ইরানী জাতীয়তাও উল্লেখিত মৌলিক উপাদানের ভিত্তিতেই স্থাপিত হয়েছিলো। আর

অতি আধুনিককালের জার্মান, ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজ ও জাপান ইত্যাদি জাতীয়তাও ঠিক এসব ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বর্ণের ঐক্য- এটা একই বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে আত্মীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে দেয় এবং এ অনুভূতিই অধিকতর উন্নতি লাভ করে অন্যান্য বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র থাকার জন্যে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

জাতীয়তাবাদের অসারতা

এথনিক (গোত্র-বংশীয় জাতিয়তাবাদ)

গোত্রবাদ বা বংশবাদ আধুনিক কালের জাতীয়তার একটি প্রধান ভিত্তি। কিন্তু এ গোত্রবাদের অর্থ কি? নিছক রক্তের সম্পর্ক ও একত্বেরই নাম হচ্ছে গোত্রবাদ। একই পিতা ও মাতার ঔরসজাত হওয়ার দিক দিয়ে কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; এটাই হচ্ছে বংশবাদের প্রথম ভিত্তি। এটাই সম্প্রসারিত হয়ে একটি পরিবাররূপে আত্মপ্রকাশ করে, এটা হতেই হয় গোত্র এবং বংশ। এ শেষ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে মানুষ তার বংশের আদি পিতা থেকে এতদূরে গিয়ে উপনীত হয় যে, তখন তার উত্তরাধিকারত্ব নিছক কাল্পনিক বস্তুতে পরিণত হয়। তথাকথিত এ বংশের সমুদ্রে বহিরাগত রক্তের অসংখ্য নদীনালার সংগম হয়। কাজেই উক্ত সমুদ্রের ‘পানি’ যে সম্পূর্ণ খাঁটি ও অবিমিশ্রিত-তার আসল উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে পানি ছাড়া তাতে অন্য কোনো পানির ধারা মিশ্রিত হয়নি, জ্ঞান-বুদ্ধি সমন্বিত কোনো ব্যক্তিই এরূপ দাবী করতে পারে না। এরূপ সংমিশ্রণের পরও একই রক্তের সামঞ্জস্য মানুষ একটি বংশকে নিজেদের মিলন কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করতে পারে। তাহলে আদি পিতা ও আদি মাতার রক্তের যে একত্ব দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পরস্পর মিলিত করে, তাকে ঐক্যের ভিত্তিস্বরূপ কেন গ্রহণ করা যেতে পারে না? আর দুনিয়ার আর দুনিয়র নিখিল মানুষকে একই বংশোদ্ভূত ও একই গোত্র বলে কেন মনে করা যাবে না? আজ যেসব লোককে বিভিন্ন বংশ বা গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা বা ‘প্রথম পুরুষ’ বলে মনে করা হয়, তাদের সকলেরই পূর্ব পুরুষ উর্দ্ধদিকে কোথাও না কোথাও এক ছিল এবং শেষ পর্যন্ত এ সকলকেই

একই মূল সূত্র থেকে উদ্ভূত বলে স্বীকার করতে হবে। তাহলে ‘আর্য’ ও ‘অনার্য’ নামে মানুষের মধ্যে এ বিভেদ কিরূপে স্বীকার করা যেতে পারে?

ভৌগলিক (দেশীয়) জাতীয়তাবাদ

স্বদেশিকতার ঐক্য গোত্রবাদ অপেক্ষাও অস্পষ্ট ও অমূলক। যে স্থানে মানুষের জন্ম হয়, তার পরিধি এক বর্গ গজের অধিক নিশ্চয় হয় না। এতোটুকু স্থানকে যদি সে নিজের স্বদেশ বলে মনে করে, তাহলে বোধ হয় সে কোনো দেশকেই নিজের স্বদেশ বলতে পারে না। কিন্তু সে এ ক্ষুদ্রতম স্থানের চর্তুদিকে শত-সহস্র মাইল ব্যাপী সীমা নির্ধারণ করে ও এ সীমান্তবর্তী স্থানকে সে ‘স্বদেশ’ বলে অভিহিত করে এবং উক্ত সীমারেখা বর্হিভূত এলাকার সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই বলে অকুন্ঠিতভাবে প্রকাশ করে। মূলত এটা তার একমাত্র দৃষ্টিসংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যকথায় গোটা পৃথিবীকে তারা নিজের বলে অভিহিত করতে কোনোই বাঁধা ছিলো না। এক ‘বর্গগজ’ পরিমিত স্থানের ‘স্বদেশ’ যে যুক্তির বলে সম্প্রসারিত হয়ে শত-সহস্র বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, ঠিক সেই যুক্তিতেই তা আরো অধিকতর বিস্তার লাভ করে নিখিল বিশ্ব তার স্বদেশে পরিণত হতে পারে। নিজের দৃষ্টিকোণ সংকীর্ণ না করলে মানুষ স্পষ্টভাবে দেখতে পারে যে, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি যা কিছুকেই কাল্পনিকভাবে সীমারেখা হিসাবে ধরে নিয়ে একটি এলাকাকে অপর একটি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, প্রকৃতপক্ষে তা একই বিশাল পৃথিবীর অংশবিশেষ; কাজেই এ পাহাড়-পর্বত ও নদী-সমুদ্র তাকে সীমাবদ্ধ একটি এলাকায় কিরূপে বন্দী করে দিতে পারে? সে নিজেকে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসী বলে মনে করে না? সারা দুনিয়াকে সে তার ‘স্বদেশ’ বা জন্মভূমি বলে মনে করলে সে নিজেকে গোটা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী বলে কেন মনে করে না? সারা দুনিয়াকে সে তার স্বদেশ বা জন্মভূমি বলে মনে করলে আর ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসী সমগ্র মনুষ্যজাতিকে ‘স্বদেশবাসী’ বলে অভিহিত করলে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্দিষ্ট স্থানটুকুতে তার যে অধিকার আছে, সমগ্র বিশ্বজগতের উপরও সেই অধিকার দাবী করলে তা ভুল হবে কেন?

লিঙ্গুইস্টিক (ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ)

ভাষার ঐক্য ও সামঞ্জস্যে একই ভাষাভাষী লোকেরা পারস্পারিক আলাপ-আলোচনা ও চিন্তার আদান-প্রদান করার বিপুল সুযোগ লাভ করতে পারে, তা অনস্বীকার্য। এর দরুন জনগণের পরস্পরের মধ্যে অপরিচিতির যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে ‘আপন’ ও ‘নিকটবর্তী’ বলে অনুভব করতে পারে। কিন্তু চিন্তা ও মতের বাহন এক হলেই চিন্তা ও মত যে অভিন্ন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে-এমন কোনো কথাই নেই। একই মতবাদ দশটি বিভিন্ন ভাষার প্রচারিত হতে পারে এবং এসব বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে চিন্তা ও মতের পরম ঐক্য স্থাপিত হওয়া শুধু সম্ভবই নয়- অতি স্বাভাবিকও বটে। পাক্ষান্তরে দশটি বিভিন্ন মত একই ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু একই ভাষায় ব্যক্ত সেই বিভিন্ন মতবাদের লোকেরা পরস্পর বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও হতে পারে। অতএব চিন্তা ও মতের ঐক্য-যা প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তার প্রাণবস্তু –ভাষার ঐক্যের মুখাপেক্ষী নয়। উপরন্তু ভাষার ঐক্য ও সামঞ্জস্য হলেই যে, চিন্তা ও মতবাদের ঐক্য হবে, তা কেউই বলতে পারে না। এরপর একটি গুরুতর প্রশ্ন জেগে উঠেঃ মানুষের মনুষ্যত্ব এবং তার বক্তিগত ভালমন্দ গুণের ব্যাপারে ভাষার কি প্রভাব রয়েছে? একজন জার্মান ভাষাভাষীকে-সে জার্মান। ভাষায় কথা বলে বলেই কি একজন ফরাসী ভাষাভাষীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা যেতে পারে? বস্তুত ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ গুণ বৈশিষ্ট্য মূলত দেখার বস্তু, ভাষা ইত্যাদি নয়। তবে নির্দিষ্ট একটি দেশের শাসন-শৃংখলা ও যাবতীয় কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ কাজকর্মে সেই দেশের ভাষাভাষী ব্যক্তিই অধিকতর সুফলদায়ক হতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানবতাকে বিভক্ত করা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ব্যাপারে ভাষা বিরোধ কোনো নির্ভুল ভিত্তি কোনোক্রমেই হতে পারে না।

বর্ণবৈষম্য-

মানব সমাজে বর্ণবৈষম্য সর্বাপেক্ষা অধিক কদর্য ও অর্থহীন ব্যাপার। বর্ণ কেবল দেহের একটি বাহ্যিক গুণমাত্র; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মানুষ মনুষত্বের মর্যাদা তার দেহের জন্য লাভ করেনি, তার আত্মা ও মানবিকতাই হচ্ছে এ মর্যাদা লাভের একমাত্র কারণ। অথচ এর রঙ বা বর্ণ বলতে কিছু নেই। এমতাবস্থায় মানুষের মধ্যে লাল, হলুদ, কৃষ্ণ ও শ্বেত প্রভৃতি বর্ণের দিক দিয়ে পার্থক্য করার কি যুক্তি থাকতে পারে? কৃষ্ণ বর্ণের গাভী ও শ্বেত বর্ণের গাভীর দুধের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না। কারণ দুধই সেখানে মুখ্য, সেখানে রক্ত বা বর্ণের কোনোই গুরুত্ব নেই। কিন্তু মানুষের দেউলিয়া বুদ্ধি আজ মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমা থেকে তার দেহাবরণের বর্ণের দিকে আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। এটা অপেক্ষা মর্মান্তিক দুরবস্থা আর কি হতে পারে?

বিশ্বমানবিকতা

উপরের বিশ্লেষণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানব জাতিকে যতো ভাগেই বিভক্ত করা হয়েছে, তার একটি বিভাগেরও মূলে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। এগুলো নিছক বৈষয়িক ও স্থুল বিভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে দৃষ্টির সামান্য বিশলতাই তার প্রত্যেকটির সীমা চূর্ণ করে দেয়। উক্ত বিভাগগুলোর স্থিতি ও স্থায়ীত্ব মূর্খতার অন্ধকার, দৃষ্টির সসীমতা এবং মনের সংকীর্ণতার উপরই নির্ভরশীল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যুৎচ্ছটা যতোই স্ফূর্ত ও বিকশিত হয়, অর্ন্তদৃষ্টি যতোই তীক্ষ্ম ও সুদূর প্রসারী হয়, অন্তরের বিশালতা যতোই বৃদ্ধি পায়, এ বস্তুভিত্তিক ও স্থূল পার্থক্য যবনিকা ততোই উত্তোলিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বংশবাদ মানবতার জন্যে এবং আঞ্চলিকতাবাদ বিশ্বনিখিলতার জন্যে নিজ নিজ স্থল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বর্ণ ও ভাষার পার্থক্যের মধ্যেও মানবতার মূল প্রাণবস্তুর ঐক্য উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর সকল বান্দাহর মিলিত অর্থনৈতিক স্বার্থ বিদ্যমান। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিসীমায় কয়েকটি ছায়ামাত্র পরিদৃষ্টি হয়, সৌভাগ্য সূর্যের আবর্তনে তা ভূ-পৃষ্ঠে গতিশীল, হ্রাস-বৃদ্ধিশীল।

ইসলামের দৃস্টিতে জাতিয়তাবাদ

ইসলামের উদার মতাদর্শ

ঠিক একথাই ঘোষণা করেছে ইসলাম। **মানুষ ও মানুষের মধ্যে ইসলাম কোনো বৈষয়িক, বস্তুভিত্তিক কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থক্য সমর্থন করেনি।** ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মূল থেকে উদ্ভূত-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'আল্লাহ তোমাদেরকে একই ব্যক্তি সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। এবং উভয়ের মিলনে অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোককে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।"[176]

বংশবাদ-গোত্রবাদ কিংবা আঞ্চলিকতাবাদের সমর্থনে একটি শব্দও কোথাও পাওয়া যাবে না; কুরআন গোটা মানব জাতিকেই সম্বোধন করে ইসলামী দাওয়াত পেশ করেছে। ভূপৃষ্ঠের গোটা মানুষ জাতিকে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনো জাতি কিংবা কোনো অঞ্চলের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়নি; দুনিয়ার মধ্যে কেবল মক্কার সাথেই তার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেই মক্কা সম্পর্কে বলা হয়েছে-"মক্কার আসল অধিবাসী ও বাইরের মুসলমান-মক্কাতে সকলেই সম্পূর্ণরূপে সমান।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

যারা কুফর করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্যে সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রানাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব।[177]

---

[176] সূরা আন নিসা ১

[177] সূরা হাজ্জ- ২৫

মানব সমাজে দলাদলি এবং বিভিন্ন দলের পারস্পারিক বিরোধ আল্লাহ তা’য়ালার একটা আযাব বিশেষ-

এটা তোমাদের পারস্পারিক শত্রুতার বিষেই তোমাদেরকে জর্জরিত করে তোলে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

“কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিবে এবং তোমাদেরকে পরস্পরের শক্তি আস্বাদন করবে।”[178]

ফিরাউন যেসব অপরাধের দরুন আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত ও দণ্ডিত হয়েছিল, দলাদলি করাকেও কুরআর মজীদে অনুরূপ অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে-

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

“ফিরাউন পৃথিবীতে অহংকার ও গৌরব করেছে এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছে।”[179]

পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, তিনি মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে খিলাফতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। পৃথিবীর সমগ্র বস্তুকেই মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই বিশেষ কোনো অঞ্চলের দাস হয়ে থাকা মানুষের জন্য জরূরী নয়। বিশাল পৃথিবী তার সামনে পড়ে আছে, একস্থান তার জন্যে দুর্গম বা বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেলে অন্যত্র চলে যাওয়া তার পক্ষে খুবই সহজ। সে যেখানেই যাবে আল্লাহর অসীম ও অফুরন্ত নিয়ামত বর্তমান পাবে।

মানব সৃষ্টির সময় আল্লাহ বলেছিলেন-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

“আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা প্রেরণ করতে চাই।”[180]

---

[178] সূরা আল আনআম- ৬৫

[179] সূরা আল কাসাস-8

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

“দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন তা কি দেখতে পাও না?”[181]

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

“আল্লাহর পৃথিবী কি বিশাল ছিলো না? একস্থান থেকে অন্যত্র কি তোমরা হিজরত করে যেতে পারতে না?”[182]

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“আল্লাহর পথে যে হিজরত করবে, পৃথিবীতে সে বিশাল স্থান ও বিপুল স্বাচ্ছন্দ লাভ করবে।”[183]

উপরোক্ত স্পষ্ট বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামের স্বদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার পূর্ণ মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এখন প্রত্যেকটি মুসলমানই বলতে পারেঃ “প্রত্যেকটি দেশই আমার দেশ, কেননা তা আমার আল্লাহর দেশ।”

ইসলামে ভৌগলিক (দেশীয়) জাতীয়তাবাদ

মানুষের জন্মস্থান কিংবা সমাধিস্থানের পার্থক্য কোনো মৌলিক পার্থক্য নয়, মূলত সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক

وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

“তিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকেরই জন্য থাকার স্থান এবং সমাধি নির্দিষ্ট হয়ে আছে।”[184]

---

180 সূরা আল বাক্বারাঃ ৩০

181 সূরা আল হাজ্জ-৬৫

182 সূরা আন নিসা- ৯৭

183 সূরা আন নিসা- ১০০

184 সূরা আল আনআম- ৯৮

ইসলামে এথনিক (গোত্র-বংশীয় জাতীয়তাবাদ)

বংশ ও পারিবারিক বৈষম্যের নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটন করা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে দল ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (তোমাদের মধ্যে) সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত।"[185]

অর্থাৎ দল-গোত্রের পার্থক্য কেবলমাত্র পারস্পারিক পরিচয় লাভের জন্যেই করা হয়েছে; পরস্পরের হিংসা-দ্বেষ, গৌরব-অহংকার বা ঝগড়া বিবাদ করার উদ্দেশ্য নয়। এ বাহ্যিক পার্থক্য ও বিরোধের কারণে মানবতার মৌলিক ঐক্য ভুলে যাওয়া সংগত হবে না। ***তোমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য করার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র, বাস্তব কার্যকলাপ এবং সততা ও পাপপ্রবণতা।***

ইসলামী আকিদায় জাতীয়তাবাদ

১. জাতীয়তাবাদের কারণে ইসলামী আক্বিদার একটি মূলনীতি "আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ" সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়। যে "আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ" মিল্লাতে ইসলামের প্রাণপুরুষ হযরত ইবরাহিম আ. জাগিয়ে তুলেছিলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও

[185] সূরা হুজুরাত ১৩

আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।[186]

আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ এর মর্মার্থ হলো আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা। একজন মুসলিমের প্রতি আরেকজন মুসলিমের ভালোবাসা থাকতে হবে আল্লাহর জন্যই। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কাফির মুনাফিকদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা থাকতে হবে আল্লাহর জন্যই। কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ মুসলিমদের এই সম্পর্কের মধ্যে দেয়াল তৈরি করে দেয়। ভিনদেশের মুসলিমকে তখন আর আপন ভাবা যায় না। অন্যদিকে নিজ দেশের আল্লাহদ্রোহীর প্রতিও সহানুভূতি চলে আসে।

২. জাতীয়তাবাদ মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করে দেয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে একজন মুসলিমের কষ্টে সমস্ত পৃথিবীর মুসলিমের অন্তরে কষ্ট অনুভূত হবে, এটিই ইসলামের শিক্ষা। অথচ জাতীয়তাবাদ আমাদের সেই অনুভূতি নষ্ট করে দিয়েছে। নিজ দেশের কিংবা নিজ জাতির মানুষ সুখে থাকলেই আমরা খুশি। আর এরূপ স্বার্থপরতাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের মূল শিক্ষা।

৩. জাতীয়তাবাদ নিজের জাতিকে অন্যান্য জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শেখায়। ইসলামে নিজ জাতিকে নিয়ে অহংকার কিংবা বংশ মর্যাদার গৌরব চরম নিন্দনীয়। ইসলাম এরূপ কর্মকে জাহেলি যুগের কর্ম বলে উল্লেখ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হলো তাকওয়া। এক্ষেত্রে গায়ের রঙ, বংশ, জাতি, ভাষা, ভূখণ্ড ইত্যাদি মূল্যহীন।

৪. জাতীয়তাবাদ মানুষকে সত্য অস্বীকার করতে শেখায়। নিজ সম্প্রদায় যখন বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিকট থেকে সত্যের আহ্বান আসে তখন জাতীয়তাবাদের চেতনায় উন্মত্ত ব্যক্তির জন্য স্বাভাবিকভাবেই

---

[186] সূরা মুমতাহিনা ৪

সত্যকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আর ঠিক এরূপ কারণেই ইহুদি সমাজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার পরও ইসলাম গ্রহণ করে সফল হতে পারে নি।

৫. জাতীয়তাবাদ ন্যায় অন্যায় বোধকে নষ্ট করে দেয়। জাতীয়তাবাদের দাবিই হলো নিজের স্বজাতিকে সাহায্য করা হবে যদিও সে অন্যায় করে এবং অন্য জাতিকে সাহায্য করা হবে না যদিও তারা নিরপরাধ হয়। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা হবে, যদিও সে নিজ সম্প্রদায় কিংবা নিজ দেশের নাগরিক হয়।

জাতীয়তাবাদীদের পরিণতি

মক্কার মূশরিকদের গোত্র প্রীতি এবং পরিনাম

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম অধ্যায়েই বংশ, গোত্র এবং স্বাদেশিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ ও বৈষম্যই তার পথের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিজ জাতিই ছিল এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। বংশ গৌরব এবং গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত আভিজাত্যবোধ তাদের ও ইসলামের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা বলতো-

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

“কুরআন যদি বাস্তবিকই আল্লাহর প্রদত্ত কিতাবই হয়ে থাকে, তবে এটা মক্কা বা তায়েফের কোনো প্রধান ব্যক্তির প্রতিই নাযিল হতো।”[187]

আবু জাহেল মনে করতো যে, মুহাম্মদ (সা.) নবী হওয়ার দাবী করে নিজেদের বংশীয় গৌরবের মাত্রা বৃদ্ধি করছে মাত্র। সে বলেছে-

“আমাদের ও আবদে মানাফ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিলো। অশ্বারোহনের ব্যাপারে আমরা তাদের প্রতিদ্বন্দী ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া, অতিথেয়তা ও দান-খয়রাতের ব্যাপারেও আমরা তাদের সমকক্ষ ছিলাম, এখন সে বলতে শুরু করেছে যে, আমার নিকট ওহী নাযিল হয়। খোদার শপথ, আমরা মুহাম্মদকে কখনোই সত্য বলে মানবো না।”

---

[187] সূরা যুখরুফ. ৩১

133- দরসুল আকিদা

এটা কেবল আবু জাহেলের চিন্তাধারাই নয়; সমগ্র মুশরিক আরবের এটাই ছিল এমফাটিক (বিরাট) ত্রুটি। এজন্য কুরাইশের অন্যান্য সমগ্র গোষ্ঠীই বনী হাশেমের শত্রুতা করতে শুরু করে। ওদিকে বনী হাশেমের লোকেরাও এ জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমর্থন ও সাহায্য করতে থাকে। অথচ তাদের মধ্যে অনেক লোকই তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। 'আবু তালিব গুহায়' বনী হাশেমকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল এবং সমগ্র কুরাইশ গোত্র এ কারণেই তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। যেসব মুসলিম পরিবার অপোক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, কুরাইশদের কঠোর নিষ্পেষণ ও নির্মম উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করতে বাধ্য হয় এবং যাদের বংশ অধিকতর শক্তিশালী ছিলো তারা নিজেদের বংশীয় শক্তির দৌলতে জুলুম-নিষ্পেষণ থেকে কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করে বেঁচে ছিলো।

বংশ ও স্বদেশের এ আভিজাত্যবোধের কারণেই মদীনায় কুরাইশ বংশের নবীকে শাসক হিসেবে এবং মুহাজিরদেরকে আনসারদের খেজুর বাগানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখে মদীনার মুনাফিকগণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলে বেড়াতো যে, ‟কুরাইশ বংশের এ সর্বহারা ব্যক্তিরা আমাদের দেশে এসে গর্বে স্ফীত হয়েছে। এরা আদরে লালিত কুকুরের ন্যায়, এখন এরা প্রতিপালককেই কামড়াতে শুরু করেছে।” আনসারদেরকে লক্ষ্য করে সে বললো যে, ‟তোমরাই এদেরকে মাথায় তুলে নিয়েছ, তোমরাই তাদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছো। তোমাদের ধন-সম্পত্তি থেকে তাদেরকে অংশ দিয়েছ। খোদার কসম, যদি আজ তোমরা এদের সমর্থন ও সহযোগিতা পারত্যাগ করো, তাহলেই এরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে।” তাদের এসব কথাবার্তার জবাব কুরআন মজীদে এরূপ দেয়া হয়েছেঃ

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُلُون لاَ تُنْفِقُونَ على مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله حَتَّي يَنْفَضُّوا وَ لِلّه خَزَئِنُ السَّموات وَالارضِ وَلكنَّ المُنَافِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُون يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إلِىَ المَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الاغَزُّ مِنْهَا الاَذَلَّ وَلِلَّهِ العِزّةُ وَلِرَسُوْلِهِ ....

‟এরাই বলে বেড়ায় যে, রসূলুল্লাহর সঙ্গী-সাথীদের জন্যে কিছুই খরচ করো না, তাহলেই এরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর ধন-সম্পদের

মালিক যে আল্লাহ তা'য়ালা, একথা এসব মুনাফিকরা বুঝতে পারছে না। তারা বলে যে, আমরা (যুদ্ধের ময়দান থেকে) যদি মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে সম্মানিত ব্যক্তি লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার সম্মান আল্লাহ, রাসূল এবং সমগ্র মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত। কিন্তু মুনাফিকগণ একথা মাত্রই জানে না।"[188]

এরূপ আভিজাত্যবোধের তীব্রতাই আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে হযরত আয়েশার উপর দোষারোপ ও কুৎসা রটনার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং খাযরাজ সমর্থনের দরুনই আল্লাহ ও রসূলের এ দুশমন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

ইহুদীদের গোত্রপ্রীতি এবং পরিনাম

আরবের ইহুদীগণ বনী ইসরাঈল বংশের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একজন নবীর আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। তাদের প্রচারিত সংবাদের দরুন নবী করিম (সা.)-এর ইসলাম প্রচারের সূচনাতেই মদীনার অসংখ্য বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু স্বয়ং ***ইহুদীগণ কেবল বংশীয় আভিজাত্যবোধের দরুনই শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনতে পারেনি। নবাগত নবী ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করার পরিবর্তে ইসমাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, এটাই ছিল তাদের আপত্তি।*** তাদের এ আভিজাত্যবোধ তাদেরকে এতোদূর বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্থ করে দিয়েছিল যে, তারা তাওহীদবাদীদের পরিবর্তে মুশরিকদের সাথে সঙ্গ স্থাপন করেছিল। ইসলামের দুশমন ইহুদীদের দৃষ্টিতে জনগণের মধ্যে সমগোত্রীয় বিদ্বেষ ও বংশীয় আভিজাত্যবোধ জাগ্রত করাই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার মতো অতিশয় ধারালো হাতিয়ার। মদীনার মুনাফিকদের সাথে যোগ সাধন ছিল এরই জন্য। একবার তারা বুয়াস যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আনসার বংশের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও আভিজাত্যের এমন আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিল যে, উভয় দলের শাণিত কৃপাণ কোষমুক্ত হওয়ার ও

[188] সূরা মুনাফিকুন ৭-৮

প্রত্যক্ষ্য সংগ্রামের মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এ সম্পর্কেই নিম্নলিখিত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল-

يٓاَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِنْ تُطِعُوا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ اِيْمَانِكم كَافِرُوْنَ

"মুসলমানগন! আহলে কিতাবের একদলের যদি তোমরা অনুস্মরণ কর তবে,তারা তোমাদেরকে ঈমানের দিক থেকে কুফরের দিকে ফিরিয়ে দিবে।"[189]

খৃষ্টানদের গোত্রপ্রীতি এবং পরিনাম

সেখানকার খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল এরূপ। তারাও অনাগত নবীর প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তাদের ধারণা ছিলঃ এ নবী সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করবেন। আরবের কোনো নবীকে স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। হিরাকিয়াসের নিকট নবী করীম (সা.)-এর ফরমান পৌঁছলে, সে কুরাইশ ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে বলেছিলঃ "আরো একজন নবী আসবেন তা আমি জানতাম; কিন্তু তিনি যে তোমাদের বংশে আসবেন সে ধারণা আমার ছিল না।"

মিশরের মুকাওকাসের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলে সেও বলেছিল- "আরো একজন নবীর আগমন হবে তা আমার জানা ছিল, কিন্তু তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করবেন বলে আমার ধারণা ছিল।"

তদানীন্তন অনারব লোকদের মধ্যেও এ আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। খসরু পারভেজের নিকট যখন হযরত (সা.)-এর চিঠি পৌঁছলো, তখন তাকে কোন্ জিনিস ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল? সে বলেছিলঃ গোলাম জাতির একটি লোক অনারবজগতের বাদশাহকে সম্বোধন করে কথা বলার দুঃসাহস করে!" আরব জাতিকে সে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত মনে করতো। এহেন জাতির মধ্যে সত্যের দিকে ডাকবার মত লোকের জন্ম হতে পারে, সে কথা স্বীকার করতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

---

[189] সূরা আলে ইমরান ১০০

ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি

❑ ইসলামী জাতীয়তার এ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা-"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" বন্ধুতা আর শত্রু"তা সবকিছুই এ কালেমার ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে এবং এর অস্বীকৃতি মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এ কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি কোনো সূত্র এবং কোনো আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে, তাদেরকে কোনো জিনিসই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কোনো ভাষা, গোত্র-বর্ণ, কোনো ধন-সম্পত্তি বা জমির বিরোধ ইসলামের পরিসীমার মধ্যে মুসলমানদের পরস্পরে কোনো বৈষম্যমূলক সীমা নির্ধারণ করতে পারে না, সে অধিকার কারো নেই। মুসলিম ব্যক্তি চীনা বাসিন্দা হোক, কি মরক্কোর, কৃষ্ণাঙ্গ, আর কি শ্বেতাঙ্গ, হিন্দী ভাষাভাষী হোক, কি আরবী; সিমেটিক হোক, কি আর্য; একই রাষ্ট্রের নাগরিক হোক, কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী, তারা সকলেই মুসলিম জাতির অন্তর্ভূক্ত। তারা ইসলামী সমাজের সদস্য,ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ইসলামী সৈন্যবাহিনীর তার সৈনিক, ইসলামী আইন ও বিধানের সংরক্ষক। ইসলামী শরীয়াতের একটি ধারা ইবাদত, পারস্পারিক লেনদেন, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি-জীবনের কোনো একটি ব্যাপারেও লিঙ্গ, ভাষা বা জন্মভূমির দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য করে না-কাউকেও অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা হীন বলে অভিহিত করে না।

এভাবে যেসব গণ্ডীবদ্ধ, জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বৈষয়িক ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ স্থাপিত হয়েছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এগুলোকে চূড়ান্তভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন। বর্ণ, গোত্র, জন্মভূমি, ভাষা, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপরোল্লেখিত অবৈজ্ঞানিক বিরোধ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতার দরুন মানবতাকে বিভিন্ন ওক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করেছিল, ইসলাম তার সব গুলোকেই চরম আঘাতে চূর্ণ করে

দিয়েছে এবং মানবতার দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষকে সমশ্রেণীর সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সমানাধিকারী করেছে।

❑ জাহেলী যুগের এ বর্বরতাকে নির্মূল করার পর ইসলাম বিজ্ঞানের ভিত্তিতে- জাতীয়তার এক নতুন ধারণা উপস্থাপিত করেছে। ইসলামী জাতীয়তার মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে; কিন্তু তা জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোনো কারণে নয়; তা করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্যবিধান পেশ করা হয়েছে-তার নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয় মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা-সততা ও ধর্মানুসরণের দিকে গোটা মানবজাতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যারা এ আমন্ত্রণ কবুল করবে তারা একজাতি হিসাবে গণ্য হবে। আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি এবং তার সমগ্র ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি উম্মাত وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكم اُمَّةً وَّسَطًا অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তার অনুসারীরা নিজেদের পারস্পারিক মতদ্বৈততা ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল একই জাতির মধ্যে গণ্য। وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَومَ الكافِرِيْنَ

এ দুটি **<u>জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই।</u>** পার্থক্য হচ্ছে বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই পিতার দুটি সন্তানও ইসলাম ও কুফরের উল্লিখিত ব্যবধানের দরুন স্বতন্ত্র ও দুজাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি একই ইসলামে দীতি হওয়ার কারণে এক জাতির অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

<u>জন্মভূমির পার্থক্যও এ উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধানের কারণ হতে পারে না।</u> এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের ‘স্বদেশ’ বলতে কিছু নেই। একই শহর, একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। এবং একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।

<u>বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়</u> বাহ্যিক চেহারার রঙ ইসলামে নগণ্য, এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে, আর তাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উত্তম-সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রঙ।

صِبْغَةَ اللّٰهُ وَمَنْ اَحسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন কৃষ্ণাঙ্গ একই জাতির মানুষ বলে গণ্য হতে পারে এবং কুফরের কারণে দুজন শ্বেতাঙ্গের দুই জাতিভূক্ত হওয়াও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

<u>ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়।</u> ইসলামে মুখের ভাষার কোনোই মূল্য নেই, মূল্য হচ্ছে মনের-হৃদয়ের ভাষাহীন কথার। কারণ সমগ্র দুনিয়াতে এটাই কথিত হয়, এটাই সকলে বুঝতে পারে। এর দৃষ্টিতে আরব ও আফ্রিকাবাসীর একই ভাষা হতে পারে। এবং দুজন 'আরবের' ভাষাও বিভিন্ন হতে পারে।

<u>অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যও ইসলাম ও কুফরের বৈষম্যের ব্যাপারে একেবারেই অমূলক।</u> অর্থ-সম্পদ নিয়ে এখানে কোনোই বিতর্ক নেই, ঈমানের দৌলত সম্পর্ক হচ্ছে এখানকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষের প্রভূত্ব নয়, আল্লাহর আনুগত্যই এখানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের একমাত্র ভিত্তি। যারা হুকুমাতে ইলাহীয়ার পক্ষ্যপাতি-অনুগত এবং যারা নিজেদেরকে নিজেদের ধন-প্রাণকে এরই জন্যে কুরবান করেছে, তারা সকলেই এক জাতি, তারা পাকিস্থানের বাসিন্দা হোক কিংবা তুর্কিস্থানের। আর যারা আল্লাহর হুকুমাতের দুশমন, শয়তানের হাতে যারা নিজেদের জান-মাল বিক্রয় করেছে, তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জাতির অন্তর্ভূক্ত। তারা কোন্ রাজ্যের অধিবাসী বা প্রজা, আর কোন্ প্রকার অর্থব্যবস্থার অধীনে বসবাস করছে, তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কোনোই অবকাশ নেই।

এভাবে ইসলাম জাতীয়তার যে সীমা নির্দেশ বা গণ্ডী নির্ধারণ করেছে, তা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জড় ও বৈষয়িক বস্তু নয়; তা সম্পূর্ণরূপে এক বিজ্ঞানসম্মত গণ্ডী। এক ঘরের দুজন লোক এ গণ্ডীর কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে। পক্ষান্তরে দূরপ্রাচ্য ও দূরপাশ্চাত্যে অবস্থিত দুজন মানুষ উক্ত গণ্ডীর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

139- দরসুল আকিদা

জাতীয়তাবাদ দূরীকরনে বিশ্বনবী সা. অবদান

জাতীয়তাবাদ, গোত্র প্রীতি, বংশীয় আভিজাত্য ও অহংকারবোধকে আরবী পরিভাষায় আসাবিয়্যাহ বলা হয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের পর বংশীয় ও স্বাদেশিকতা ভিত্তিক আভিজাত্য ও হিংসা-বিদ্বেষই হচ্ছে ইসলামের মহান দাওয়াত ও আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু"। এ কারণেই শেষ নবী তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতের জীবনে কুফরের পর সর্বাপেক্ষা বেশী জিহাদ করেছেন আভিজাত্য ও হিংসা-বিদ্বেষের এ জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে - এটাকে চিরতরে নির্মূল করার উদ্দেশ্য। হাদীস ও জীবনোতিহাসের যাবতীয় গ্রন্থাবলী খুলে দেখলেই উক্ত কথার সত্যতা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়। নবী করীম (সা.) মানুষের রক্ত, মাটি, বর্ণ, ভাষা এবং উচ্চ নীচের পার্থক্যকে যেভাবে নির্মূল করেছেন, মানুষের পারস্পারিক বিরোধ বৈষম্যের অস্বাভাবিক ও দূর্ভেদ্য প্রাচীর চূর্ণ করেছেন এবং মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতিকে সমান ও একীভূত করেছেন, তা চিন্তা করলে সত্যিই বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

হযরত (সা.) উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন-

ليسَ مِنَّا مَنْ مَّاتَ على العَصَبِيَّةِ لَيْسَ مِنَّا الى دعى الى العَصَبِيَّةِ لَيْسَ مِنَّا قَاتَلَ على العَصَبِيَّة

"আভিজাত্যবোধ ও হিংসা-দ্বেষের জন্য যে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যে লোক সেদিকে অন্যদের আহ্বান জানায় এবং সে জন্য যে যুদ্ধ সংগ্রাম করে, সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হতে পারে না।" তিনি সা. আরো বলেছেনঃ'

لَيْسَ لاَحَدٍ فَضْلٌ على اَحَدٍ اِلاَّ بِدِيْنٍ وَتَقْوًى – النَّاسُ كُلُّهمْ بَنُوادَمَ وَادَمُ مِنْ تُرابٍ

"পরহেযগারী, ধর্মপালন ও ধার্মিকতা ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির উপর কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যেতে পারে না। সকল মানুষই আদমের সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

বংশ, স্বদেশ, ভাষা ও বর্ণভিত্তিক পার্থক্যকে তিনি এ বলে চূর্ণ করেছেন-

لأ فَضْلَ لِعَرَبيٍّ عَلى عَجْمِيْ وَلاَ لِعَجَمِيْ عَلى عَرَبِيٌّ كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ اٰدَمَ

"*আরবের উপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, অনারবের উপর আরবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান।*"

لأ فَضْلَ لِعَرَبيٍّ عَلى عَجْمِيْ وَلاَ لِعَجَمِيْ عَلى عَرَبِيٌّ وَلاَ لِاَبْيَضَ على اَسْوَدَ وَلأ لِاَسْوَدَ على ابيَضَ الاَّ بالتَّقوى

"*অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের ও কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনোই বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই।* কেবল আল্লাহভীতি ও ধর্মপালনের দিক দিয়েই এ বিশেষত্ব হতে পারে।"

اِسْمَعُوْا وَاَطِعُوا وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبشِيٌّ كَانَ رَاْسُهُ زَبِيْبَةٌ

"কিশমিশ আকারের মস্তিষ্ক বিশিষ্ট কোনো হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের রাষ্ট্রনেতা নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শোন এবং মান-তার পূর্ণ আনুগত্য করো।"

মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমানদের অস্ত্রশক্তি যখন কুরাইশদের গর্বোন্নত ও দুর্বিনীত মস্তকে অবনমিত করেছিলে, তখন হযরত রাসূলে করীম (সা.) বক্তৃতা করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন এবং তিনি বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন-

اَلاَ كُلُّ مَا ثَرَةٍ اَوْ مَالٍ اَوْ يُدْعى فهوَ تَحتَ قَدَمِي هَاتَيْنِ

"জেনে রাখ, গর্ব, অহংকার, গৌরব ও আভিজাত্যবোধ-প্রভৃতির সকল সম্পদ এবং রক্ত ও সম্পত্তি সম্পর্কীয় যাবতীয় অভিযোগ আজ আমার এ দু'পদতলে নিষ্পেষিত।"

يَا مِعْشَرِ قَرَيْشٍ اِنَّ اللهَ اَذهَبَ عَنْكم نُخْوَةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا الاَبَا

"হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তোমাদের জাহেলী যুগের সকল হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহংকার এবং পৈত্রিক গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ নির্মূল করেছেন।"

اَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكم من ادمَ وَادمُ من ترابٍ لاَفَخْرَ للاَنْسَابِ لاَ فَخْرَ للعربيِّ على العجميِّ ولاَ للعجميِّ على العرَبِيِّ اِنَّ اكرمكم عِنْدَ اَللهِ اَتْقَاكُمْ-

"হে মানুষ! তোমরা সকলেই আদম সন্তান; আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বংশ গৌরবের কোনোই অবকাশ নেই। অনারবের উপর আরবের,

আরবের উপর অনারবের কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব গৌরব নেই। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মানিত।”

আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন করার পর নবী (সা.) আল্লাহর সামনে তিনটি কথার সাক্ষ্য এবং আন্তরিক স্বীকৃতি পেশ করতেন। **প্রথমত, আল্লাহর কেউ শরীক নেই। দ্বিতীয়ত, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। এবং তৃতীয়ত, আল্লাহর বান্দাহগণ সকলেই সমানভাবে ভাই ভাই।**

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন-

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ.

> ‘‘আল্লাহ তা‘আলা সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উর্ধ্বে।’’

لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ.

> ‘‘তাঁর ফয়সালার কোনো পরিবর্তন নেই। কেউই তাঁর নির্দেশ বাতিল করার নেই এবং তাঁর নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই।’’

آمَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ.

> ‘‘উল্লিখিত সব কিছুর ওপরই আমরা ঈমান এনেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছি যে, এ (ভালো-মন্দ) সব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে আগত।’’

দরসুল আকিদা

সূ চী প ত্র

- শিরক-এর পরিচয়
- কুরআন-সুন্নাহে শির্কের পরিণতি
- শিরকের প্রকার এবং হুকুম
- শিরকে আকবারের পরিচিতি এবং প্রকারভেদ
- শিরিক ফির-রুবুবিয়্যাহ‘র উদাহরণ
- ইসলামী আক্বিদায় গণতন্ত্র

শিরক-এর পরিচয়

শিরক এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

شرك-এর আভিধানিক অর্থ অংশ। الشرك শব্দের মাসদার বা ক্রিয়ামূল হলো **الاشراك** শরীক করা।

অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, সমান করা, ভাগাভাগি করা ইত্যাদি। ইংরেজীতে polytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), Associate, Partner

ইবনু মানযুর বলেছেন, 'আশ-শিরকাতু ওয়া 'আশ-শারকাতু' الشركة و الشركة দু'টি শব্দ। যার অর্থ হ'ল, দু'শরীকের সংমিশ্রণ।[190]

আল মুনজিদ নামক অভিধানে বলা হয়েছে اشرك فى امره তার কাজে সে (অপর কাউকে) শরীক করে নিয়েছে; اشرك بالله অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। আর তা করল সে মুশরিক হয়ে গেল'।[191]

শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা সংজ্ঞা

শিরকের সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন,

الشرك هو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله-

'শিরক হ'ল আললাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার মত তাকে ভালবাসা'।[192]

ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান শিরক-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: 'শিরক'-এর দু'টি অর্থ রয়েছে-

এক. সাধারণ অর্থ, আর তা হচ্ছে- গায়রুল্লাহকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা। অর্থাৎ- আল্লাহর সত্ত্বা অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা।

---

190 ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, الشرك

191 আল-মুনজিদ বৈরুত, দারুল মাশারিক

192 মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৩৯

শির্কের দ্বিতীয় অর্থ

“আল্লাহর পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন, সুন্নাহ ও অগ্রবর্তী মনীষীগণের কথায় শিরক শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা শির্কের দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।’[193]

কুরআন-সুন্নাহে শিরকের পরিণতি

❑ **শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ:** মহান আল্লাহ বলেন,

‘لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ’[194]

‘আব্দুর রহমান তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ

আমি কি তোমাদের সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম; অবশ্যই সতর্ক করবেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একথা তিনি দু’বার করে বললেন এবং ক্রমাগত বলেই চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না’।

❑ **ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ**

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

---

193 আল-মাদখালু লি দেরাসাতিল ‘আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাহ ‘আলা মাযহাবি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ; পৃ. ১২৫, ১২৬

194 লোক্বমান ১৩

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করল, সে ব্যক্তি মহাপাপের অপবাদ দিল’[195]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এটা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে ব্যক্তি দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ’ল’[196]

শিরক করে মারা গেলে আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। তাই কেউ যদি এই পাপ করে ফেলে তাকে সাথে সাথে তাওবাহ কর ফিরে আসতে হবে।

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি,

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

‘বরকতময় আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশী স্থাপন না করে থাক, তাহ’লে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব’।

---

195 নিসা ৪৮

196 নিসা ১১৬

147- দরসুল আকিদা

❑ যাবতীয় নেক/ সৎ আমল বাতিল

মহান আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘এটাই আল্লাহর হেদায়াত। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এ পথে পরিচালিত করেন। তবে যদি তারা শিরক করত, তাহ’লে তাদের সব কাজকর্ম নিস্ফল হয়ে যেত।[197]

তিনি আরো বলেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

‘অথচ নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) প্রতি (তাওহীদের) প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। অতএব যদি তুমি শিরক কর, তাহ’লে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’[198]

❑ জান্নাত চিরস্থায়ী হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

‘বস্তুত; যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই’[199]

❑ শিরক জান্নাত ও জাহান্নামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

শিরক না করলে জান্নাত আর করলে জাহান্নাম। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

‘জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন,

---

197 আন‘আম ৮৮

198 যুমার ৬৫

199 মায়েদাহ ৭২

ثِنْتَانِ مُوجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

'দু'টি বিষয় অপরিহার্য। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) উক্ত বিষয় কি? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।

❑ কাফির-মুশরিকরা কখনই সফলতা লাভ করতে পারে না

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে, তার উক্ত কথার কোন প্রমাণ নেই। তার হিসাব (বদলা) তো তার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হয় না'[200]

❑ শিরককারীর জন্য রাসূল (সা.) শাফা'আত করবেন না

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার সামনে আসলেন এবং ২টি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিলেন। (১) হয় আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা (২) আমার সুপারিশের সুযোগ থাকবে আমি সুপারিশ করাকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেই সকল ব্যক্তির জন্য যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে'।[201]

---

[200] মুমিনুন ১১৭

[201] তিরমিযী হা/২৪৪১

শিরক মহা পাপ। তওবা ব্যতীত কখনো এ পাপ ক্ষমা হয় না। তবে অন্য পাপ করে তওবা ছাড়া মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। অথবা জাহান্নামে দিয়ে পাপের শাস্তি ভোগ করার পর কালিমার বদৌলতে এক সময় জান্নাতে পাঠাবেন।

শিরকের উপরোক্ত ভয়াবহ অবস্থার কারণেই রাসূল (সা.) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলে দিয়েছেন।

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتُ

'তুমি কোনকিছুকে আল্লাহর সাথ শরীক করো না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়'।

শিরকের প্রকারভেদ

শিরক দুই প্রকার-

الشرك الاكبر শিরকে আকবার [বড় শিরিক]

হুকুম- যা বান্দাকে মিল্লাতের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়। এ ধরনের শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি যদি শির্কের ওপরই মারা যায় এবং তা থেকে তাওবা না করে থাকে, তাহলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে।

শিরকে আকবারের প্রকার

তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে

الشرك الاكبر বা বড় শিরক এর প্রকার-

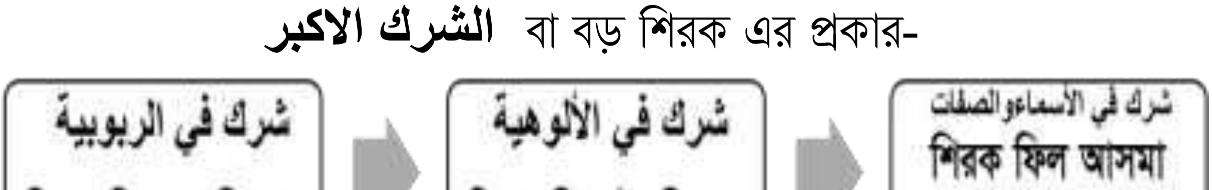

شرك في الربوبية (শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ)

هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام، أو إحياء أو إماتة، جلب خير أو دفع شر، أو غير ذلك من معاني الربوبية

প্রতিপালনের শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিয্ক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা।

শায়খূল ইসলাম ইমাম তাইমিয়া রাহি. বলেন,

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ...) إن الرب سبحانه هو الملك المدبر، المعطي المانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل، فمن شهد أن المعطي أو المانع، أو الضار أو النافع, أو المعز أو المذل غيره، فقد أشرك بربوبيته

‘‘মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ করতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিয্ক ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের শিরক।[২০২]

---

202 মাজমুউল ফাতওয়া 92/1

151- দরসুল আকিদা

দলীল

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সঙ্কুচিত করে আসছি? আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।[203]

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতিত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[204]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে-আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে

---

[203] রাদ 41

[204] সুরা ফাতির 2-3

তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।[205]

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খন্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত; তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।[206]

শিরকে আকবারের প্রত্যেকটি প্রকার; দুইভাবে প্রকাশ হতে পারে

১) شرك التعطيل শিরকুত তা'তিল- অর্থাৎ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতকে নফী করা। অস্বীকার করা। অকেজ ঘোষণা করা। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে রুবূবিয়্যাতের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে। যেমন:- ফেরাউন আল্লাহর রুবুবিয়্যাতকে অস্বীকার করে ছিল এবং সে বলেছিল, 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভূ।[২০৭]

২) شرك التمثيل শিরকুত তামসিল- অর্থাৎ রুবুবিয়্যাতের কোন বৈশিষ্টকে মাখলুকের জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন:- বিপদ থেকে উদ্ধারকারী হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এখন কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, ওলি আওলিয়া ও পীর বুযুর্গোরাও বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। তাহলে সে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক করল। অনুরূপ:- সার্বভৌমত্বের মালিক হলেন আল্লাহ। এখন কেউ যদি বিশ্বাস করে আল্লাহর সাথে সাথে সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণও। তাহলে সে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক করল।

---

205 সূরা যুমার 41

206 সুরা ইউনুস 107

207 'সুরা নাযিয়াত ২৪

শিরিক ফির রুবুবিয়্যাহ‘র উদাহরণ-1

- **[আল্লাহ্ তা’আলার ইচ্ছা ছাড়া] কেউ কাউকে সন্তান-সন্ততি দিতে পারে।**
- **[আল্লাহ্ তা’আলার ইচ্ছা ছাড়া] কেউ কাউকে সুস্থতা দিতে পারে।**
- **[আল্লাহ্ তা’আলার ইচ্ছা ছাড়া] কেউ নিজ ইচ্ছায় কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে**
- **[আল্লাহ্ তা’আলার ইচ্ছা ছাড়া] কেউ কাউকে জীবন-মৃত্যু দিতে পারে;**

এমন প্রত্যেকটি বিশ্বাস করা শিরকে আকবারের; শিরিক ফির রুবুবিয়্যাহ‘র অন্তর্ভূক্ত।

দলীল

- **একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই যাকে চান তাকে সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকেন।** তিনি ভিন্ন অন্য কেউ কাউকে ইচ্ছে করলেই সন্তান-সন্ততি দিতে পারে না।

কুরআন

لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا، وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

‘‘আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলারই। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান। আর যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টাই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান’’[208]

[208] শূরা: ৪৯-৫০

হাদিস

ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

وَلَـمَّا تُوُفِّيَتْ رُقَيَّةُ زَوْجَةُ عُثْمَانَ زَوَّجَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ كُلْثُوْمَ، فَتُوُفِّيَتْ عِنْدَهُ، وَلَـمْ تَلِدْ شَيْئًا، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَ لِيْ عَشْرٌ لَزَوَّجْتُكَهُنَّ

‘উসমান (রা.) এর স্ত্রী এবং রাসূল (সা.) এর মেয়ে রুক্বাইয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন রাসূল (সা.) তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুল্সুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ’উসমান (রা.) এর নিকট বিবাহ দেন। অতঃপর উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও ইন্তিকাল করেন। তবে তাঁর কোন সন্তান হয়নি। এরপর নবী (সা.) ’উসমান (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন: যদি আমার দশটি মেয়েও থাকতো এবং পর পর সবাই ইন্তিকাল করতো তাহলেও আমি একটির পর আর একটি মেয়ে তোমার নিকট বিবাহ দিতাম।[209]

এ কথা এটাই প্রমাণ করে যে, সন্তান দেয়া আল্লাহ্ তা’আলার হাতে। তাঁর হাতে এর কিছুই নেই। নতুবা তিনি আরো কয়েকটি মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়ে পর পর ’উসমান (রা.) এর নিকট বিবাহ দিতেন।

❑ একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই কাউকে সুস্থতা দিতে পারেন। অন্য কেউ নয়।

কুরআন

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ، وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ، وَيَسْقِيْنِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ، ثُمَّ يُحْيِيْنِ، وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ

‘‘তিনিই (আল্লাহ্ তা’আলা) আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন। তিনিই আমাকে মৃত্যু

---

[209] ত্বাবারানী, হাদীস ১০৬১, ১০৬২

দিবেন এবং পুনরুজ্জীবিত করবেন। আশা করি তিনিই কিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।[210]

হাদিস

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের কেউ অসুস্থ হলে ব্যথার জায়গায় ডান হাত রেখে নিম্নোক্ত দো'আ পড়তেন।

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

''হে মানব প্রভু! রোগটি দূর করুন এবং পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। যার পর আর কোন রোগ থাকবেনা। কারণ, আপনিই সুস্থতা দানকারী এবং সুস্থতা একমাত্র আপনিই দিয়ে থাকেন''[211]

❑ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলেই কেউ কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে। নতুবা নয়।

কুরআন

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

''আপনি ওদেরকে বলে দিন: আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের কারোর কোন ক্ষতি অথবা লাভ করতে চান তাহলে কেউ কি তাঁকে উক্ত ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে পারবে? বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত''[212]

---

[210] শু'আরা:৭৮-৮২

[211] বুখারী, ৫৬৭৫ মুসলিম, ২১৯১

[212] ফাত্হ : ১১

হাদিস

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সা.) আমাকে কিছু মূল্যবান বাণী শুনিয়েছেন যার কিয়দাংশ নিম্নরূপ:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

‘‘কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার নিকটই চাবে। কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার নিকটই কামনা করবে। জেনে রেখো, পুরো বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আর তারা সকল একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। তাক্বদীর লেখার কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তাক্বদীর লেখা বালাম শুকিয়ে গেছে। অর্থাৎ লেখা শেষ। আর নতুন করে লেখা হবে না’’[213]

---

[213] তিরমিযী, ২৫১৬

❑ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ইচ্ছে করলে কাউকে জীবন বা মৃত্যু দিতে পারে। অন্য কেউ নয়।

কুরআন

هُوَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

''তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। যখন তিনি কিছু করতে চান তখন তিনি বলেন: হয়ে যাও, তখন তা হয়ে যায়''[214]

হাদিস

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ، فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُنِيْ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ: اللهُ، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

''আমরা ''যাতুর রিক্বা''' যুদ্ধে নবী (সা.) এর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে যখন আমরা একটি ছায়া বিশিষ্ট গাছের নিকট পৌঁছুলাম তখন আমরা তা নবী (সা.) এর জন্য ছেড়ে দিলাম। যাতে তিনি উহার নীচে বিশ্রাম নিতে পারেন। নবী (সা.) বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক মুশরিক নবী (সা.) এর নিকট আসলো এবং গাছে ঝুলন্ত তাঁর তলোয়ার খানি খাপ থেকে বের করে তাঁকে বললো: তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছো না? নবী (সা.) বললেন: না। মুশরিকটি বললো: তাহলে এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? নবী (সা.) বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বাঁচাবেন এবং রাসূল (সা.) তাকে একটুও শাস্তি দেননি।[215]

---

[214] মু'মিন:৬৮

[215] বুখারী, ৪১৩৫ মুসলিম, ৮৪৩

শিরিক ফির রুবুবিয়্যাহ‘র উদাহরণ-2

❀ **ক্ষমতার ক্ষেত্রে আইনদাতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করা এ প্রকার শিরিকের অন্তর্ভূক্ত।**

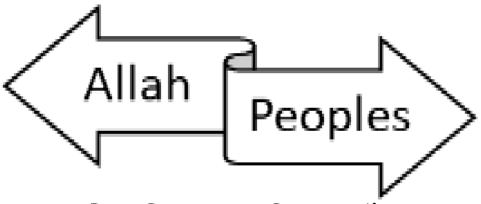

আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের একটি বিশেষ দিক তাঁর ‘হাকামিয়্যাত’ বা হুকুম, বিধান বা ফয়সালা দানের অধিকার ও ক্ষমতা। আল্লাহর মহান নামগুলির অন্যতম ‘আল-হাকাম’ অর্থাৎ বিচারক বা বিধানদাতা। যিনি প্রতিপালক তাঁরই অধিকার তার প্রতিপালিত সৃষ্টির জন্য বিধান প্রদান করার। মানুষ যেমন আপেক্ষিক অর্থে অন্যের রাব্ব বা প্রতিপালক হতে পারে, তেমনি আপেক্ষিক অর্থে বিধানদাতা, বিচারক ইত্যাদি হতে পারে। মহান আল্লাহর দেওয়া নির্দেশর আওতায় বা যেখানে তিনি মানুষের অধিকার দিয়েছে সেখানে মানুষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত ও সামগ্রিক অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর। একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী প্রতিপালক হিসেবে তিনিই জানেন সৃষ্টির কল্যাণ কিসে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে একমাত্র হাকাম বা বিচারক ও বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা তাওহীদুর রুবূবিয়্যাতের অংশ।

أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবর্তীর্ন হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[216]

---

[216] সূরা আনআম 114

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?[217]

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে[218]

ইসলামি আক্বিদায় Democracy [গণতন্ত্র]

সূ চি প ত্র

- **Definition of Democracy- গণতন্ত্রের পরিচয়**
- **ইসলামি আকীদায় গণতন্ত্র**
- **ইসলাম ও গণতন্ত্রের (আকীদাগত) পার্থক্য**
- **ইসলাম ও গণতন্ত্রের শাষক নির্বাচন পক্রিয়া**
- **ভোট বনাম পরামর্শ- পার্থক্য**
- **বিভিন্ন স্কলারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্র**
- **পরিশিষ্ঠ**

---

[217] মায়েদা 50

[218] সুরা নিসা 65

Definition of Democracy- গণতন্ত্রের পরিচয়-

1. **Wikipedia**

Democracy (Greek: δημοκρατία, *dēmokratiā*,from *dēmos* 'people'and *kratos* 'rule')

(Democracy) is a form of government in which the people havethe authority to choose their governing legislation.[219]

A democracy is a political system, or a system of decision-making within an institution or organization or a country, in which all members have an equal share of power.

ইংরেজী Democracy শব্দের বাংলা অর্থ গণতন্ত্র। এই ইংরেজী Democracy শব্দটি গ্রীক শব্দ Demos ও Kratia থেকে উৎপন্ন হয়েছে। Demos শব্দের অর্থ জনগণ আর Kratia শব্দের অর্থ শাসন বা ক্ষমতা। সুতরাং উভয় শব্দের মিলিত অর্থ দাঁড়ায় জনগণের শাসন বা জনগণের ক্ষমতা। সাধারণভাবে গণতন্ত্র হলো এমন একটি রাস্ট্রীয় ব্যবস্থা যেখানে; governing legislation. বা আইন তৈরীর ক্ষেত্রে জনগণকে অথরিটি হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়;

2. **The Webster New Encyclopedic Dictionary (1995)**

Democracy as a government in which supreme power is invested in the people and exercised by them directly or indirectly through representation.[220]

গণতন্ত্র বলতে বুঝায়, এমন এক মতবাদ বা ব্যবস্থাকে যেখানে সমাজ-রাষ্ট্রের আইন governing legislation বা বিধান প্রণয়ণের (supreme power) চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় জনগণের উপর বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর।

---

[219] https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy

[220] (https://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy)

3. Encyclopedia Of Britannica (1771)[221]

ing: The first edition of the *Encyclopedia Britannica* referred in 1771 to "Democracy, the same with a popular government, wherein the supreme power is lodged in the hands of the people; *such were Rome and Athens of old*..." (quoted after Hansen 2005: 31; italics added). The word con-

4. Encyclopedia Of Britannica (1955)[222]

The 1955 (fifteenth) edition of the *Encyclopedia Britannica* defined "democracy" as "a form of government based upon self-rule of the people and in modern times upon freely elected representative institutions and an executive responsible to the people, and a way of life based upon the fundamental assumption of the equality of all individuals and of their equal right of life, liberty (including liberty of thought and expression) and the pursuit of happiness." This definition may satisfy contemporary

5. By Abraham liknkon.

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা 'আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় 'গণতন্ত্র'-এর আধুনিক সংজ্ঞা দেন এভাবে যে, Democracy is the government of the people by the people and for the people. 'গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা জনগণের উপর জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন ব্যবস্থা বুঝায়'

মোটকথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এবং জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ শাসনের নামই গণতন্ত্র। অন্য কথায় গণতন্ত্র হ'ল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণরূপে জনসমষ্টির ইচ্ছাধীনে পরিচালিত।

---

221 Democracy and the limit of Self Government. (Page. 4)Oxford University press. by Adam przeworski

222 IBID.(Page.5)

ইসলামি আকিদায় গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের কয়েকটি দিক

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন অন্য দ্বীন অন্বেষণ করতে। সুতরাং কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার। সুযোগ নেই এ দ্বীনের মধ্যে কিছু সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার।

(১) সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে: গণতন্ত্রের মূল কথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ সকল ক্ষমতার মালিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। একথা নিঃসন্দেহে শিরক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ

'রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই'[223]

তিনি আরো বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

'তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন'[224]

অন্যত্র তিনি বলেন-

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান'[225]

মহান আল্লাহ আরো বলেন

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

'যার হাতে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই'[226]

আল্লাহর বাণী থেকে বুঝা গেল আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক। মানুষকে ক্ষমতার মালিক বা উৎস বানানো তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের শামিল, যা স্পষ্ট শিরক।

(২) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে :

শরিয়ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, হাকিম (আইন প্রণেতা) হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। আর তিনিই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহির মাধ্যমে বিধিবিধান নাযিল করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ

''বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই।''[227]

---

[223] বনী ইসরাঈল ১১১

[224] আলে ইমরান ২৬

[225] মূলক ১

[226] ফুরক্বান ২

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না[228]

وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী'[229]

যারা তা করবে তাদের পরিণতি

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান দিয়ে ফায়সালা করে না তারাই অবিশ্বাসী কাফের।" [230]

তিনি আরও বলেছেন-

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

"আর আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর নাযিল করা বিধান দিয়ে ফায়সালা করুন।" [231]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

"আপনি কি ঐ সমস্ত লোকদের দেখেননি যারা ধারণা করে, আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তারা তার উপর ঈমান আনয়ন করেছে। অথচ তারা বিবাদমান বিষয়কে তাগুতের কাছে ফায়সালা চায়। আর তাদের আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অস্বীকার করে। আর শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে গোমরাহ করতে চায়।"

গণতন্ত্রে আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উপর। এমনকি তারা আল্লাহর আইনকে বাতিলও করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া, মদের লাইসেন্স দেওয়া, সূদের বৈধতা

---

[227] সুরা ইউসুফ-৪০

[228] সুরা কাহাফের ২৬

[229] রা'দ ১৩/৪

[230] সুরা মায়েদা-৪৪

[231] সুরা নিসা-৬০

দেওয়া, ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, ১৬ বছর বয়স পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা করলে তার বৈধতা দেওয়া, স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলে তার বৈধতা দেওয়া, যাত্রা, সিনেমাহলে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার চর্চাকে অনুমোদন দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের নীতিমালা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বরুবিয়্যাতের (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের)ক্ষেত্রে শিরক এবং স্পষ্ট কুফরী।

(৩) পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে-

গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেটা বলবে, যে বিষয়ে সম্মত হবে সেটাই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন, যার বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ। সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কুরআন-সুন্নাহর উপরে স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইনও তৈরী করতে পারে,

গণতন্ত্রে যেকোন মতবিরোধ বা বিতর্কের চূড়ান্ত মিমাংসাকারী বানানো হয় সংবিধান ও এর ধারা সমূহ এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে। এটা একটা স্পষ্ট কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔

‘অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতন্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’[232]

তিনি আরো বলেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۔

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে’[233]

---

[232] নিসা ৫৯

[233] আহযাব ৩৬

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।[234]

8. প্রতিনিধিত্ব

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ হ'ল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা। পক্ষান্তরে খিলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হ'ল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি[235]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের কে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন।[236]

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকতৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-

---

[234] আনআম ১১৬

[235] বাকারা ৩০

[236] আনআম ১৬৫

ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য[237]

একনজরে ইসলাম ও গণতন্ত্রের (আকীদাগত) পার্থক্য

ইসলাম	গণতন্ত্র
"যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য" ২:১৬৫	জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস।
আল্লাহ তাআলা সার্বভৌমত্বের মালিক।[৩:২৬]	সার্বভৌমত্বের মালিক জনগন।
"আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।" [১২:৪০]	আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগন, সংসদ, মন্ত্রী-এমপির
ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহকেই যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানা হয় সেহেতু ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় অকাট্য এবং স্পষ্ট বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতানুসরণ করার নীতিকে ইসলাম এড়িয়ে চলে। কেননা আল্লাহ অধিকাংশের মতানুসরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন' [৪.৫৯]	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক, তাই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমনকি বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সাব্যস্ত করার অধিকার জনগণের। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যেকোন ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্র প্রধান হ'তে পারে, তেমনি ইচ্ছামত যেকোন আইন রচনা করতে পারে। এজন্য 'Majority must be granted' হ'ল গণতন্ত্রের চূড়ান্ত কথা।
ইসলাম ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে

[237] সূরা নূর ৫৫

বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে।২. ২০৮	এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত।
রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হ’ল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে মানুষের সেবা করা। (সূরা নূর ৫৫)	রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ হ’ল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা। মানুষকে সন্তুষ্ট করা যেভাবেই হোক।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের শাষক নির্বাচন পক্রিয়া

গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। গণ মানুষের ইচ্ছা বা আইন অনুসারে পরিচালিত হয় বলেই এর রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা হয়। অন্যদিকে ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর খলীফা হিসাবে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফত বলা হয়।

ইসলামে খলিফা নির্ধারণ হয়; আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ’র ভিত্তিতে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তে সঠিক পরামর্শদানে সক্ষম, কুরআন সুন্নাহের জ্ঞানে পারদর্শী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে।

গণতন্ত্র	ইসলাম
গণতন্ত্রে দলীয় শাসন থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি দলের লোকেরা শাসন করে।	ইসলামিক রাষ্ট্রে বহু দলের উপস্থিতি থাকলেও, কোন দল শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবেনা, কারণ এতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা খুব বেশী এবং আমরা তা বর্তমান ব্যবস্থাপনায় দেখতে পাই। খলিফা (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান) বা জনগণের প্রতিনিধি কোন দলের লোক হলে তিনি দল ত্যাগ করে খলিফা হবেন। দলের সাথে তার কোন সংযোগ থাকবে না এবং তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যথেকে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ	ইসলামী খিলাফতে শাসক যতক্ষণ যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালিত করতে পারবেন ততক্ষণ

পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়।	থাকবেন,তিনি ব্যর্থ হলে ঐ মুহুর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে
গণতন্ত্রে জনগণকে শাসন তত্বাবধানের দ্বায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে জনগণের রায় নিয়ে যেই ক্ষমতায় যায়, সমস্ত ক্ষমতা তাদেরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত,পরিচালিত হয়, শাসন ক্ষমতার ৪/৫ বছরে জনগণের আসলেই কোন ক্ষমতা থাকেনা। শাসকগোষ্ঠী ভুল করলে বা জনস্বার্থ বিরুদ্ধ কাজ করলে তা সংশোধনের জন্য ৪/৫ বছর অপেক্ষা করতে হয় নির্বাচনের মাধ্যমে আরেকটি ভাল রায় দেওয়ার জন্য এবং সেটি মিস্ হলে বা জনগণ প্রতারিত হলে আবারও ৪/৫ বছর কপাল চাপড়াতে হয়।	ইসলামী খিলাফত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি বা খলিফা যে কোনো সময় ভুল করলে সমাজের যে কোন শ্রেণীর লোক সামনা সামনি খলিফার ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, কৈফিয়ৎ নিতে পারে, এমনকি তাকে কটাক্ষ করে কথা বললেও খলিফার কিছুই করার নেই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে রাগান্বিত হয়ে তিনি কিছুই করতে পারেন না। ভুল শুধরাতে ব্যর্থ হলে তাকে তাৎক্ষনিকভাবে বিদায় নিতে হয়।
গণতন্ত্রে নেতা নিজের চরিত্র সম্পর্কে উত্তম বয়ান করে তাকে ভোট দিতে বলেন এবং তিনি নেতৃত্বের যোগ্য বলে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়	ইসলামে নেতৃত্ব চাইলেই- তিনি নেতৃত্ব দানে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন এবং তিনি বাদ পড়েন বা বিদায় হন। রসুল(সাঃ) নেতৃত্ব দাবী করা লোকটিকে বাদ দিয়ে অন্যদের মধ্য থেকে নেতা খুঁজতে বলেছেন, কারণ নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার কারনে সে

অন্য প্রার্থী তার থেকে কোন ক্রমেই ভালো নয় একথা নিশ্চয়তার সাথে প্রচার করেন ও প্রকাশ্যভাবে বা অপ্রকাশ্যভাবে তার গীবত করেন। অনেক সময় তার বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ পেশ করেন এবং অন্যায়,কুটিল,অদ্ভুত চাল চালেন যাতে মানুষ তাকে ফেরেশতা এবং তার প্রতিপক্ষকে শয়তান মনে করে।	নেতৃত্বের যোগ্যতা হারিয়েছে(একদা দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি এসে রসূল (সাঃ) কে বললেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের এলাকার শাসক মনোনিত করুন। *রসূল(সাঃ) বললেন,"আমরা এরুপ ব্যক্তিকে কোন পদে মনোনিত করি না,যে তার পদ চেয়ে নেয় বা পদের প্রতি লালায়িত হয়।"(বুখারী)* আর খলিফা নির্বাচনের পর যদি অন্য কেউ এসে বলে এ ব্যক্তি খলিফা হবার অযোগ্য,আমিই যোগ্য, আমাকে খলিফা বানানো হোক তাহলে রসূল (সাঃ) বলেন- এ লোকটিকে হত্যা কর। কারণ সে ফেত্না সৃষ্টি করতে চায়,ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা ভয়াবহ। আর খলিফার ব্যাপারটা এমন যে খলিফা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করেন। কুরআন,সুন্নাহ,ইয্মা,ইজতিহাদ অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করেন। মৌলিক ক্ষেত্রে নিজের মতামত দিতে তিনি অক্ষম তাই আল্লাহর প্রতি অনুগত মানুষ তার কথায় দ্বিমত পোষণ করেনা বরং আল্লাহর ইবাদতের স্বার্থেই জনগণ খলিফার আদেশ,উপদেশ,নিষেধ মেনে চলে। এতে জনগনের ঐক্যে ফাটল ধরার সম্ভাবনা খুবই কম (রসূল(সাঃ)বলেন,'কোন ব্যক্তি যদি আমীরের (রাষ্ট্রের শাসক বা খলিফা)আনুগত্য ছিন্ন করে এক বিঘৎও দূরে সরে যায় এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয় ,তাহলে সেই মৃত্যু হবে তার জাহেলিয়াতের মৃত্যু।'-মুসলিম শরীফ) . খলিফা নির্বাচন নিয়ে অরাজকতা সৃষ্টির আশংকা কম, কারণ এত কঠিন দায়ীত্ব সাধারনতঃ কেউ নিতে চায় না। তাছাড়া এ দায়ীত্বের সাথে বৈষয়িক অনেক লোকসান জড়িত।

171- দরসুল আকিদা

গণতন্ত্রে শাসক এমন কতৃপক্ষের নিকট জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী হয় যাদেরকে (মানুষ) শাসক ফাঁকি দিতে পারে, আপোস রফা করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে শাসকের সুক্ষ্ম ফাঁকি ধরা সম্ভব হয়না, কারণ সে সীমাবদ্ধ জীব।	ইসলামী ব্যবস্থাপনা বা খিলাফতে শাসক স্রষ্টা আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী হয় আর আল্লাহ প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল অবস্থা অবগত। তিনি মানুষিকতা,বাহ্যিকতা,অতীত,বর্তমান,ভবিষ্যত সবকিছুর হিসাব রাখেন। আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়,এটি খলিফা জানেন,মানেন, কারণ তিনি ঈমানদার। তিনি আল্লাহর নিকট কৈফিয়ৎ প্রদানে বিশ্বাসী।
গণতান্ত্রিক শাসনে সমাজে সরকারী দল ,বিরোধী দলের বিরোধ ছাড়াও উঁচু শেণী ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি হয়।	ইসলামী ব্যবস্থাপনা বা খিলাফতে সরকারী দল,বিরোধী দল থাকে না এবং ধনী ও দরীদ্রের বৈষম্য থাকে না।

গণতন্ত্রের ইসলামী করণ
(ভোট বনাম পরামর্শ- পার্থক্য)

বিয়ে এবং ব্যাভিচারের মধ্যে যত পার্থক্য, শূরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য তার চেয়েও বেশি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি (ভোট) এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এক রকম নয়। অথচ এই শূরা ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশী যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

শূরা-	ভোট
ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায় হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো বলে বিল পাশ করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিধানের বিষয়ে পুণর্বিবেচনা বা মতামত প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই। পরামর্শ করা হয় নতুন উদ্ভূত কোন সমস্যা বা বিষয় নিয়ে, যে বিষয়ে কুরআন-হাদীছের বক্তব্য স্পষ্ট নয়।	গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এরকম কোন শর্ত নেই। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোন আইন তৈরী করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন।
শূরা হল- "আহলুল-হাল ওয়াল-আকদ" এর মধ্য থেকে বাছাইকৃত সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত নয়।	গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, সৎ-অসৎ সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে

শূরার রায় যে সর্বদা সঠিক হয়, তা নয়। তাই যদি তিনি উত্তম বিকল্প পান, অথবা মান্য না করায় কল্যাণ আছে বলে মনে করেন তাহলে শূরার রায় মানতে ন্যায়বান শাসক বাধ্য নন।	সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।
শূরাতে এমন কোন সিদ্ধান্ত ও আইন নিয়ে আসা হয় না, যা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।	গণতন্ত্র সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়।

বিভিন্ন স্কলারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য ন্যায়-নিষ্ঠতা, জ্ঞান-গরীমা, সততা, আল্লাহভীরুতার কোনই শর্ত নেই। যেকোন নাস্তিক, কাফির, ফাসিক-ফাজির, নির্বোধ-জাহেল ব্যক্তি পার্লামেন্ট সদস্য হ'তে পারে টাকার জোরে বা দলীয় আনুগত্য বিবেচনায়। ফলে এসব সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জাহেলী আইন-কানূন প্রণয়ন করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার হওয়ার জন্যও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানী-গুণী হওয়ার শর্তারোপ করা হয় না। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহেল লোকদের ভোটে শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞরাই সাধারণত নেতা নির্বাচিত হয়। এজন্য গণতন্ত্রকে অনেক মনীষী মূর্খদের শাসন বলেছেন।

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে এটা প্রকারান্তরে মূর্খের শাসন।

''Plato (428/427or424/423BC-348/347BC) argues ***that democracy is inferior to various forms of monarchy, aristocracy***··The reason for this is that most **people do not have the kinds of talents that enable them to think well about the difficult issues that politics involves**. But ***in order to win office***

or get a piece of legislation passed, politicians must appeal to these people's sense of what is right or not right. Hence, the state will be guided by very poorly worked out ideas that experts in manipulation and mass appeal use to help themselves win office''.[238]

২. **Thomas Hobbes** (1588- 1679) (considered to be one of the founders of modern political philosophy.) argues that **democracy is inferior to monarchy because democracy fosters destabilizing dissension among subjects**. On his view, individual citizens and even politicians are apt not to have a sense of responsibility for the quality of legislation because no one makes a significant difference to the outcomes of decision making. As a consequence, citizens' concerns are not focused on politics and politicians succeed only by making loud and manipulative appeals to citizens in order to gain more power[239]

3. মিশরীয় ইসলামিক স্কলার মুহাম্মাদ সায়্যিদ কুতুব শহিদ রাহি. বলেন, আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় বিধান হ'ল দু'টি। একটি হ'ল আল্লাহর বিধান অপরটি জাহেলিয়াতের বিধান *(মায়েদাহ ৫০)* গণতন্ত্র আল্লাহর বিধান নয়। সুতরাং তা আল্লাহর মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান।

(4) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইসলাম ও গণতন্ত্র দু'টি বিপরীতমূখী ব্যবস্থা। যা কখনো এক হবার নয়। একটি আল্লাহর উপর ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি তাগূতের (আল্লাহ বিরোধী অনুশাসন) প্রতি ঈমান ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর নির্ভরশীল'

---

238 Republic, Book VI-Stanford Encyclopedia of Philosophylink.https://plato.stanford.edu/entries/democracy/

239 1651,*Leviathan*, chap. XIX)

(5) আবু কাতাদা ওমর বিন মাহমূদ বলেন, 'যেসব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখতে চায়, তাদের প্রচেষ্টা যিন্দীকদের (যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরে কুফুরী গোপন করে) মত, যারা আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলে…ইসলাম জনগণকে বিধানগত ক্ষেত্রে পসন্দ-অপসন্দের স্বাধীনতা দেয়নি; যেহেতু জনগণের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয়। অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব, যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিনষ্টকারী'[240]

(67) উপমহাদেশের স্কলার হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)বলেন, 'মোটকথা ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কোন কিছু নেই। এই নব আবিষ্কৃত তথাকথিত গণতন্ত্র শুধু একটি বানানো প্রতারণার বস্তু। বিশেষ করে এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা মুসলিম এবং কাফের শাসকদের সমন্বয়ে গঠিত, অনৈসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হবে?[241]

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ বলেন-

''গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। এর অর্থ জনগণ নিজেই নিজেকে শাসন করা। তাই এটি ইসলাম বিরোধী মতবাদ। শাসনের অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর অধিকার। কোন মানুষকে আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয়া জায়েজ নেই। সে মানুষ যে-ই হোক না কেন। কোন সন্দেহ নেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রতি নতি শিকার কিংবা আইন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে নব্য শিরকের একটি রূপ। এ পদ্ধতিতে মহামহিম স্রষ্টার কর্তৃত্বকে বাতিল করে দেওয়া হয়, অথচ আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার হচ্ছে স্রষ্টার। কিন্তু সে অধিকার তাঁর থেকে ছিনিয়ে মাখলুককে প্রদান করা হয়।''[242]

---

[240] আল-জিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ, পৃঃ ১০৩-১০৪

[241] মালফূজাতে থানভী, পৃঃ ২৫২

[242]https://islamqa.info/bn/answers/107166/
https://islamqa.info/bn/answers/98134

পরিশিষ্ঠ

আমাদের উচিত ইসলামকে বিদেশী মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা না করে ইসলামকে তার নিজ জায়গা থেকে দেখতে হবে ও দেখাতে হবে। ইসলামের স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা বজায় রেখেই আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক পন্থায় যৌক্তিকভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করা সম্ভব। মানব রচিত কোন মতবাদ বা বস্তুবাদী আদর্শের ছত্রছায়ায় ইসলামকে বর্তমান যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা আত্মঘাতী। কোন মানুষই যেমন এক সঙ্গে দুই প্রভুর গোলামী করতে পারে না, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী দু'টি আদর্শের অনুসরণ একজন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।

বড়ই আফসোসের বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর মুসলিমের মধ্যে ইসলামে সংযোজন-বিয়োজনের প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি।

আধুনিক কালের পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসী জোয়ারকে যৌক্তিক ভাবে মোকাবিলায় অক্ষম এক শ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ এক সময় সমাজতন্ত্র নামক বিজাতীয় মতাদর্শকে কিছুটা সংস্কার করে ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। বর্তমানেও ঐ মানসিকতার ইসলামী চিন্তাবিদগণ মানব রচিত গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে আত্মীকরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের জয়-জয়কার চলাকালে তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছিলেন, শুধু নাস্তিক্যবাদী চিন্তাটাকে বাদ দিলে সমাজতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। সমাজতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত প্রমাণের জন্য তাঁরা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষা চালু করেন।

বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে প্রভাব বিস্তার করে থাকা বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতবাদ 'গণতন্ত্র' সম্পর্কেও একশ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ অনুরূপ ভাষ্য প্রদান করে গণতন্ত্রকে মুসলিম বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা বলছেন, শুধু সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গটি বাদ দিলে গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণে কোন সমস্যা নেই।

গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত ও মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ পরিভাষা চালু করেছেন। অথচ গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, ইতিহাস, এর মূলনীতি ও আদর্শগুলোকে ইসলামী শরী‘আতের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, গণতন্ত্র একটি মানব রচিত শিরকী, কুফরী, জাহেলী মতবাদ। যা কখনো ইসলামের সাথে এক হবার নয়। মানব রচিত এই মতবাদের কিছু বিষয়কে ইসলামাইজড্ করে গ্রহণ করা হ’লে, তা হবে দ্বীনের বিকৃতি সাধন বা গায়ের ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার শামিল, যা আল্লাহ তা‘আলা কখনো গ্রহণ করবেন না[243]

আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন- এবং এজাতীয় চিন্তাধারা থেকে আমাদের আক্বিদাকে হেফাযত করুন। আমিন.

<u>শিরকে আকবার এর দ্বিতীয় প্রকার</u>

شرك فى الالوهية[উলুহিয়্যাত তথা ইবাদাতে শিরিক]

সূচী

- **শিরিক ফিল-উলুহিয়্যাহ‘র পরিচয় এবং দলীল**
- **শিরিক ফিল-উলুহিয়্যাহ‘র ক্যাটাগরী [প্রকার]**
- **ইসলামী আক্বিদায় অসিলা**
- **একনজরে শিরিক ফিল উলুহিয়্যাহ‘র কিছু উদাহরণ**

---

[243] আলে ইমরান ৮৫

পরিচয়

যে সব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে। ইবন কাসীর রাহি. বলেছেন,

الخالق لهذه الاشياء ـ هو المستحق للعبادة

“যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।”

[এই সব ইবাদাতের কোন একটিও যদি অন্য কারো জন্য করা হয় তাহলে তা হবে `উলুহিয়্যাত তথা ইবাদাতে শিরিক]

যিনি রব হবেন তিনিই হবেন মা‘বুদ বা উপাস্য। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

“হে মানুষ! তোমরা ইবাদাত করবে সেই মহান রবের যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ আর আসমানকে করেছেন ছাদ স্বরূপ। আর যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা উদগত করেন নানা প্রকার ফলশস্য তোমাদের জীবিকা হিসেবে। অতএব, তোমরা কোনো কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ তথা অংশীদার করো না, অথচ তোমরা অবগত আছ।” সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১-২২

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلاَيُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا

“বান্দাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার অধিকার হলো তারা যেন কেবল আল্লাহরই উপাসনা করে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক না করে।”

শিরিক ফিল-উলুহিয়্যাহ‘র ক্যাটাগরী [প্রকার][244]

اعتقاد شريك لله تعالى في الألوهية
1-[সরাসরি উলুহিয়্যাতে শিরিক]

তথা ইবাদাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যোগ্য আছেন বলে বিশ্বাস করা; বা কাযত [অন্য কোন ইলাহ] গাইরুল্লাহ‘র জন্য কোন ইবাদাত নিবেদন করা এই প্রকার শিরিকের অন্তর্ভুক্ত[245]

অনূরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাতের উপযুক্ত; একথা বিশ্বাস রেখে তার বা কারো নাম আবদুর রাসুল বা আব্দুল ইসাইন [রাসুলের বান্দা-হুসাইনের বান্দা] ইত্যাদি রাখে; তাহলে তা এ পর্যায়ের শিরিক হবে।

---

[244] الدرر السنية 3/49

[245] প্রাগুক্ত; 3/49

صرف شيء من العبادات لغير الله

2-[আল্লাহ ব্যতিত অন্যের জন্য ইবাদাত নিবেদন করা]

القولية [2.1-মৌখিক ইবাদাত]

❑ الدعاء [2.1.1দোআ-প্রার্থনা]

পরিভাষায় দোআ-আহবানের শিরক বলতে; পুণ্যার্জন বা মানুষের সাধ্যের বাইরে এমন কোন পার্থিব লাভের আশায় অথবা এমন কোন পার্থিব ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে আহবান করাকে বুঝানো হয়।

সকল আহবান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য এবং তা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত। যা তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক। তবে মানুষের সাধ্যের বাইরে নয় এমন কোন সহযোগিতার জন্য সক্ষম যে কোন ব্যক্তিকে আহবান করা যেতে পারে। এতদসত্ত্বেও এ সকল ব্যাপারে মানুষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا

''নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকার পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না।''[246]

যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে গর্ব করে ডাকছে না তাদেরকে তিনি জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

''তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে সরাসরি ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কার করে আমার ইবাদাত (দো'আ বা আহবান) হতে বিমুখ হবে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[247]

---

[246] সূরা জিন:১৮

[247] মু'মিন/গাফির:৬০

আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকা হলেও তারা কখনো কারোর ডাকে সাড়া দিবে না। বরং তাদেরকে ডাকা সর্বদা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لاَ يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ

''সত্যিকারের একক ডাক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। যারা তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে আহবান করে তাদের আহবানে ওরা কখনো কোন সাড়া দিবে না। তারা ওব্যক্তির ন্যায় যে মুখে পানি পৌঁছুবে বলে হস্তদ্বয় সম্প্রসারিত করেছে। অথচ সে পানি কখনো তার মুখে পৌঁছুবার নয়। বস্তুত কাফিরদের ডাক ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য।''[248]

যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُوْنَ

''সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে ডাকে যা কস্মিনকালেও (কিয়ামত পর্যন্ত) তার ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা ওদের প্রার্থনা সম্পর্কে কখনো অবহিত নয়।''[249]

ইব্রাহীম (আ.) মুশরিকদেরকে এবং তারা যাদেরকে ডাকতো তাদেরকেও দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকেন। যাঁকে ডাকলে কখনো সে ডাক ব্যর্থ হয় না।তিনি বলেন,

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَأَدْعُوْ رَبِّيْ عَسَى أَلاَّ أَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا

---

[248] রা'দ: ১৪

[249] আহকাফ.৫

‘‘আমি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া যাদেরকে ডাকছো সকলকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমি শুধু আমার প্রভুকে ডাকছি। আশা করি, আমার প্রভুকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হবো না।’’[250]

একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই সকল লাভ-ক্ষতির মালিক। অন্য কেউ নয়। তিনি ইচ্ছে না করলে কেউ কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। আর সকল কল্যাণাকল্যাণও কিন্তু মানব সাধ্যের আওতাধীন নয়। বরং তার অনেকটুকুই মানব সাধ্যাতীত। সুতরাং সকল ব্যাপারে তাঁকেই ডাকতে হবে।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ، وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ، وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ، يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

‘‘আর তুমি আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া এমন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকো না যা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন করলে সত্যিই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আল্লাহ্ তা’আলা তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোরই নেই। তিনি নিজ বান্দাহেদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু।’’[251]

আল্লাহ্ তা’আলা আরো বলেন:

قُلِ ادْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الأَرْضِ وَمَا لَـهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ، وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِـمَنْ أَذِنَ لَهُ

‘‘হে নবী তুমি বলে দাও: তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্ তা’আলার পরিবর্তে পূজ্য মনে করো তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়। এতদুভয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর

---

[250] মারইয়াম: ৪৮

[251] ইউনুস: ১০৬-১০৭

সহায়কও নয়। তাঁর নিকট একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তদেরই কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হতে পারে।’’[252]

তিনি আরো বলেন:

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ، إِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ

‘‘তামরা আল্লাহ্ তা’আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা (খেজুরের আঁটির আবরণ পরিমাণ) সামান্য কিছুরও মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা কিছুতেই শুনতে পাবে না। আর শুনতে পাচ্ছে বলে মেনে নিলেও তারা তো তোমাদের ডাকে কখনো সাড়া দিবে না। কিয়ামতের দিবসে তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। আমার মতো সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারবে না।’’[253]

আব্দুল্লাহ্ বিন আববাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল (সা.) আমাকে কিছু মূল্যবান বাণী শুনিয়েছেন যার কিয়দাংশ নিম্নরূপ:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ

‘‘কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার নিকটই চাইবে। কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার নিকটই কামনা করবে। জেনে রেখো, পুরো বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আর তারা সকল একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে’’[254]

---

[252] সাবা: ২২-২৩

[253] ফাতির: ১৩-১৪

[254] তিরমিযী, ২৫১৬

এ হচ্ছে মানব সাধ্যাধীন কল্যাণাকল্যাণ সম্পর্কে। তাহলে যা মানব সাধ্যাতীত তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কখনো ঘটবে কি? কখনোই নয়।

আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকা বা তাঁর নিকট দো'আ করা যে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত তা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে এসে সকল মানুষকে দো'আর জন্য আহবান করে থাকেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَّدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَّسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ

''আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছে যে আমার কাছে কিছু চাবে আমি তাকে তা দান করবো। কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো''[255]

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন:

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

''আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দো'আর চাইতেও সম্মানিত কোন বস্তু নেই''[256]

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ

''যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকে না তার উপর তিনি রাগান্বিত হন।''[257]

নু'মান বিন্ বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

''দো'আই হচ্ছে ইবাদাত''[258]

---

[255] বুখারী, হাদীস ১১৪৫ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮

[256] তিরমিযী, ৩৩৭০ ইবনু মাজাহ্, ৩৮৯৭ ইবনু হিব্বান/ইহসান, ৮৬৭

[257] আদাবুল্ মুফ্রাদ, ৬৫৮ ইবনু মাজাহ্, ৩৮৯৫

সুতরাং এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা শিরক আকবার বৈ কি।

এমন তো নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মাধ্যম ছাড়া কারোর ডাকে সাড়া দেন না। বরং তিনি যখনই কোন বান্দাহ্ তাঁকে একান্তভাবে ডাকে, সাথে সাথেই তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।

তিনি বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ، أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

''যখন আমার বান্দাহরা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন আপনি তাদেরকে বলুনঃ নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ্ তা'আলা) অতি সন্নিকটে। কোন আহবানকারী যখনই আমাকে আহবান করে তখনই আমি তার আহবানে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে। তাহলেই তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।''[259]

কবরবাসী কোন ওলী বা বুযুর্গ কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমন বিশ্বাস করে তাদেরকে ডাকাও কিন্তু এ জাতীয় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এমন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের গন্ডী থেকে বের হয়ে যাবে। যদিও সে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইবাদাতগুযার বান্দাহ্ হোক না কেন। কারণ, মক্কার কাফিররাও তো আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বীকার করতো এবং তাঁর ইবাদাত করতো। কিন্তু শির্কের কারণেই তাদের এ ইবাদাত কোন কাজে আসেনি। তাই তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেন:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنَ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللهُ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

''আপনি যদি কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। আপনি বলুন:

---

[258] (তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭২)

[259] বাক্বারাহ্:১৮৬

তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে তোমাদের উপাস্যরা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? বা আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে ওরা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? আপনি বলুন: আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ভরসাকারীদেরকে তাঁর উপরই ভরসা করতে হবে।''[260]

মক্কার কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতকে মৌলিক মনে করতো। তবে তারা মূর্তিপূজা করতো একমাত্র তাঁরই নৈকট্য লাভের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

أَلاَ لِلهِ الدِّيْنُ الْـخَالِصُ، وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

''জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা বলে: আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয় নিয়ে এখন নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের সঠিক ফায়সালা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।''[261] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ، قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الأَرْضِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

''তারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এমন ব্যক্তি বা বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যা তাদের কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। তারা বলে: এরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আপনি বলে দিন: তোমরা কি আল্লাহ্

---

260 যুমার :৩৮

261 যুমার:৩

তা'আলাকে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে তাঁর অজানা কোন কিছু জানিয়ে দিচ্ছো? তিনি পবিত্র এবং তিনি তাদের শিরক হতে অনেক ঊর্ধ্বে''[262] তিনি আরো বলেন:

أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءَ، قُلْ أَوَلَوْ كَانُوْا لاَ يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلاَ يَعْقِلُوْنَ، قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

''তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে? আপনি বলে দিন: তোমরা কি কাউকে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছো? অথচ তারা এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতাই রাখে না এবং কিছুই বুঝে না। আপনি বলে দিন: যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য তথা তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারোর ইখতিয়ারে নয়। আকাশ ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। পরিশেষে তাঁর নিকটই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।''[263]

কবর পূজারীদের অনেকেই মনে মনে এমন ধারণা পোষণ করে থাকবেন যে, মক্কার কাফির ও মুশরিকরা নিজ মূর্তিদের ব্যাপারে এমন মনে করতো যে, তাদের মূর্তিরা স্পেশালভাবে এমন কিছু ক্ষমতার মালিক যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কখনোই দেননি। বরং তাদের এ সকল ক্ষমতা একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব। আর আমরা আমাদের পীর-বুযুর্গদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছি তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মনে করছি যে, আমাদের পীর-বুযুর্গদের সকল ক্ষমতা একান্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দয়ায় তাঁর ওলীদেরকে এ সকল ক্ষমতা দিয়েছেন। তা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব নয়।

মূলতঃ তাদের এ ধারণা একেবারেই বাস্তববর্জিত। কারণ, মক্কার কাফির-মুশরিকদের ধারণাও হুবহু এমন ছিলো। বিন্দুমাত্রও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। তারাও তাদের মূর্তিদের ক্ষমতাগুলোকে একান্তভাবেই আল্লাহ্ প্রদত্ত বলে মনে করতো। একেবারেই তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে কখনোই মনে করতো না।

---

[262] ইউনুস:১৮

[263] যুমার :৪৩-৪৪

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ الْـمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ: لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ وَيْلَكُمْ! قَدْ قَدْ، فَيَقُوْلُوْنَ: إِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُوْلُوْنَ هَذَا وَهُمْ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ

''মুশরিকরা বলতো: (হে প্রভু!) আপনার ডাকে আমি সর্বদা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যে আমি একান্তভাবেই বাধ্য। আপনার কোন শরীক নেই। তখন রাসূল (সা.) বলতেন: হায়! তোমাদের কপাল পোড়া। এতটুকুই যথেষ্ট। এতটুকুই যথেষ্ট। আর একটুও বাড়িয়ে বলো না। তারপরও তারা বলতো: তবে হে আল্লাহ্! আপনার এমন শরীক রয়েছে যার মালিক আপনি এবং সে যা কিছুর মালিক সেগুলোও আপনার। তার নিজস্ব কিছুই নেই। তারা এ বাক্যগুলো বলতো এবং ক্বাবা শরীফ তাওয়াফ করতো''[264]

অনুরূপভাবে আশা বা বাসনা তথা মানুষের অসাধ্য এমন কোন বস্তুত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নিকট কামনা করাকে বুঝানো হয়। যেমন: কবরে শায়িত পীর-বুযুর্গের নিকট স্বামী বা সন্তান কামনা করা।

এ জাতীয় বাসনা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা শিরক আকবার।

তবে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও জান্নাতের আশা করাও কিন্তু অমূলক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أُوْلآئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللهِ، وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

''নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত ও আল্লাহ্'র পথে জিহাদ করেছে সত্যিকারার্থে তারাই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রত্যাশী। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়''[265]

---

[264] মুসলিম, ১১৮৫

[265] বাক্বারাহ্: ২১৮

189- দরসুল আকিদা

আলী (রা.) বলেন:

لاَ يَرْجُوْ عَبْدٌ إِلاَّ رَبَّهُ

‘‘বান্দাহ্’র নিশ্চিত কর্তব্য হলো এইযে, সে একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার নিকটই কোন কিছু কামনা করবে৷ অন্য কারোর নিকট নয়’’

ইসলামী আক্বিদায় অসিলা

সূ চী

- **অসিলার পরিচয়**
- **অসিলার হুকুম**
- **অসিলার প্রকার এবং প্রকারসমূহের হুকুম**

পরিচয়

الوسيلة لغة: المَنْزِلة عِنْدَ المَلِك، وهي: الدَّرَجة، والقُرْبة، والْوَسِيلَةُ أيضاً: مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْغَيْرِ وَالْجَمْعُ (الْوَسِيلُ) وَ (الْوَسَائِلُ)، وَ (التَّوْسِيلُ) وَ(التَّوَسُّلُ) وَاحِدٌ

তাওয়াস্সুল অর্থ: নৈকট্য লাভ করা, আর অসীলা অর্থ : নিকটবর্তী হওয়া- বা মানজিলা। কারও অবস্থানকে মানজিলা বলা হয়।[266]

পরিভাষায়-

ما يتقرب به إلى الله تعالى

যেসব জিনিসের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়, তাকে ওসিলা বলে। যেমন, নামায, রোজা, নেক আমল। এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে পরিচিত ওসিলা।

হুকুম

অসিলা বৈধ হওয়ার দলীল

ক. আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং **তার নৈকট্য অর্জন করতে সচেষ্ট হও** এবং তার পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"[267]

এই আয়াতে অসীলার অর্থ হলো: নৈকট্য লাভ করা আর এটাই হচ্ছে ইবনে আব্বাস, আতা, মুজাহিদ এবং ফাররা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর মত

কাতাদাহ বলেন: পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করা।

---

[266] لسان العرب، 11/ 724، مادة (وسل)

[267] সূরা মায়েদা-৩৫

খ. আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشۡفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا
أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا

"হে নবী আপনি তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারেনা। যাদেরকে তারা আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালন কর্তার নৈকট্য তালাশে ব্যাপ্ত যে, তাদের মধ্যে কে (আল্লাহর) বেশি নৈকট্যশীল (হবে) তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।"[268]

এই আয়াতের আল্লাহর বাণী يبتغون إلى ربهم الوسيلة এর মধ্যকার 'অসীলা' শব্দটির অর্থ: 'তারা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করে।' যেমন তাফসীরে জালালাইনসহ ও অন্যান্য তাফসীরে এসেছে।

অসিলার প্রকার এবং প্রকারসমূহের হুকুম

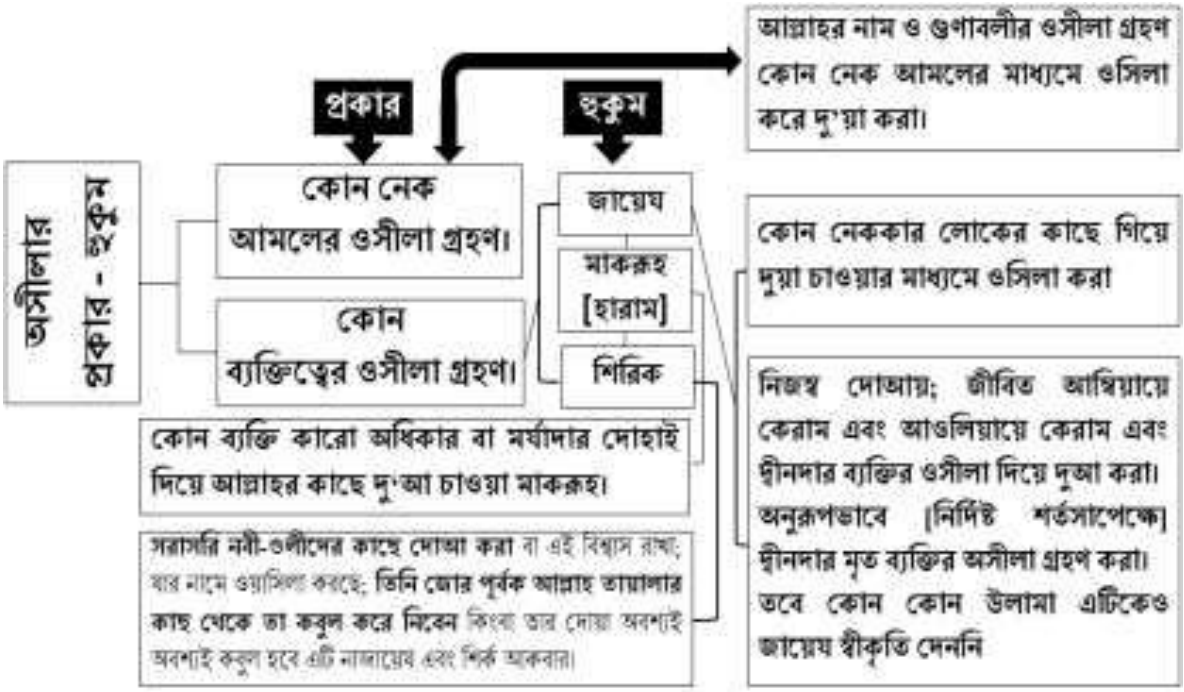

---

[268] সূরা ইসরা. ৫৬-৫৭

❑ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ওসীলা গ্রহণ

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নাম, সমুন্নত গুণাবলী এবং তাঁর প্রশংসনীয় কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। যেমন আমরা বলি ইয়া রাহমান! আমার উপর রহম করুন। ইয়া রাযযাক! আমাকে রিযক দান করুন ইত্যাদি

এর দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

"আর আল্লাহর জন্যে সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা তাঁকে সে সব নামের মাধ্যমে ডাক এবং যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তোমরা তাদেরকে বর্জন কর, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে"[269]

আল্লাহ তাআলার সুন্দর নাম ও গুণাবলীর অসীলা দিয়ে দুআ-মুনাজাত করার দৃষ্টান্ত হাদীসে অসংখ্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তাআলার সুন্দর নাম ও গুণাবলীর অসীলায় দুআ করার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন

আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَلِظُّوا بِيَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ

তোমরা 'ইয়া জালজালালী অল ইকারামের মাধ্যমে বেশি করে আহ্বান করো'[270] অর্থাৎ তা তোমাদের দো'আর মধ্যে বেশি বেশি বলবে।

মুসনাদ এবং সুনানগ্রন্থসমূহে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত বসা ছিলেন এবং এক ব্যক্তি পাশে নামায পড়ছিলেন, তিনি যখন রুকু, সিজদা এবং তাশাহহুদে দো'আ করছিলেন তখন তিনি দো'আতে বলেছিলেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

---

[269] সূরা আরাফ/১৮০

[270] তিরমিযী, ৩৫২৫

“হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এ জন্য যে, সকল প্রশংসা তোমারই, তুমি ব্যতীত কোনো যোগ্য উপাস্য নেই, তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর আবিস্কারক, হে মহিমাময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জিবী অবিনশ্বর, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি..”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে বললেন: তোমরা কি জান যে, সে কিসের মাধ্যমে দো‘আ করেছে? তারা বলল: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন, তিনি বললেন: শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, সে আল্লাহর সবচেয়ে বড় নামের মাধ্যমে দো‘আ করেছে, যার মাধ্যমে দো‘আ করলে তিনি কবুল করে থাকেন এবং কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে থাকেন।[271]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাশাহহুদে বলতে শুনেছেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, হে এক ও অদ্বিতীয়, ভরসাস্থল আল্লাহ, যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তুমি আমার পাপসমুহকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।

তিনি বললেন: তাকে ক্ষমা করা হয়েছে কথাটি তিনবার বললেন। মেহজান ইবন আদরা থেকে নাসায়ী বর্ণনা করেছেন[272] হাদীসে এসেছে -

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر- أي أحزنه- قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث .

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন তখন বলতেন, হে চিরঞ্জীব, চিরন্তন সত্ত্বা আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। তিরমিজী

[271] নাসাঈ, ১৩০০; তিরমিযী, ৩৫৪৪; আবু দাউদ, ১৪৯৫; ইবন মাজাহ, ৩৮৫৮; মুসনাদে আহমাদ ১২২০৫

এ হাদীসে আমরা দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার দু'টো নাম ও তাঁর রহমত নামক গুণের অসীলায় দুআ করলেন। আবার ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যূমু বলে তার মহান দুটো নামের অসীলা নিয়েছেন।

এটা দুআ-মুনাজাতের একটি উত্তম পদ্ধতিও বটে। বড় কথা হল, আল্লাহ আমাদের-কে তাঁর নামের অসীলা নিয়ে দুআ-প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তাআলার নামের অসীলা দিয়ে দুআ করতেন।

❑ কোন নেক আমলের মাধ্যমে ওসিলা করে দু'য়া করা

নিজের সুন্দর ও ভাল কোন নেক আমলের অসীলা দিয়ে দুআ করা: যেমন বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ- صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- يَقُوْلُ : اِنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكَمْ ُحَتّى أَوَوا الْمَبِيْتَ إلى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوْا : إنَّه لَايُنْجِيْكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةَ إلَّا أنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللّٰهُمَّ كَانَ لِيْ أبْوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أهْلًا ولَا مَالًا، فَنَأى بِيْ فِيْ طَلَبِ شَيْئٍ يَوْمًا، فَلَمْ أرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّى نَامَا : فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا، فَوَجَدتُّهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أنْ أغْبِقَ قَبْلَهُمَا أهْلًا أوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ - وَالْقَدْحُ عَلَى يَدِيْ- أنْتَظِرُ اِسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّى بَرِقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا، اللّٰهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَجَرَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ.

قال النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : وقال الآخَرُ: اللّٰهُمَّ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أحَبَ النَّاسِ إلَيَّ، فَأرَدتُّهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتَّى ألَّمَتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ، فَجَائَتْنِيْ فَأعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلَى إن تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، حَتَّى إذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ : لَا أحِلُّ لَكَ أنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أعْطَيْتُهَا، اللّٰهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا.

195- দরসুল আকিদা

قال النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: وقَالَ الثَّالِثُ : اللّهُمَّ إِنِّيْ اسْتَأجَرْتُ أجَرَاءَ، فَأعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أجْرَهُ حَتّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأمْوَالُ فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ، أدِّ إِلَيَّ أجْرِيْ، فَقُلْتُ لَهُ : كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أجْرِكَ، مِنَ الْإبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالرَّقِيْقِ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ، لَاتَسْتَهْزِئْ بِيْ، فَقُلْتُ : إنِّيْ لَا أسْتَهْزِئُ بِكَ فَأخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্বের যুগে তিন ব্যক্তির একটি দল কোথাও যাত্রা করেছিল, যাত্রাপথে রাত যাপনের জন্য একটি গুহাতে তারা আগমন করে এবং তাতে প্রবেশ করে। আকস্মাৎ পাহাড় থেকে একটি পাথর খসে পড়ে এবং তাদের উপর গুহামুখ বন্ধ করে দেয় এমন অসহায় অবস্থায় তারা বলাবলি করছিল, 'তোমাদেরকে এ পাথর হতে মুক্ত করতে পারবে এমন কিছুই হয়ত নেই তবে যদি তোমরা নিজ নিজ নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া কর তাহলে হয়ত নাজাত পেতে পার'

তাদের একজন বলল : হে আল্লাহ ! আমার বয়োবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাদেরকে দেওয়ার পূর্বে আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য স্ত্রী-সন্তান ও গোলাম-পরিচারকদের কাউকে রাতের খাবার - দুগ্ধ - পেশ করতাম না একদিনের ঘটনা : ঘাসাচ্ছাদিত চারণভূমির অনুসন্ধানে বের হয়ে বহু দূরে চলে গেলাম আমার ফেরার পূর্বেই তারা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আমি তাদের জন্য রাতের খাবার দুগ্ধ দোহন করলাম কিন্তু দেখতে পেলাম তারা ঘুমাচ্ছেন তাদের আগে পরিবারের কাউকে- স্ত্রী-সন্তান বা মালিকানাধীন গোলাম-পরিচারকদের দুধ দেয়াকে অপছন্দ করলাম আমি পেয়ালা হাতে তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম, এতেই সকাল হয়ে গেল অতঃপর তারা জাগ্রত হলেন এবং তাদের রাতের খাবার-দুধ পান করলেন হে আল্লাহ ! আমি এ খেদমত যদি আপনার

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে এ পাথরের মুসিবত হতে আমাদের মুক্তি দিন তার এই দোয়ার ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, কিন্তু তাদের বের হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অপর ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল, সে ছিল আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় আমি তাকে পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমার থেকে দূরে সরে থাকল পরে কোন এক সময় দুর্ভিক্ষ তাড়িত ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে ঋণের জন্য আসে, আমি তাকে একশত বিশ দিরহাম দিই, এ শর্তে যে, আমার এবং তার মাঝখানের বাধা দূর করে দেবে সে তাতে রাজি হল আমি যখন তার উপর সক্ষম হলাম, সে বলল: অবৈধ ভাবে সতীচ্ছেদ করার অনুমতি দিচ্ছি না, তবে বৈধভাবে হলে ভিন্ন কথা আমি তার কাছ থেকে ফিরে আসলাম অথচ তখনও সে আমার নিকট সবার চেয়ে প্রিয় ছিল যে স্বর্ণ-মুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম, তা পরিত্যাগ করলাম হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে আমরা যে বিপদে আছি, তা হতে মুক্তি দাও পাথর সরে গেল, তবে এখনও তাদের বের হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট হল না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ !আমি কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম, অতঃপর তাদের পাওনা তাদের দিয়ে দেই তবে এক ব্যক্তি ব্যতীত, সে নিজের মজুরি রেখে চলে যায় আমি তার মজুরি বার বার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছি যার ফলে সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পায় অনেক দিন পরে সে আমার কাছে এসে বলে, 'হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরি পরিশোধ কর' আমি তাকে বললাম, 'তুমি যা কিছু দেখছ, উট গরু- বকরি- গোলাম, me তোমার মজুরি' সে বলল : হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সাথে উপহাস করো না আমি বললাম, 'উপহাস করছি না' অতঃপর সে সবগুলো গ্রহণ করল এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে গেল কিছুই রেখে যায়নি হে আল্লাহ! আমি যদি এ

কাজ তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে আমরা যে বিপদে আছি তা হতে মুক্তি দাও পাথর সরে গেলতারা সকলে নিরাপদে হেঁটে বের হয়ে আসল।[273]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম, নিজের সৎকর্মসমূহের মধ্যে যে কাজটি সুন্দর ও নির্ভেজাল আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত তার অসীলায় দুআ করা হয়েছে। ও দুআ কবুল হয়েছে।

তাই নিজের নেক আমলের অসীলা দিয়ে দুআ-মুনাজাত করা জায়েয।

সৎ আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ব্যাপারে এটি একটি জলন্ত প্রমাণ, কারণ এই তিনজন লোকই কঠিন অবস্থায় সৎ আমলকে আল্লাহ তা'আলার নিকট অসীলা করেছে।

প্রথম ব্যক্তি পিতা-মাতার সহিত সদ্যবহার, তাদের সহিত নম্রভাব এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করাকে অসীলা করেছে, আর এটি আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে একটি আমল যা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে। তিনি বলেন: এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি ইহসান কর।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এক মহিলার প্রেমে আশক্ত হয়ে তার সহিত ব্যভিচার করার সুযোগ পেয়েও তা থেকে বিরত থাকাকে অসীলা করেছে। এটিও একটি ভাল আমল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎকর্ম পরায়ন বান্দাদের সম্পর্কে বলেন:এবং তারা ব্যভিচার করেনা।

তৃতীয় ব্যক্তি আমানতকে সংরক্ষণ এবং তা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট অসীলা করেছে। আর তা একজন চাকরের হক্বকে যথাযথ সংরক্ষণ করে তা তাকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অসীলা করেছে। তিনি বলেন: হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের অঙ্গিকারগুলো আদায় কর। যখন তারা এগুলো করল, আল্লাহ তাদের বিপদকে দূর করে দিলেন এবং তাদের উপর পতিত কঠিন অবস্থাকে দূরিভূত করে দিলেন।

---

[273] বুখারী, ২২৭২, মুসলিম, ২৭৪৩

এখানে সৎ আমলের অসীলা করে আল্লাহর নিকট দো'আ করার উপকারিতার উপর একটি নির্দেশনা রয়েছে এতে, সেটি হলো:এর মাধ্যমে দো'আ কুবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী

❑ কোন নেককার লোকের কাছে গিয়ে দুয়া চাওয়ার মাধ্যমে ওসিলা করা

জীবিত নেককার লোকদের কাছে যেয়ে দুআ-মুনাজাতে তাদের অসীলা করা যেমন কোন ব্যক্তি একজন আল্লাহভীরু-পরহেযগার মানুষের কাছে যেয়ে বলল, জনাব আমি নতুন ব্যবসা শুরু করেছি। আপনি একটু দুআ করুন, আমি যেন ব্যবসায় সফল হতে পারি।

এ কাজটিও একটি অসীলা। আমরা অনেকেই মুত্তাকী ও নেককার মানুষ দেখলে তাদের কাছে অনুরূপভাবে উস্তাজ, মুরব্বীদের কাছে দুআ চেয়ে থাকি। এটা না জায়েয নয়। বরং এটি শরীয়ত অনুমোদিত একটি অসীলা।

কুরআন হাদীস দ্বারা এ ধরনের অসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত।

ক. ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ قَالَ سَوۡفَ أَسۡتَغۡفِرُ لَكُمۡ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

'তারা বলল: হে আমাদের বাবা! আমাদের পাপের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী, বাবা বলল: আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল দয়ালু।'[274] তারা তাদের পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নিকট তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বলল, তিনি জীবিত এবং উপস্থিত ছিলেন।

এমনিভাবে মুমিনদের জন্য বৈধ করা হয়েছে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট এসে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। তিনি বলেন:

[274] সূরা ইউসুফ: ৯৭-৯৮

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا

"এবং তারা যদি স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর আপনার নিকট এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতো, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবা গ্রহণকারী করুনাময়ী হিসাবে পেত।"[275]

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং আমাদের যে সকল মুমিন ভাই ইতোপূর্বে গত হয়েছেন, তাদেরকে ক্ষমা করে দিন"[276]

হাদীসে বর্ণিত আছে:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ

"কোনো মুমিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য কোনো মুমিনের দো'আ আল্লাহ কবুল করেন"[277]

عن أنس ابن مالك رضي الله قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة ، قام أعرابي فقال : يا رسول ، هلك المال وجاع العيال ، فادع الله لنا . فرفع يديه ، وما نرى في السماء قزعة ، فو الذي نفسي بيده ، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم ، فمطرنا يومنا ذلك ، ومن الغد وبعد الغد ، والذي يليه ، حتى الجمعة الأخرى . وقام ذلك الأعرابي ، أو قال غيره ، فقال : يا رسول الله ، تهدم البناء وغرق المال ، فادع الله لنا . فرفع يديه فقال : اللهم حوالينا ولا علينا . فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت

সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মানুষ অনাবৃষ্টির শিকার হল। নবী

---

275 সূরা নিসা ৬৪

276 সূরা আল-হাশর, ১০

277 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩৩

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জুমআয় খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন জনৈক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল,' ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর পরিজন উপোস থাকছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন।' তখন তিনি হাত তুলে দুআ করলেন। আকাশে আমরা কোন মেঘ দেখতে পাচ্ছিলাম না। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! তাঁর হাত নামানোর আগেই পর্বতের মত মেঘ আকাশ ছেয়ে গেল। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামার আগেই আমরা দেখলাম তার দাড়ি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। সেদিন তার পরের দিন, তারও পরেরদিন বৃষ্টি হল এমনকি পরবর্তী জুমআর দিনও বৃষ্টি হতে থাকল।

আবার সেই বেদুঈন দাঁড়াল অথবা অন্য কেউ। বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর মাল-সামান ডুবে যাচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দুটো উত্তোলন করে বললেন: ' হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষে করে দিন, আমাদের বিপক্ষে নয়।' তাঁর হাত দিয়ে মেঘের দিকে ইশারা করা মাত্র মেঘ কেটে গেল।[278]

এ হাদীস থেকে আমরা জানলাম, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দুআ করতে বলেছেন। এটা হল দুআ করার ক্ষেত্রে অসীলা গ্রহণ। এভাবে আমরা নেককার লোকদের কাছে দুআ চাই।

- ❑ **নিজস্ব দোআয়; জীবিত [শর্তসাপেক্ষে মৃত] আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আওলিয়ায়ে কেরাম এবং দ্বীনদার ব্যক্তির ওসীলা দিয়ে দুআ করা।** সহীহ বুখারীতে এসেছে -

أن عمر بن الخطاب : كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، قال : فيسقون .

যখন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন উমার ইবনুল খাত্তাব রা. আব্বাস রা. মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তখন তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমরা আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে (অসীলায়) আপনার কাছে দুআ

---

[278] বুখারী, ৯৩৩/মুসলিম, ৮৯৭

করতাম, আপনি আমাদের বৃষ্টি দিতেন। আর এখন আমরা আপনার কাছে আপনার নবীর চাচার অসীলায় (দুআ করছি) আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। লোকজন বলল, তখন বৃষ্টি হত।[279]

ইমাম আহমদসহ আরো অনেক মুহাদ্দিস সাহাবী উসমান বিন হানীফ রা. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন

عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ، فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: (إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخّرتُ ذاك، فهو خير) وفي رواية: (وإن شئتَ صبرتَ فهو خير لك)، فقال: ادعهُ. فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، فيصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهتُ بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم فشفّعه فيَّ. قال: ففعل الرجل فبرأ.

যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আমার জন্য দুআ করুন। তিনি যেন আমাকে সুস্থতা দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'যদি তুমি চাও আমি তোমার জন্য দুআ করব। আর যদি চাও, তাহলে দুআ বিলম্বিত করব। আর এটা তোমার জন্য কল্যাণকর।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, 'যদি তুমি চাও, ধৈর্য ধারণ করবে, তাহলে এটা তোমার জন্য কল্যাণকর।' লোকটি বলল, 'আপনি তাঁর কাছে দুআ করুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে নির্দেশ দিলেন, তুমি অজু কর। সে সুন্দরভাবে অজু করল। এরপর দু রাকাআত নামাজ আদায় করল। অতপর এভাবে দুআ করল : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আপনার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি। হে মুহাম্মাদ! আমি আমার প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার মাধ্যমে আমার প্রভূর দিকে মুখ করলাম

[279] বুখারী, ৩৭১০

হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করুন। বর্ণনাকারী উসমান বিন হানীফ বলেন, লোকটা দুআ করল আর সে সুস্থ হয়ে গেল।[280]

উক্ত সহীহ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত। ১. রাসূল স. এর কাছে এসে লোকটি দুয়ার আবেদন করেছে। এটি এক ধরণের ওসিলা। ২. রাসূল স. এর ওসিলায় দুয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল স. কারণ উক্ত দুয়াটি রাসূল স. এর শেখানো। ৩. ঐ ব্যাক্তি রাসূল স. এর ওসিলা দিয়ে দুয়া করেছে। এই তিনটি বিষয় মূল হাদীসের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত।

হযরত সুলাইম ইবনে আমের আল-খাবাইরী থেকে বর্ণিত-

عن سليم بن عامر الخبائري , أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - وأهل دمشق يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟، فناداه الناس , فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم أنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي , يا يزيد , ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب، كأنها ترس , وهبت لها ريح، فسقينا , حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم .

আকাশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলো। হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. ও দামেশকের লোকেরা বৃষ্টির জন্‌্য দুয়া করতে বের হলো। হযরত মুয়াবিয়া রা. যখন মেম্বারে বসলেন, তিনি বললেন, ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ জুরাশী কোথায়? লোকেরা তাকে ডাক দিলো। সে লোকদের ভিড় ঠেলে আসতে লাগলো। হযরত মুয়াবিয়া রা. তাকে নিদর্‌্েশ দিলেন। তিনি মেম্বারে উঠে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর পায়ের কাছে বসলেন। হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, হে আল্লাহ, আমরা আজ আমাদের মধে্‌্য সবচেয়ে ভালো ও সবোর্ত্তম ব্‌্যক্তির ওসিলায় আপনার কাছে

---

[280] শায়খ আলবানী রহ. হাদীসটির সূত্রকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন

দুয়া করছি। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে আজ ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ জুরাশীর ওসিলায় আবেদন করছি।
হে ইয়াজীদ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে, তুমি তোমার হাত উত্তোলন করো। ইয়াজীদ ইবনে আসওয়াদ তখন হাত উঠালেন। লোকেরাও তার সাথে হাত উঠালো। কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিম আকাশে ঢালের মতো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিলো। চার দিকে বাতাস বইতে শুরু করল। আমাদের উপর এমন বৃষ্টি হলো যে, লোকেরা তাদের বাড়ীতে যেতে পারছিল না।
ইরওয়াউল গালীল, হাদীস নং ৬৭২, একইভাবে শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী তার আত-তাওয়াসসুল কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
শায়খ আলবানী তার দু'টি কিতাবে এই বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। এই বর্ণনায় হযরত মুয়াবিয়া রা. দুয়াতে তিনি স্পষ্টভাবে হযরত ইয়াজীদ বিন আসওয়াদের ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করেছেন। এই হাদীসে দু'প্রকারের ওসিলা প্রমাণিত হয়েছে।
১. হযরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ এর সত্বার ওসিলা দিয়ে দুয়া করেছেন।
২. হযরত ইয়াজীদ বিন আসওয়াদকে দুয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। এছাড়াও হাদীসে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে ভালো ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে আপনার কাছে আবেদন করছি। এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ওসিলা দেয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো, আল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যাক্তির ওসিলা দেয়া। ইয়াজীদ ইবনে আসওয়াদকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র মনে করেই ওসিলা করা হয়েছে।

এ কারণে ফেকাহবিদগণ ইসতিস্কার নামাযে উপস্থিত কোনো সৎ জীবিত লোকের অসীলা করে বৃষ্টি চাওয়া মুস্তাহাব বলেছেন, তাতে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

মৃত ব্যক্তির উসীলা গ্রহণের হুকুম এবং এর হাকীকত

উলামাদের একাংশের মতে; যার অসীলা দিয়ে দুআ করবে তার জীবিত হওয়া ও উপস্থিত থাকা শর্ত। উদারহরণ হিসাবে তারা ঐ হাদিস উল্লেখ করে থাকেন; যা আমরা উপরে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে তাঁর অসীলা দিয়ে দুআ করা হল। তিনি যখন চলে গেলেন, তখন তাঁরই জীবিত এক মুরুব্বী বয়োবৃদ্ধ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর অসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অসীলা করা হল না।

অপরপক্ষ উলামাদের মতে তা জায়েয- যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আওলিয়ায়ে কেরাম এবং বুজুর্গানে দ্বীনের ওসীলা দিয়ে দুআ করা ।

তবে এজন্য শর্ত হল ওসীলাকে 'মুআসসিরে হাকীকী' তথা মূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী মনে করা যাবে না। এমনও মনে করা যাবে না যে, ওসীলা গ্রহণ ছাড়া দুআ কবুলই হবে না। এমন করা সুস্পষ্ট গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। সেই সাথে ওসীলা গ্রহণের উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, আম্বিয়াগণ বা আওলিয়াগণ এর কাছে স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করতে প্রার্থনা করা হবে। তাদের কাছে প্রয়োজন পূর্ণ করার ফরিয়াদ করা হবে। এটা শিরকী আক্বিদা ও পদ্ধতি এতে কোন সন্দেহ নেই। যেমনটি কতিপয় মুর্খ জাহেলরা করে থাকে।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নেই তার ওসীলা দিয়ে দুআ করা জায়েজের দলীল

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং যা দিয়ে তারা ইতোপূর্বে কাফেরদের উপর বিজয় কামনা করতো।[281]

---

281 সূরা বাকারা-৮৯

মুফতী আল্লামা সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী রহ. বলেন-

نزلت في بني قريظة والنضير كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والمعنى يطلبون من الله تعالى أن ينصرهم به على المشركين ، كما روى السدي أنهم كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة ووضعوا أيديهم على موضع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدوّنا فينصرون

এ আয়াত নাজীল হয়েছে বনী কুরাইজা ও বনী নজীরের ব্যাপারে। রাসূল সাঃ এর আগমণের পূর্বে যারা আওস ও খাজরাজের বিরুদ্ধে রাসূল সাঃ এর ওসীলা দিয়ে দুআ করতো। এ বক্তব্যটি ইবনে আব্বাস রাঃ এবং কাতাদা এর।

আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার মানে হল, তারা এর দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। যেমন সিদ্দী বর্ণনা করেন যে, যখন তাদের ও মুশরিকদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যেত, তখন তারা তাওরাত কিতাব বের করত, এবং তাদের হাত যেখানে রাসূল সাঃ এর নাম আছে তার উপর রাখতো, আর বলতো-"হে আল্লাহ! আমরা আজকে আপনার সাহায্য কামনা করছি আমাদের শত্র"দের বিরুদ্ধে ঐ সত্য নবীর ওসীলায় শেষ জমানায় যার আগমনের ওয়াদা আপনি করেছেন। তারপর তাদের সাহায্য করা হতো।[282]

আল্লামা মহল্লী রহঃ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন

রাসূল সাঃ এর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য পার্থনা করে বলতো- اللهم انصرنا عليهم باالنبى المبعوث آخر الزمان তথা হে আল্লাহ! শেষ জমানায় আগমনকারী নবীর ওসীলায় আমাদের সাহায্য করুন।[283]

---

[282] তাফসীরে রুহুল মাআনী-১/৩২০

[283] তাফসীরে জালালাইন-১/১২ তাফসীরে ইবনে কাসীর রাহি. [১/১২৪] সহ প্রায় সকল মুফাস্সির একই অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য- উসুলে ফিক্বহ অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাঃ যদি পর্ববর্তীদের শরীয়ত সমালোচনা বা নিষেধ করা ছাড়া বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে সেটি আমাদের উপরও লাযেম হয়ে যায়।[284]

নোট-

রাসূল সাঃ দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিলেন না। সে সময় ইহুদীরা রাসূল সাঃ এর ওসীলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতো। আর এ বিষয়কে আল্লাহ তাআলা সমালোচনাহীনভাবে উদ্ধৃতি করেছেন। রাসূল সাঃ থেকেও এ ওসীলার কোন বিরোধীতা বর্ণিত নেই। তাই রাসূল সাঃ এখনো দুনিয়াতে নেই। তাই এ আয়াত অনুপাতে রাসূল সাঃ ওসীলা গ্রহণ এখনো জায়েজ আছে।

হযরত উসমান বিন হানীফ রাঃ থেকে ওসীলা জায়েজের প্রমাণ

أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه و سلم نبي الرحمة

এক ব্যক্তি হযরত উসমান বিন আফফান রাঃ এর কাছে একটি জরুরী কাজে আসা যাওয়া করত। হযরত উসমান রাঃ [ব্যস্ততার কারণে] না তার দিকে তাকাতেন, না তার প্রয়োজন পূর্ণ করতেন। সে লোক হযরত উসমান বিন হানীফ রাঃ এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেনঃ তুমি ওজু করার স্থানে গিয়ে ওজু কর। তারপর মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়। তারপর বল, হে আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। রহমাতের নবী মুহাম্মদ সাঃ এর ওসীলায় তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি।[285]

---

[284] নূরুল আনওয়ার-২১৬

[285] আল মুজামে সগীর, ৫০৮, আল মুজামুল কাবীর, ৮৩১১, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১০১৮

হাদীসটির সনদ প্রসঙ্গে ইমাম তাবরানী বলেন والحديث صحيح তথা এ হাদীসটি সহীহ। আল মুজামে সগীর-১০৪

আল্লামা মুনজিরী রহঃ ও এ কথার পক্ষাবলম্বন করেছেন। আত তারগীব ওয়াত তারহীব-১/২৪২

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহঃ বলেনঃ رواه التبرانى بسند جيد তথা তাবারানী রহঃ এটাকে উত্তম সনদে তা বর্ণনা করেছেন। হাশীয়ায়ে ইবনে হাজার মক্কী আলাল ঈজাহ ফি মানাসিকিল হজ্ব লিননববী-৫০০, মিশর

এ হাদীসের শেষে স্পষ্ট রয়েছে যে, লোকটি তা'ই করেছিল। তার দুই কবুলও হয়েছিল। ফলে হযরত উসমান রাঃ তাকে সম্মান দেখিয়ে তার প্রয়োজনও পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহঃ উক্ত হাদীস বর্ণনার পর লিখেন-

এর দ্বারা মৃত্যুর পর ওসীলা গ্রহণ করার বিষয়টিও প্রমাণিত। এছাড়া রেওয়ায়েত তথা বর্ণনার সাথে সাথে দিরায়াত তথা যৌক্তিকতার নিরিখেও তা প্রমাণিত। কেননা, প্রথম বর্ণনা দ্বারা যে ওসীলা প্রমাণিত তা উভয় অবস্থাকেই শামীল করে থাকে।[286]

উলামাদের একাংশের মতে
মুত্তাকী-বুজুর্গদের ওসীলা দেয়া,

রাসূল সাঃ এর ওসীলা দেয়া যেমন জায়েজ, তেমনি বুজুর্গদের ওসীলা দেয়া ও জায়েজ আছে।[287]

---

[286] নশরুত তীব-২৫৩

নিম্ন বর্ণিত ওলামাগণও এ ওসীলাকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। যথা-

১- আল্লামা সাইয়্যেদ সামহুদী- ওয়াফাউল ওয়াফা-২/৪২২

২- আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী রহঃ- শিফাউস সিক্বাম-১২০

৩- আল্লামা আলুসী রহঃ- রূহুল মাআনী-৬/১২৮

৪- শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহঃ- হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা

৫- শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দেসে দেহলবী- মিআতু মাসাঈল-৩৫

৬- শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ- তাক্বিয়াতুল ঈমান-৯৫

[287] 1- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলআবদারী আল-মালেকী আল মাদখাল-১/২৫৫ -ইবনুল হজ্ব

2- আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহঃ আলাল ইজাহ ফী মানাসিকিল হজ্ব লিননাবাবী-৫০০

3- আল্লামা আলুসী রহঃ রূহুল মাআনী-৬/১২৮

4- যফর আহমাদ উসমানী ইমদাদুল আহকাম-১/৪১

5- মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী রহঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া-৫/১৩৬-১৩৭

মাকরূহ/হারাম ওসীলা

▪ কারো অধিকার বা মর্যাদার দোহাই দিয়ে ওসীলা করা

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ), ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ) সকলেই একমত যে কারো অধিকার বা মর্যাদার দোহাই দিয়ে আলাহর কাছে দু'আ চাওয়া মাকরূহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তার নাম, মর্যাদা, সম্মান দিয়ে দুআ করতে বলেননি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর কোন সাহাবী বা তাবেয়ীন তার নাম, মর্যাদার অসীলা দিয়ে দুআ করেননি।

আলামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন-

قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام، ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما - أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف - رحمه الله - لما بلغه الأثر فيه

"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় বলেছেন: 'আমি অমুকের অধিকার বা আপনার নবী-রাসূলগণের অধিকার, বা বাইতুল হারামের অধিকার বা মাশ'আরুল হারামের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি বা প্রার্থনা করছি' বলে দু'আ করা মাকরূহ।"[288]

আলামা আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি) বলেন: 'আমি আপনার নবী-রাসূলগণের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি এবং অমুকের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি বলে দু'আ করা মাকরূহ; কারণ মহান আলাহর উপরে কারো কোনো অধিকার নেই।"[289]

---

[288] ইবনূ আবিল ইযয, শারহূল আকিদাত, তাহাবী, পৃষ্ঠা, ২৩৭

[289] বাদাইউস সানায়ে, ৫/১২৬

❑ الاستعانة [2.1.2- সাহায্য প্রার্থনা]

সাহায্য প্রার্থনা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“(হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি” সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৪

আর হাদীসে এসেছে,

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.

“যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্রভাবে) চাইবে।”[290]

❑ الاستعاذة [2.1.3- আশ্রয় প্রার্থনা]

আশ্রয়ের শিরক বলতে যে কোন অনিষ্টকর বস্তু বা ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা ব্যতীত অন্য কারোর শরণাপন্ন হওয়াকেই বুঝানো হয়।

আল্লাহ্ তা’আলার নিকট এ জাতীয় কোন আশ্রয় কামনা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক। তবে যে আশ্রয় মানব সাধ্যাধীন তা সক্ষম যে কারোর নিকট চাওয়া যেতে পারে। তবুও এ ব্যাপারে কারোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নিকটই আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন:

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

‘‘যদি শয়তান তোমাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে প্ররোচিত করতে চায় তাহলে তুমি একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলারই আশ্রয় চাবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ’’[291]

তিনি আরো বলেন:

---

[290] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৩; হাদীস নং ২৬৬৯

[291] ফুস্সিলাত/হা-মীম আস সাজদাহ্: ৩৬

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ، وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضُرُوْنَ

‘‘আর আপনি বলুন: হে আমার প্রভু! আমি শয়তানের প্ররোচনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করি তাদের উপস্থিতি হতে’’[292]

মানব শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও একমাত্র তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন:

فَاسْتَعِذْ بِاللهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

‘‘অতএব আপনি (ওদের শত্রুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য) একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলারই শরণাপন্ন হোন। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা’’[293]

আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর প্রিয় নবীকে আরো ব্যাপকভাবে তাঁর আশ্রয় চাওয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন:

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِيْ الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

‘‘আপনি বলুন: আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের প্রভুর তাঁর সকল সৃষ্টি, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত, গ্রন্থিতে ফুৎকারকারিনী নারী এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে’’[294]

তিনি আরো বলেন:

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

‘‘আপনি বলুন: আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানবের প্রভু, মালিক ও উপাস্যের আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানব অন্তরে। চাই সে জিন হোক অথবা মানুষ’’[295]

---

[292] মু’মিনূন : ৯৭-৯৮

[293] গাফির/মু’মিন: ৫৬

[294] ফালাক্ব: ১-৫

[295] নাস: ১-৬

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর আশ্রয় চাইলে তাতে তারা তাদের অনিষ্ট কখনো বন্ধ করেনা বরং তারা আরো হঠকারী, অনিষ্টকারী ও গুনাহগার হয় এবং আশ্রয় অনুসন্ধানীরা আরো বিপথগামী ও পথভ্রান্ত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْـجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

''আর কিছু সংখ্যক মানুষ কতক জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করতো। তাতে করে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা আরো বাড়িয়ে দেয়''[296]

জ্বীনদের নিকট আশ্রয় কামনা বা তাদের দিয়ে উপকৃত হওয়ার বিধান

জিনদের আশ্রয় কামনাকারী মুশরিক বা জাহান্নামী হলেও তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় মানুষের কিছুনা কিছু উপকার করতে অবশ্যই সক্ষম। সুতরাং তাদের থেকে উপকার পাওয়া যাচ্ছে বলে তাদের আশ্রয় কামনা করা কখনোই জায়েয হবেনা। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি কর্তৃক উপকৃত হওয়া তা জায়েয বা হালাল হওয়া প্রমাণ করেনা। এমনও অনেক বস্তু বা কর্ম রয়েছে যা হারাম বা না জায়েয হওয়া সত্ত্বেও তা কর্তৃক মানুষ কিছু না কিছু উপকৃত হয়ে থাকে। যেমন: ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কোর'আন ও হাদীসে অজ্ঞ বা অপরিপক্ক পীর ফকিররা যে কোন সমস্যার সমাধানে সাধারণত জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

মানুষরা যে জিন জাতি কর্তৃক কখনো কখনো উপকৃত হতে পারে; তা আল্লাহ্ তা'আলা কোর'আন মাজীদের মধ্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِنْسِ، وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُمْ مِّنَ الإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِيْ أَجَّلْتَ لَنَا، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

''হে মোহাম্মাদ! স্মরণ করুন সে দিনকে যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও জিন শয়তানদেরকে একত্রিত করে বলবেন: হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা বহু মানুষকে

---

[296] জিন:৬

গুমরাহ্ করেছো। তখন তাদের কাফির অনুসারীরা বলবে: হে আমাদের প্রভু! আমরা একে অপরের মাধ্যমে প্রচুর লাভবান হয়েছি। এভাবেই আমরা আমাদের নির্ধারিত জীবন অতিবাহিত করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন: জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে মুক্তি দিতে চাইবেন সেই একমাত্র মুক্তি পাবে। অন্যরা নয়। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু সুকৌশলী এবং অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়''[297]

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) বিশেষ প্রয়োজনে সকলকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় চাওয়া শিখিয়েছেন। অন্য কারোর নয়।

খাওলা বিন্তে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

''যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবস্থান করে বলবেঃ আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ বাণীর আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। তাহলে উক্ত স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন বস্তু বা ব্যক্তি তার এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না''[298]

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।[299]

এই আয়াতের আলোকে আলেমরা বলেন "জিনদের সাহায্য চাওয়া হারাম" তবে স্বাভাবিকভাবেই শয়তান/জিনরা যেহুতু এমনিতেই কাজ করবে না। শয়তান বা জিনদের থেকে ফায়দা নিতে হলে, তাদের কথা অনুযায়ী স্যাটানিক রিচ্যুয়াল পালন করতে হয়, সেক্রিফাইস করতে হয়, আল্লাহর নামে না করে তাদের নামে পশু জবাই করতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

[297] আন্'আম: ১২৮

[298] মুসলিম, ২৭০৮ তিরমিযী, ৩৪৩৭

[299] সুরা জিন, ৬

যেমন গরু লাগবে, মুরগি লাগবে, ছাগল লাগবে। এসব শয়তানের নামে বলি দেয়, বলে “জবাই করার পর রক্তটা আমাকে দিয়েন।” এই রক্ত শয়তানের উপাসনায় ব্যবহার করে। যাদুবিদ্যায় বিভিন্ন মৃত প্রাণীর রক্ত ব্যবহার করা খুবই কমন ব্যাপার।
কেউ কেউ বলেন- “কোন কুফর শিরক ছাড়া, স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের খিদমাতের জন্য যদি কোন জিন সাহায্য করে। তবে নাকি জায়েজ হবে।”
এর জবাব হচ্ছে-
১। এসব বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা ভালোভাবেই জানেন, জিনেরা প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী আর ধোকাবাজ হয়। অতএব, হতে পারে সে আসলে একটা শয়তান। কৌশলে ফিতনায় ফেলছে।
২। আমাদের চিকিৎসার জন্য কোরআন আছে। সুন্নাহ সম্মত রুকইয়া আছে। কেন আমরা সুন্নাহ ছেড়ে সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হব?
৩। আর আওয়ামুন নাস যেহেতু পেছনের খবর জানে না, তাদেরকে মুসতাগিস মিনাল জিনের কাছে পাঠানো মানে হচ্ছে “নিজ হাতে ফিতনার দরজা খুলে দেয়া।”
সুতরাং তাদের জন্য নিরাপদ হচ্ছে এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকা, আর সুন্নাহসম্মত রুকইয়া করা।
আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيم.
যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষের মাঝে অনেককে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছ। মানুষদের মাঝে তাদের বন্ধুরা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, “আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে উপকার লাভ করেছি।” আর এখন আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি।

তখন তাদের বলা হবে “আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। সেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; আর আল্লাহ যেমন চাইবে..”নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।[300]

❑ الاستغاثة [2.1.4- উদ্ধার প্রার্থনা]

ফরিয়াদের শিরক বলতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আল্লাহ্ তা’আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য আহবান করাকে বুঝানো হয়। যে ধরনের সাহায্য সাধারণত একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়। যেমন: রোগ নিরাময় বা নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার ইত্যাদি।

এ জাতীয় ফরিয়াদ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক।

যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা হলে একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই সে ফরিয়াদ শুনে থাকেন এবং তদনুযায়ী বান্দাহেক তিনি সাহায্য করেন। অন্য কেউ নয়।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

‘‘স্মরণ করো সেই সংকট মুহূর্তের কথা যখন তোমরা নিজ প্রভুর নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের সেই প্রার্থনা কবুল করেছিলেন’’[301]

মক্কার কাফিররা সংকট মুহূর্তে নিজ মূর্তিদের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলার নিকটই ফরিয়াদ করতো। তখন আল্লাহ্ তা’আলা তাদেরকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করতেন। এরপর তারা আবারো আল্লাহ্ তা’আলাকে ভুলে গিয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের কবর বা পীর পূজারীরা আরো অধঃপতনে পৌঁছেছে। তারা সংকট মুহূর্তেও আল্লাহ্ তা’আলাকে ভুলে গিয়ে নিজ পীরদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে।

আল্লাহ্ তা’আলা মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেন:

---

[300] সুরা আন’আম, ১২৮

[301] আনফাল্: ৯

فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ

''তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকে। অন্য কাউকে নয়। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে পানি থেকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন তখন তারা আবারো তাঁর সাথে শির্কে লিপ্ত হয়''[302]

তিনি আরো বলেন:

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُوْنَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ، بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ

''আপনি ওদেরকে বলুন: তোমরাই বলো! আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন শাস্তি অথবা কিয়ামত এসে গেলে তোমরা কি তখন আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে? তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে অবশ্যই সঠিক উত্তর দিবে। সত্যিই তোমরা তখন অন্য কাউকে ডাকবেনা। বরং তখন তোমরা ডাকবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে। তখন তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। আর তখন তোমরা অন্যকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শরীক করা ভুলে যাবে''[303]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِيْ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوْرًا

''সমুদ্রে থাকাকালীন যখন তোমরা কোন বিপদে পড়ো তখন আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য সকল শরীক তোমাদের মন থেকে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন তখন তোমরা আবারো তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে যাও। সত্যিই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ''[304]

তিনি আরো বলেন:

---

[302] আনকাবূত: ৬৫

[303] আন্'আম:৪০-৪১

[304] বানী ইস্রাঈল:৬৭

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُوْنَ، ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ

‘‘তোমরা যে সকল নিয়ামত ভোগ করছো তা সবই আল্লাহ্ তা’আলার নিকট হতে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ দীনতার সম্মুখীন হও তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে ডাকো। অতঃপর যখন তিনি তোমাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করে দেন তখন আবারো তোমাদের একদল নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে শির্কে লিপ্ত হয়ে যায়’’[305]

আল্লাহ্ তা’আলা এ জাতীয় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামী বলেছেন। তিনি বলেন:

وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ للهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ، قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

‘‘মানুষকে যখন দুঃখ দুর্দশা পেয়ে বসে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রভুকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি ওর প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন তখন সে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা’আলাকে স্মরণ করার কথা ভুলে গিয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে অন্যদেরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। (হে রাসূল!) তুমি বলে দাও: আরো কিছু দিন কুফরীর মজা ভোগ করো। নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম’’[306]

পীর বা কবর পূজারীরা যতই নিজ ওলী বা বুযুর্গদের নিকট ফরিয়াদ করুক না কেন, যতই তাদের পূজা অর্চনা করুক না কেন তারা এতটুকুও নিজ ভক্তদের দুর্দশা ঘুচাতে পারবে না। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

قُلِ ادْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلاَ يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيْلًا

[305] নাহল: ৫৩-৫৪

[306] যুমার:৮

217- দরসুল আকিদা

‘‘আপনি বলে দিন: তোমরা আল্লাহ্ তা’আলা ছাড়া যাদেরকে পূজ্য বানিয়েছো তাদেরকে ডাকো। দেখবে, তারা তোমাদের কোন দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারবে না। এমনকি সামান্যটুকু পরিবর্তনও নয়’[307]

তিনি আরো বলেন:

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْـمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ، أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ، قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

‘‘মূর্তীদের উপাসনা করাই উত্তম না সেই সত্তার উপাসনা যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা’আলার সমকক্ষ অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো’’[308]

একমাত্র আল্লাহ্ তা’আলাই সকল সমস্যা সমাধান করতে পারেন। তা যাই হোকনা কেন এবং যে পর্যায়েরই হোকনা কেন।

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন:

يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ

‘‘(আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর বান্দাহেদরকে উদ্দেশ্য করে বলেন) হে আমার বান্দাহরা! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট। শুধু সেই ব্যক্তিই হিদায়াতপ্রাপ্ত যাকে আমি হিদায়াত দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকটই হিদায়াত চাও। আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দেবো। হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। শুধু সেই ব্যক্তিই আহারকারী যাকে আমি আহার দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকটই আহার চাও। আমি তোমাদেরকে আহার দেবো। হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই বিবস্ত্র। শুধু সেই ব্যক্তিই আবৃত যাকে আমি আবরণ দেবো। অতএব তোমরা আমার

---

307 বানী ইস্রাঈল ৫৬

308 নাম্‌ল:৬২

নিকটই আবরণ চাও। আমি তোমাদেরকে আবরণ দেবো। হে আমার বান্দাহ্রা! তোমরা সবাই রাতদিন গুনাহ্ করছো। আর আমি সকল গুনাহ্ ক্ষমাকারী। অতএব তোমরা আমার নিকটই ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো''[309]

একনজরে শিরিক ফিল উলুহিয়্যাহ'র কিছু উদাহরণ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আ. ওয়াহহাব রাহি. কর্তৃক চয়নকৃত; নিম্নের অন্যতম কয়েকটি ইবাদাত; প্রত্যেকটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে; যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে এসব নিবেদন করা হয়; তাহলে তা শিরিকে আকবারে গণ্য হবে।[310]

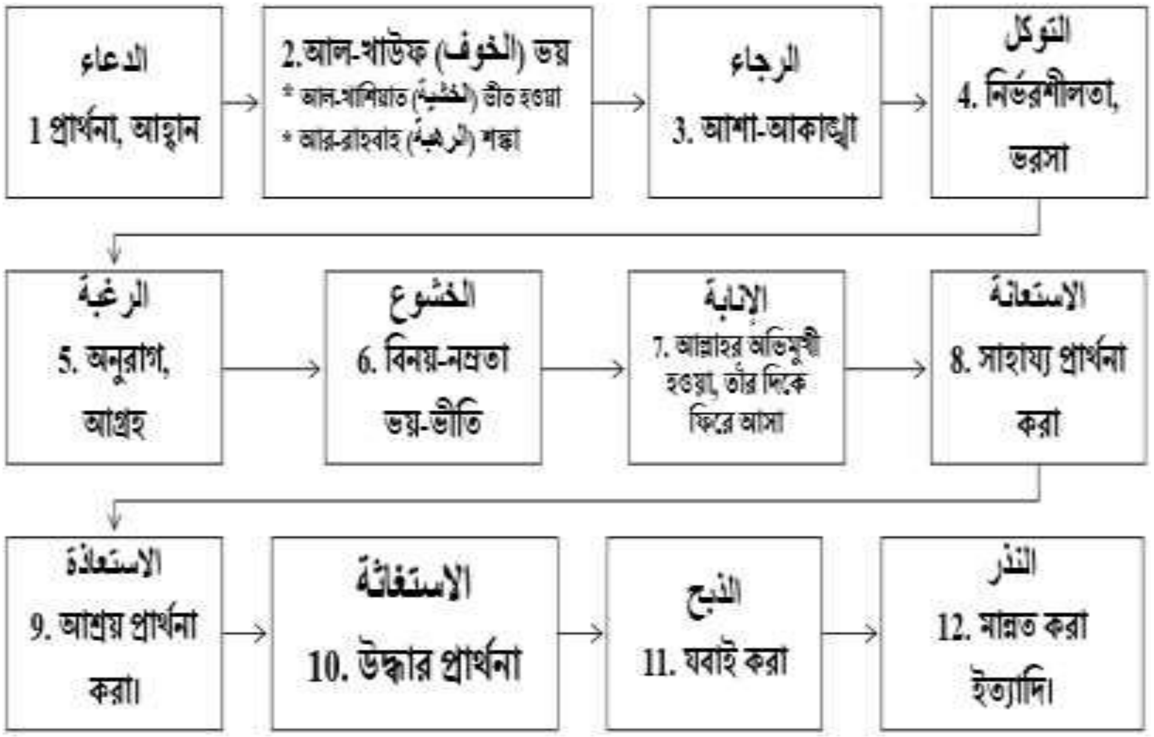

এগুলোসহ আরও যে সব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে।

---

[309] মুসলিম, ২৫৭৭

[310] উসুলুস ছালাছা- পৃ- 3

খাউফ-খাসইয়াহ এবং রাহবাহ এর মধ্যকার পার্থক্য

قال ابن القيم رحمه الله [311]

الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.

الخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله قال الله تعالى : إنما يخشى الله من عباده العلماء) .فهي خوف مقرون بمعرفة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :(إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية)

فالخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون ، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان

إحداهما : حركة للهرب منه وهي حالة الخوف.

والثانية : سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية ومنه انخشى الشيء، والمضاعف والمعتل أخوان كتقضي البازي وتقضض.

وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه ، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه

কুরআন-সুন্নাহ থেকে এসবের প্রমাণ

❑ **দো‘আ হচ্ছে ইবাদত।** এর প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।”[312]

তাছাড়া হাদীসে এসেছে,

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ

“দো‘আ বা প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদতের সারাংশ”[313]

---

[311] المدارج 362

[312] সূরা গাফির: ৬০

[313] তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭১

- **ভয় করা ইবাদত।** এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না, বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক।[314]

- **আশা করা ইবাদত।** এর দলীল আল্লাহর বাণী,

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا ﴾

"অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্খা পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্ম করে; আর নিজ রবের ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।"[315]

- **নির্ভরশীলতা ইবাদত।** এর দলীল আল্লাহর বাণী,

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।"[316]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ.

"আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ) যথেষ্ট।"[317]

- **আগ্রহ, ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় ইবাদত হিসেবে বিবেচিত।** এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী

إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ

"নিশ্চয় এরা সৎকর্মে ত্বরিত ও সদা তৎপর ছিল। আর ভক্তি ও ভয় সহকারে আমাকে আহ্বান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়-বিনম্র।"[318]

---

314 সূরা আলে ইমরান: ১৭৫

315 সূরা কাহাফ: ১১০

316 সূরা আল-মায়েদা, ২৩

317 সূরা আত-ত্বালাক: ৩

318 সূরা আল-আম্বিয়া, ৯০

- **ভীত-শঙ্কিত থাকা ইবাদত।** এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِي

"সুতরাং তোমাদের তাদের ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।"[319]

- **নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা ইবাদত।** এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ

"আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এসো এবং তাঁরই নিকট সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর।"[320]

- **জবেহ করাও ইবাদত:** এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

"(হে রাসূল) বলে দাও, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোনোই শরীক নেই এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট আর আমিই হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী"[321]

হাদীসে এসেছে,

لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ

"যারা অপরের নামে যবেহ করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন।"[322]

- **মান্নত পূর্ণ করাও ইবাদত।** এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا

"তারা অঙ্গীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে, যে দিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী।"[323]

---

[319] সূরা আল-বাকারা: ১৫০

[320] সূরা আয-যুমার: ৫৪

[321] সূরা আল-আন'আম, ১৬২-১৬৩

[322] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮

[323] সূরা আদ-দাহার: ৭

শিরকে আকবার এর তৃতীয় প্রকার

شرك في الأسماء والصفات

‘‘শিরিক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত’’

সূচী

❁ পরিচয়

❁ উদাহরণ

1. ‘ইলমুল গাইব’ সম্পৃক্ত আক্বিদা
2. ‘হাযির-নাযির’ সম্পৃক্ত আক্বিদা

পরিচয়

[الشرك في الأسماء والصفات] নাম ও গুণাবলির শির্‌ক- মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল অস্বীকার করা অথবা গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। অর্থাৎ মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

উদাহরণ

‘ইলমুল গাইব’ সম্পৃক্ত আক্বিদা

আমরা যত কিছুই জানি না কেন আমাদের সকলের জ্ঞানের সমষ্টি আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের তুলনায় মহা সমুদ্রের একবিন্দু পানিরও সমতুল্য নয় কারণ; মহান আল্লাহর জ্ঞান হচ্ছে তাঁর সত্তাগত ব্যাপার, আর আমাদের জ্ঞান হচ্ছে অর্জনগত ব্যাপার। তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করে পঞ্চেন্দ্রিয় [five senses] প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় হলো পাঁচটি, যথা : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও স্পর্শ- এর সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করে কিছু জ্ঞানার্জনের তৌফিক দিয়েছেন বলেই আমরা কিছু জানতে পারি। আমাদের অসাক্ষাতে ও পিঠের পিছনে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কে কেউ সংবাদ না দিলে আমরা কিছুতেই তা জানতে পারি না বলে এ সব আমাদের সম্পূর্ণ অজানা ও অদৃশ্য থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে নবী, রাসূল, অলি ও সাধারণ মানুষ সকলেই সমান।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গায়েব বা অদৃশ্যের খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও গায়েবের খবর জানতেন না।

মানুষের জন্য যা অজানা ও গায়েব তা 2 ভাগে বিভক্ত : এক. রেসালত ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দুই. সাধারণ বিষয়াদি

নবী ও রাসূলগণ রেসালত ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে সংবাদ পেতেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ বা ইলহাম অথবা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। আর পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যপারে সংবাদ পেতেন একইভাবে প্রত্যাদেশ বা ইলহাম অথবা সত্য স্বপ্ন বা স্বচক্ষে দেখা কোনো মানুষের সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে। নবী ব্যতীত অন্যান্য সকল মানুষগণ অজানা বিষয়ের সংবাদ আল্লাহর ইচ্ছা হলে কখনও বা ইলহাম কখনও বা সত্য স্বপ্ন, কখনও বা স্বচক্ষে দেখেছে এমন কোনো মানুষের মাধ্যমে পেতে পারেন।

মোটকথা : যা কিছু আমাদের অসাক্ষাতে সংঘটিত হয় তা-ই অদৃশ্য বা গায়েবের অন্তর্গত বিষয়। এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া কোনো মানুষেরই স্বভাব, প্রকৃতি ও তাদের গুণাবলীর মধ্যকার বিষয় নয়; বরং তা আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত বিষয়। তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা তাঁর নিজের জন্যেই রেখে দিয়েছেন। এটি তাঁর সত্তাগত গুণের অন্তর্গত বিষয়। মহান আল্লাহ এ জাতীয় গুণের একচ্ছত্র অধিকারী হয়েছেন বলেই তিনি আমাদের রব বা প্রতিপালক। তাঁর এ সব গুণ রয়েছে বলেই আমরা প্রকাশ্য ও গোপনে যা কিছুই করি না কেন তিনি তা সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন। তাঁর সৃষ্টির কেউ এ গুণের কম-বেশী অধিকারী হতে পারলে সে তো তাঁর এ বিশেষগুণের সাথে শরীক হয়ে যাবে। সে জন্যে তিনি কস্মিনকালেও তাঁর কোন সৃষ্টিকে এ গুণের নূন্যতম অধিকারীও করেন না।

আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গায়েব বা অদৃশ্যের খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও গায়েবের খবর জানতেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ -

`বল যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক নই। যদি আমি অদৃশ্যের খবর রাখতাম, তাহ'লে আমি অধিক

কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনরূপ অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না। আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী মাত্র'[324]

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।[325]

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুব বলেন- যে গায়েবের যাবতীয় চাবিকাঠির একচ্ছত্র মালিক হলেন তিনিই। সে জন্য তিনি কুরআনুল কারীমে বলেন

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে গায়েবের সকল চাবিকাঠি, তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না, স্থলে ও জলে যা কিছু রয়েছে তিনি তা অবগত রয়েছেন, গাছের একটি পাতা পড়লেও তিনি তা জানেন, পৃথিবীর অন্ধকার অংশে কোন শষ্যকণা বা কোন আদ্র বা শুষ্ক বস্তু পতিত হলে তাও প্রকাশ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।'[326]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইলমুল গাইব আছে বলে বিশ্বাস করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন: "ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণক-জ্যোতিষী গাইবী বিষয়ে যা বলে তা বিশ্বাস করা বা তা সত্য বলে মনে করা কুফরী; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন "বল: আল্লাহ ব্যতীয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" তিনি আরো বলেন: "জেনে রাখ, নবীগণ (আ) অদৃশ্য বা গাইবী বিষয়াদির বিষয়ে আল্লাহ কখনো কখনো যা জানিয়েছেন তা ছাড়া কিছুই জানতেন না। হানাফী মাযহাবের আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ গাইব জানতেন বলে আকীদা পোষণ করা কুফরী, কারণ

---

[324] আ'রাফ ১৮৮

[325] সূরা নামল-৬৫

[326] সূরা আল-আন'আম : ৫৯

তা আল্লাহ্‌র এ কথার সাথে সাংঘষিক "বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"[327]

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এমন সব বাস্তব অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা পরিষ্কারভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি গায়েব সম্পর্কে আদৌ কিছুই জানতেন না। তাঁর জীবনের বিবিধ ঘটনাপঞ্জীর মধ্য থেকে নিম্নে চারটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

১- অপবাদের ঘটনা:قصة الإفك

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার উপর বনু মুসতালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে মুনাফিকরা একজন নিরপরাধ সাহাবীর সাথে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। সাধারণ জনগণের মাঝে এ নিয়ে অনেক তোলপাড় শুরু হয়েছিল। এমনকি এ নিয়ে কিছু সাধারণ মুসলিমরাও কথা বলাবলি শুরু করেছিল। ঘটনার সত্য-মিথ্যা না জানার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যাপারে অনেকটা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি শেষ অবধি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এবং যায়দ ইবনে হারিছাহ্ এর সাথে এ নিয়ে পরামর্শও করেছিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহেরও বেশী সময় এ ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর অবশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ মর্মে আয়াত নাযিল হয় :

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلۡإِفۡكِ عُصۡبَةٞ مِّنكُمۡۚ

যারা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল...।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ঘটনার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যদি বাস্তবে গায়েব সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখতেন, তা হলে জনগণের মধ্যে এ বিষয়টি ছড়া-ছড়ি হওয়ার পূর্বেই তিনি এর ভিত্তিহীনতার কথা ঘোষণা করে দিতেন। ঘটনার সত্য-মিথ্যা জানার জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন যাবৎ অহীর জন্য অপেক্ষা করতে হতো না।

---

[327] কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকিদা-ড. আ.জাহাঙ্গির রাহি.পৃ ৪৬৫

দ্বিতীয় উদাহরণ:

উম্মুল মুমিনীন আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহ থেকে আমাদের দ$_s$র মধ্যে যার গৃহেই প্রথমে প্রবেশ করবেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলবে- আমি আপনার মুখে মাগাফীর এর দুর্গন্ধ পাচ্ছি। তাঁদের এ ঐকমত্যে পৌঁছার মূল উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অধিকহারে যাওয়া থেকে বিরত রাখা। যথারীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহ থেকে বের হয়ে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলে তিনি বললেন-আমি আপনার মুখে মাগাফিরের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্যে মধু পান করা হারাম করে দিলেন। তিনি আদৌ বুঝতেও পারেন নি যে, এটি ছিল যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অধিকহারে যাওয়া থেকে তাঁকে বারণ করার জন্য তাঁদের দুজনের একটি ফন্দি বিশেষ। সূরা তাহরীমের মধ্যে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসার পরই তিনি তাঁদের ফন্দির ব্যাপারে অবহিত হন।

তৃতীয় উদাহরণ:

কাফের ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূহের প্রকৃতি, গুহাবাসী (أصحاب الكهف) ও জুলকারনাইন বাদশার ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। এ তিন বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ কোনো জ্ঞান না থাকায় তিনি তাদেরকে এ-সবের তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দিতে না পেরে ইন-শাআল্লাহ না বলে পরবর্তী দিনে এর জবাব দেয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দান করেন। তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁকে এ তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব সম্পর্কে অবহিত করবেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেয়ার সময় ইন-শাআল্লাহ না বলার ফলে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে এর জবাবে তাঁর নিকট কোনো অহী আসে নি। পরবর্তীতে পনের দিন পর এ সব প্রশ্নের জবাবে অহী অবতীর্ণ হয় এবং প্রতিশ্রুতি

প্রদানের সময় ইন-শাআল্লাহ না বলার কারণে তাঁকে হালকা ভাষায় কিছুটা ভৎর্সনা করা হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا ‌إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ

যে কাজ তুমি আগামীকাল করবে সে ক্ষেত্রে ইন-শাআল্লাহ না বলে কোনো কথা বলো না।

চতুর্থ উদাহরণ :

মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন আরবের নজদ এলাকায় তাঁর কতিপয় সাহাবীকে দ্বীনের তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু; পথিমধ্যে তাঁরা শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন, তাঁদের মধ্যকার কেবল একজন সাহাবী ব্যতীত বাকী সকলেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যদি এ অকল্পনীয় দুঃখের কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন, তবে তাঁর এতোগুলো সাহাবীকে এ ভাবে প্রেরণ করতেন না।

উপরে যে চারটি উদাহরণ পেশ করা হলো তাতে জ্ঞানীদের জন্যে এ-কথার প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মগতভাবে বা নবুওত লাভের পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দেয়া তাঁর এমন কোনো যোগ্যতা ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর অসাক্ষাতে সংঘটিত বিষয়াদি জানতে সক্ষম হতেন। যদি জানতেন তা হলে উক্ত এ চারটি বিষয়ের বাস্তব অবস্থা তিনি যথা সময়ে অবগত হতে পারতেন। এ ভাবে অহী অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা জানার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হতো না।

কথা এখানেই শেষ নয়, মহান আল্লাহ যে গায়েব বা অদৃশ্যের একক জ্ঞানী, সে-কথা শুধু তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়ে যান নি, বরং তাঁর নবীর মান ও মর্যাদার দিক বিবেচনা করে কেউ যাতে তাঁর ব্যাপারে গায়েব জানার ধারণা করে না বসে, সে জন্য তিনি তাঁর নবীর প্রতি এ নির্দেশও প্রদান করেছেন যে, তিনি যেন গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার বিষয়টি জনসাধারণের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে দেন। সে জন্যে তাঁকে জনগণের মাঝে এ ঘোষণা দিতে বলেন :

229- দরসুল আকিদা

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

আপনি বলুন : কেবল আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণের অধিকার রাখি না। আমি যদি গায়েব জানতাম, তা হলে আমি অনেক কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হতাম, আর আমাকে কোনো অকল্যাণই স্পর্শ করতে পারতো না। আমিতো কেবল একজন সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী মাত্র, সেই সকল মানুষের জন্যে যারা বিশ্বাসী।

এ ঘোষণার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়া আমার কাজ নয়। আমার কাজ হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করা আর জাহান্নাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা। আমি আসলে গায়েব সম্পর্কে যদি কিছু অবগত হতে পারতাম, তা হলে আমার জীবনে শুধু কল্যাণেরই ফল্গুধারা বয়ে যেতো, কখনও আমার কোনো অকল্যাণ হতো না; অথচ আমার জীবন এ-কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমি বহু অকল্যাণের শিকার হয়েছি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমি গায়েব সম্পর্কে আদৌ কোনো জ্ঞান রাখি না। আখেরাত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি গায়েব সম্পর্কিত বিষয়ে আমি যা কিছু বলছি তা আমার নিজ থেকে তৈরী কোনো উদ্ভট কথা নয়, আল্লাহ আমাকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন বলেই আমি তা বলছি।

গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার ফলেই তো তাঁকে জাদু স্পর্শ করেছিল; এ কারণেই তো ত্বায়েফের মুশরিকদের লেলিয়ে দেয়া শিশু ও দাসদের প্রস্তরের আঘাতে তাঁর গোটা শরীর জর্জরিত হয়েছিল; উহুদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত মুবারক পড়ে গিয়েছিল, সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়েছিল ও অসংখ্য সাহাবী আহত হয়েছিল; খয়বরের যুদ্ধের সময় জনৈকা ইয়াহূদী মহিলা কর্তৃক বিষ মাখা খাদ্য খেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে এর ব্যথা অনুভব করতে হয়েছিল। বাস্তবেই তিনি যদি গায়েব সম্পর্কে কিছু জানতেন, তবে তাঁর জীবনে তিনি এ সব বিড়ম্বনার শিকার হতেন না। যদি বলা হয় যে, তিনি এ সব বিপদের কথা জেনেও ত্বায়েফ ও উহুদের ময়দানে গেছেন, তা হলে বলতে হবে যে, বিপদের কথা জেনেও তিনি

নিজেকে ও তাঁর সাথীদেরকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন!! অথচ এ জাতীয় চিন্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কোনোভাবে করা যায় না; কেননা তিনি কোনো ভাবেই নিম্নোক্ত আয়াতের বিপরীত কাজ করতে পারেন না

وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ

তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা এ-আয়াতের নির্দেশের বিপরীত কাজ করতে পারেন না।

ইলমে গায়েব সম্পর্কিত সংশয় নিরসন

কারো অন্তরে এমন সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব সম্পর্কে কেমন করে জ্ঞাত হবেন না, অথচ তিনি আমাদেরকে পার্থিব ও পরকালীন অসংখ্য গায়েব সম্পর্কিত বিষয়ের সংবাদ দান করেছেন? এ জাতীয় সংশয় নিরসনের জবাব রয়েছে কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেন :

عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ‌ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

তিনি গায়েবের জ্ঞানী, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত অপর কারো কাছে তাঁর গায়েবকে প্রকাশ করেন না।''

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলাই হলেন অদৃশ্যের একক জ্ঞানী। তিনি শুধুমাত্র তাঁর মনোনীত রাসূলদেরকে তাঁদের প্রতি অর্পিত রেসালতের দায়িত্ব আদায়ের প্রয়োজনে যতটুকু অদৃশ্য সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করা প্রয়োজনবোধ করেন, ঠিক ততটুকুই তাঁদেরকে অবহিত করেন। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মনোনীত রাসূল ছিলেন বিধায়, তাঁকেও রিসালতের প্রয়োজনে কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়েছিলেন। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় ছিল না যে, যখন ইচ্ছা তিনি তখনই তা জানতে পারতেন এবং জনগণকে তা বলে বেড়াতে পারতেন।

প্রকৃতকথা হলো, রিসালত আদায়ের স্বার্থে এবং জনগণের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রয়োজনে তাঁকে গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু জানানো আল্লাহ তা'আলা জরুরী মনে

করেছিলেন, তাঁকে ঠিক সেটুকুই জানিয়েছিলেন। এর বাইরে গায়েবের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি জানার তাঁর নিজস্ব বা আল্লাহ প্রদত্ত স্থায়ী কোনো যোগ্যতা ছিল না।

সাধারণ জনগণের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসাক্ষাতে সংঘটিত হওয়া কিছু বিষয়াদির সংবাদ দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে এমনি ধরনের দু'টি গায়েবের উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো :

এক. বদর যুদ্ধের পর 'উমায়ের ইবন ওয়াহাব ও সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ এ মর্মে একমত পোষণ করেছিলেন যে, 'উমায়ের তার ছেলেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মদীনায় যেয়ে সুযোগমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করবে, এতে 'উমায়েরের জীবন নাশ হলে সাফওয়ান তার যাবতীয় দেনা শোধ এবং আজীবন তার পরিবারের সদস্যদের ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'উমায়ের মদীনায় গমন করে এবং কোষবদ্ধ তরবারী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাকে তাদের সে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন।

ঘটনার বিবরণে যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কিভাবে তা জানলেন এর কোনো বর্ণনা নেই, তথাপি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মহান আল্লাহই তাঁকে তা জানিয়েছিলেন। ঘটনার সাক্ষী 'উমায়ের এর মুখেও আমরা এ কথারই স্বীকৃতি দেখতে পাই। 'উমায়ের নিজেই তাদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়া দেখে সাথে সাথে বলে উঠে যে, এটি এমন একটি ঘটনা যা আমি এবং সাফওয়ান ব্যতীত অপর কেউ জানে না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমি নিশ্চিত করে বলছি, এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ দেয় নি। এ কথা বলেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

দুই. আত্তাব ইবন উসায়েদ, আবু সুফিয়ান ও হারিছ ইবন হিশাম এ তিন ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিনে কা'বা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে মক্কার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পরস্পর মত বিনিময় করছিল। এ সময় আত্তাব বলেছিল : 'আল্লাহ উসায়েদকে বড় সম্মান দিয়েছেন যে, মক্কার উপর মুহাম্মদ এর বিজয়ী হওয়ার সংবাদ তাকে শ্রবণ

করান নি। বেঁচে থাকলে হয়তো মুহাম্মদ -থেকে এমন কোনো কথা তাকে শুনতে হতো, যা তাকে রাগান্বিত করতো’। আত্তাবের এ কথা শুনার পর এবার হারিছ বললো : ‘আল্লাহর শপথ! আমি কোনো প্রকার মন্তব্য করবো না, কারণ; আমি যদি কোনো কথা বলি তাহলে আমার পক্ষ থেকে এ পাথরকণাও মুহাম্মদকে আমার কথার সংবাদ প্রদান করবে’। তাদের এ কথোপকথনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বা শরীফের ভিতর থেকে বের হয়ে তাদের তিন জনকে লক্ষ্য করে বললেন :

قَدْ عَلِمْتُ الَّذِيْ قُلْتُم

তোমরা পরস্পর যা বলাবলি করেছিলে আমি তা অবগত হতে পেরেছি।” এই বলে তিনি তাদের এ আলোচনার কথা বলে দিলে সাথে সাথেই আত্তাব ও হারিছ এই বলে ইসলাম গ্রহণ করেন:

نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ وَاللهِ مَا اطَّلَعَ عَلٰى هٰذَا أَحَدٌ كَانَ مَعَنَا فَنَقُوْل : أَخْبَرَكَ

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমাদের সাথের কেউই তো এ কথাগুলো শ্রবণ করতে পারে নি, যার ফলে আমরা এ কথা বলতে পারতাম যে, হয়তোবা কেউ আপনাকে এ সবের সংবাদ দিয়েছে।’’

এ দু’টি ঘটনার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের যত ঘটনাই আমাদের সম্মুখে আসবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, এ সব গায়েবী বিষয়াদি তিনি নিজের যোগ্যতা বলে জানতে পারেন নি, মহান আল্লাহ তাঁকে তা জানিয়েছিলেন। পরকালীন গায়েবী বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহই তাঁকে যা অবগত করিয়েছিলেন, তা-ই তিনি বলেছেন, আবার তাও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাঁকে জানান নি। আখেরাতে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থার কথা তিনি আমাদের বলে থাকলেও তাঁর মর্যাদার সঠিক ধরন ও প্রকৃতি কেমন হবে, সে সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিতভাবে কিছুই জানতেন না। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন :

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ

‘‘বলুন : আমি নতুন কোন রাসূল নয়, আমার ও তোমাদের সাথে (আখেরাতে) কেমন আচরণ করা হবে তা আমি (বিস্তারিতভাবে) জানি না, আমিতো কেবল তা-ই অনুসরণ করে থাকি যা আমার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়।’’ উম্মুল ‘আলা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেন

وَاللَّهِ مَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ

‘আল্লাহ শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল হয়েও আমার ও তোমাদের সাথে আখেরাতে কেমন আচরণ করা হবে তা আমি জানি না।’’

উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত গায়েব সম্পর্কে তিনি জনগণকে যা কিছু বলেছেন, তা কোন নতুন কথা নয়, বরং এ জাতীয় কথা অতীতের বহু নবী ও রাসূলগণ বলে গেছেন। তা ছাড়া আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়া তাঁর নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নয়, বরং এ সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন, তা অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েই বলেছেন। আবার আল্লাহ তাঁকে যে বিষয়ে যতটুকু জানিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁর পক্ষে এর বাইরে বিস্তারিত করে আরো কিছু বলারও তাঁর নিজস্ব কোন সূত্র ছিল না।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বত্র (জ্ঞানে ও সাহায্য সহযোগিতায়) হাজির ও নাজির (বা সবকিছু সরাসরি দেখছেন) মনে করা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাজির-নাজির। এটা আল্লাহর সিফাত। এ সিফাত অন্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা সুস্পষ্ট শিরকী আক্বিদা।

কেউ যদি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বত্র (জ্ঞানে ও সাহায্য সহযোগিতায়) হাজির ও নাজির হওয়ার (বা সবকিছু সরাসরি দেখতে পাওয়ার) বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কোথাও মিলাদ অনুষ্ঠান হলে তিনি তা জানতে ও দেখতে পান এবং সেখানে তাঁর রূহ মুবারক সেখানে উপস্থিত হয়, তা হলে সে ব্যক্তিও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে

যদি কেউ মনে করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বত্র আগমন করেন, তবে তার এ বিশ্বাস করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি বলে যে, তাঁর এ ধরণের বিচরণ করার ক্ষমতা রয়েছে, অথবা বলে যে, আল্লাহ তাকে সেখানে যেখানে সেখানে হাজির হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, তবে সেটা হবে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতায় শিরক। এর মাধ্যমে সে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, তাঁকে আল্লাহ কখনও কখনও কোনো কোনো মজলিসে হাজির হওয়ার তাওফীক দেন, তবে সেটা হবে বড় ধরণের মিথ্যাচার ও গর্হিত বিশ্বাস, তথা কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বত্র হাজির থাকার উপর কুরআনে কারীমে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যেমন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।[328]

---

[328] সূরা বাকারা-১৮৬

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।[329]

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ

অতঃপর যখন কারও প্রাণ কন্ঠাগত হয়। এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না।[330]

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।[331]

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন।[332]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[333]

---

[329] সূরা কাফ-১৬

[330] সূরা ওয়াকিয়া-৮৭, ৮৪, ৮৫

[331] সূরা বাক্বারা-১১৫

[332] সূরা হাদীদ-৪

[333] সূরা মুজাদালা-৭

হাদীস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কেউ দরূদ পাঠ করলে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দেওয়া হয় বলে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

যেমন আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُم

"(গৃহে নফল নামায ও কুরআন তেলাওয়াত না করে) তোমাদের গৃহগুলোকে কবরে রূপান্তরিত করো না, (আমার উপর দরূদ পাঠ করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আমার জন্ম বা মৃত্যু অথবা অন্য কোনো দিবসে আমার কবর যিয়ারতে এসে) আমার কবরকে ঈদ বা উৎসবে পরিণত করো না, (তোমরা নিজ অবস্থানে থেকেই) আমার উপর দরূদ পাঠ কর; ***কেননা তোমরা যেখান থেকেই তা পাঠ করে থাক না কেন, তা আমার কাছে পৌঁছে।***"[334]

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু ফেরেশতা রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ান, আমার উম্মতের মধ্যে কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করলে তারা তা আমার নিকট পৌঁছে দেন।''[335]

সেখানে তাঁর ব্যাপারে এমন উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা করার কোনো বৈধতা থাকতে পারে না। কেননা, বাস্তবে তিনি যদি সর্বত্র হাজির ও নাজির হয়েই থাকবেন, তা হলে তাঁর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণকারীর সালাত ও সালাম তাঁর নিকট ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার কোনো অর্থ থাকতে পারে না। কাজেই এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে এ

---

334 সুনানে আবী দাউদ; ২/২১৮

335 সহীহ ইবনে হিব্বান; ৩/১৯৫

জাতীয় ধারণা করার কোন বৈধতা শরী'আতে স্বীকৃত নয়। যারা কারো ব্যাপারে এ জাতীয় শির্কী ধ্যান-ধারণা পোষণ করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ

তারা কেবল অলীক কল্পনারই অনুসরণ করে থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।'[336]'

বস্তুত এ সব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতের মিথ্যা দাবিদারদের তৈরী করা কল্পনা প্রসূত কথা বৈ আর কিছুই নয়।

এরকম আরো অনেক আয়াতে সরাসরি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু বিরাজমানতার অবস্থা কি? এটা আমাদের জানা নেই। এটা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। সুতরাং বুঝা গেল সর্বত্র বিরাজমানতা তথা হাজির থাকাটা এটা আল্লাহর সিফাত। এ সিফাত অন্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা সুস্পষ্ট শিরকী আক্বিদা।

উল্লেখ্য `সর্বত্র সত্তাগত হাজির থাকা, আল্লাহর গুণ নয়। আর তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাও নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হচ্ছে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন, সেখান থেকে তার সকল সৃষ্টিকে দেখছেন ও প্রয়োজনে ঈমানদারদের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। তিনি কখনও তার সৃষ্টির ভিতরে হাজির হন না। সুতরাং সৃষ্টির সর্বত্র আল্লাহর সত্তাগত উপস্থিতির বিশ্বাস পোষণ করা শিরক ও কুফরী। এটি হুলুল তথা অবতারবাদী ও ওয়াহদাতুল ওজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদী হিন্দু আকীদা-বিশ্বাস। মুসলিমদের নয়।

নবী হাজির নাজির হওয়া মুসলমানদের নয় খৃষ্টানদের আক্বিদা

20 For where two or three gather in my name, there am I with them."[337]

---

[336] সূরা আন'আম : ১১৬

[337] Mathew-18/20

শিরকে আসগার

সূচী

- শিরকে আসগারের পরিচয় এবং হুকুম
- শিরকে আকবার এবং শিরকে আসগারের মধ্যে পার্থক্য
- শিরকে আসগারের প্রকার
- কথা সম্পৃক্ত; শিরকে আসগার
- কাজ সম্পৃক্ত; শিরকে আসগার
- শিরকে খফী [গোপন] শিরক

পরিচয়

كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، ونهى عنه الشرع وسماه شركاً

যে সব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয়ে অর্থাৎ আমলের কাঠামো ও মুখের কথায় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, সেইরূপ কথা ও কাজকে শরী'আতের 'নস' অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শিরক বলে নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগার। যেমন- কেউ যদি বলে: (ماشاء الله و شئت)'আল্লাহ আর আপনি যা চান' (ولو الله و أنت) আল্লাহ আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন তা হলে আমার মহা বিপদ হয়ে যেতো' অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।''

হুকুম

ছোট শিরক বলতে এমন কাজ ও কথাকে বুঝানো হয় যা তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দিবেনা বটে, তবে তা কবীরা গুনাহ্ অপেক্ষা আরো জঘন্যতম।

দলীল

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَلاَ تَجْعَلُوْا ِللهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করো না। অথচ তোমরা এ সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছো'[338]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আববাস (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

الْأَنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَقُوْلَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكَ يَا فُلاَنُ! وَحَيَاتِيْ، وَتَقُوْلَ: لَوْلاَ كَلْبَةُ هَذِهِ لَأَتَانَا اللُّصُوْصُ، وَلَوْلاَ الْبَطُّ فِيْ الدَّارِ لَأَتَى اللُّصُوْصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا

[338] বাক্বারাহ্:২২

شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلاَ اللهُ وَفُلاَنٌ، لاَ تَجْعَلْ فِيْهَا فُلاَنًا، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ

''আন্দাদ্'' বলতে শিরককে বুঝানো হচ্ছে যা অন্ধকার রাতে কালো পাথরে পিঁপড়ার চলন চাইতেও সূক্ষ্ম। যা টের পাওয়া খুবই দুরূহ। যেমন: তোমার এ কথা বলা যে, হে অমুক! আল্লাহ্ তা'আলা এবং তোমার ও আমার জীবনের কসম! অথবা এ কথা বলা যে, যদি এ কুকুরটা না হতো তাহলে চোর অবশ্যই আসতো। যদি ঘরে হাঁসগুলো না থাকতো তাহলে অবশ্যই চোর ঢুকতো। অথবা কারোর নিজ সাথীকে এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতো না অথবা কারোর এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং অমুক না থাকলে কাজটা হতো না। অমুক শব্দটি সাথে লাগাবে না। (বরং বলবে: আল্লাহ্ তা'আলা যদি না চাইতেন কাজটা হতো না) কারণ, এ সব কথা শির্কের অন্তর্গত''

ছোট শিরক বড় শিরকের একটি মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ. قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ

'আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হচ্ছে শিরকে আছগার বা ছোট শিরক। তাঁকে শিরকে আছগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, রিয়া বা লৌকিকতা'[339]

---

[339] আহমাদ হা.২৩৬৮০

শিরকে আকবার এবং শিরকে আসগারের মধ্যে পার্থক্য

ছোট শিরক ও বড় শিরকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ:

বড় শিরিক	ছোট শিরিক
বড় শিরক তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়।	ছোট শিরক এমন নয় বটে। তবে তা কবীরা গুনাহ্ অপেক্ষা আরো জঘন্যতম।
একটি শির্কে আকবার মু'মিনের অতীতের যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস করে দেয়।	ছোট শিরক শুধু সে আমলকেই বিনষ্ট করে যে আমলে এ জাতীয় শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে। অন্য সকল আমলকে নয়।
শির্কে আকবার থেকে তাওবা না করলে এবং নতুন করে ইসলামে প্রবেশ না করলে ইসলামী আদালতের রায় অনুযায়ী কর্তাব্যক্তির জীবন ও সম্পদের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না।	শির্কে আসগারের কর্তাব্যক্তি ফাসিক মু'মিন হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে।
শির্কে আকবার থেকে তওবা করতে না পারলে তা কর্তাব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী করে দেয়। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার অযোগ্য হয়ে যায়।	ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়। বরং সে কিছু দিনের জন্য জাহান্নামে গেলেও পরবর্তীতে তাকে জাহান্নাম থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া হবে।
বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবেনা। বরং তার সাথে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। যদিও সে নিকট আত্মীয় হোকনা কেন।	ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়। বরং তার সাথে সম্পর্ক ততটুকুই রাখা যাবে যতটুকু তার ঈমান রয়েছে। তেমনিভাবে তার সাথে ততটুকুই সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে যতটুকু তার মধ্যে শিরক রয়েছে।

শিরকে আসগারের প্রকার

কথা সম্পৃক্ত

❑ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা।

সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনু উমর (রা.) একজন লোককে বলতে শুনলেন, কা'বার শপথ! ইবনু উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা যাবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে যেন কুফরী অথবা শিরক করল'।[340]

---

[340] তিরমিযী হা/১৫৩৫

❑ আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা

জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত ‘কারণ’-কে মহান আল্লাহর পাশাপাশি এমনভাবে উলেখ করা যাতে উভয় ‘কারণ’ সমান গুরুত্বের বলে মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে; তাই তা আপাতদৃস্টিতে শিরিক হচ্ছে না। কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন ‘আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে’, তবে তা শিরক আসগর বলে গণ্য হবে। তবে যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দুটিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শিরক আকবার [বড় শিরিক] বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহর সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যদি বলে ‘আল্লাহ এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না’ তবে তাও উপরের কথার মতই শিরক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে। জাগতিক-লৌকিক কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে বলতে পারেন ‘এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে,’ অথবা ‘আপনি যা চাইবেন তাই হবে’। যেমন বিবাহ শাদি, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যদি বলেন: ‘আল্লাহ ও আপনি যা চান তাই হবে’ তবে তা উপরের কথাগুলির মত শিরক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে, ‘হে আমীর, হে সম্রাট, হে মন্ত্রী মহোদয়, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে’ তবে তা শিরক আকবার বা আসগার। তবে তিনি যদি

বলেন, "হে সম্রাট বা আমীর, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এবং এরপর আপনি যা ইচ্ছা করেন..." তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে না[৩৪১]

দলীল

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ''একজন মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্নে এক ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে ইয়াহূদী লোকটি তাঁকে বললো:'তোমরা অত্যন্ত ভাল জাতি যদি না তোমরা শিরক করতে। তোমরা বলে থাকো- আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি বলেন:''আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের এ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত আছি, তোমরা সে ভাবে কথা না বলে এ ভাবে বলো

مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ

''আল্লাহ তা'আলা যা চান অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান'' এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রারম্ভিক আমলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মাঝে 'আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান', এ-জাতীয় কথা-বার্তা বলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এমন কথা বলা থেকে বারণ করেন এবং এ ধরনের কথার বদলে নিম্নোক্ত কথা বলতে শিক্ষা দেন,

ما شاء الله وحده

''আল্লাহ তা'আলা এককভাবে যা চান''

অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস দ্বারাও সাহাবীদের মাঝে এ জাতীয় কথা বলার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন: 'এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোন বিষয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে বললো:

ما شاء الله وشئت

---

[341] কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আক্বিদা; আ. জাহাঙ্গির রাহি. পৃ 376

'আল্লাহ্ এবং আপনি যা চান'

লোকটির এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده

''তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিলে? বরং একমাত্র আল্লাহ যা চেয়েছেন'

কাজ সম্পৃক্ত; শিরকে আসগার

- ❑ **সুতা বা রিং পরার শিরক বলতে কোন বালা-মুসীবত দূরীকরণ বা প্রতিরোধের জন্য দম করে গেরো দেয়া সুতা বা রিং পরিধান করাকে বুঝানো হয়।**

এটি শিরকে আসগার হিসেবে গণ্য করা হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারকারী এ রূপ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমেই আমার আসন্ন বালা-মুসীবত দূরীভূত করবেন। এটি এককভাবে আমার কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। আর যখন এ বিশ্বাস করা হয় যে, এটি এককভাবেই আমার বিপদাপদ দূরীকরণে সক্ষম তখন তা বড় শির্কে রূপান্তরিত হবে।

কোন বস্তু তা যাই হোকনা কেন তা কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْـمُتَوَكِّلُوْنَ

''আপনি ওদেরকে বলুন: তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? আপনি বলুন: আমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। নির্ভরকারীদের তাঁর উপরেই নির্ভর করতে হবে'[342]

---

[342] যুমার :৩৮

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

''আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারেনা। আর তিনি কিছু নিবারণ করলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা পুনরায় অবারিত করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[343]

আসন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ নিজের শরীরের সাথে কোন জিনিস ঝুলিয়ে রাখলে তা তাকে কোনভাবেই বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনা। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে ওই জিনিসের প্রতি সোপর্দ করে দেন। এতে করে তখন যা হবার তাই হয়ে যায়।

❑ এমন মন্ত্র পড়ে; তাবিজ বা ঝাঁড়-ফুঁক করা; যে মন্ত্রের মধ্যে শিরক রয়েছে

যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার স্বামী 'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্উদ (রা.) একদা আমার গলায় একটি সুতো দেখে বললেন: এটি কি? আমি বললাম: এটি মন্ত্র পড়া সুতো। এ কথা শুনা মাত্রই তিনি তা খুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। অতঃপর বললেন: নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ্'র পরিবার শির্কের কাঙ্গাল নয়। বরং ওরা যে কোন ধরনের শিরক হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি আরো বললেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ، قَالَتْ: قُلْتُ: لِمَ تَقُوْلُ هَذَا؟ وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِيْ تَقْذِفُ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُوْدِيِّ يَرْقِيْنِيْ، فَإِذَا رَقَانِيْ سَكَنَتْ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ؛ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا؛ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكِ أَنْ تَقُوْلِيْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

---

[343] ফাতির: ২

‘‘নিশ্চয়ই ঝাঁড় ফুঁক, তাবিজ কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য বস্তু শিরক। যায়নাব বললেন: আমি বললাম: আপনি এরূপ কেন বলছেন? আল্লাহ্’র কসম! আমার চোখ উঠলে ওমুক ইহুদীর নিকট যেতাম। অতঃপর সে মন্ত্র পড়ে দিলে তা ভালো হয়ে যেতো। তখন ’আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ (রা.) বলেন: এটি শয়তানের কাজ। সেই নিজ হাতে তোমার চোখে খোঁচা মারতো। অতঃপর যখন মন্ত্র পড়ে দেয়া হতো তখন সে তা বন্ধ রাখতো। তোমার এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিলো যা রাসূল (সা.) বলতেন। তিনি বলতেন: হে মানুষের প্রভু! আপনি আমার রোগ নিরাময় করুন। আপনি আমাকে সুস্থ করুন। কারণ, আপনিই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। আপনার নিরাময়ই সত্যিকার নিরাময়। যার পর আর কোন রোগ থাকে না’[344]

উল্লেখ্য- সকল মন্ত্রই শিরক নয়। বরং সেই মন্ত্রই শিরক যাতে শির্কের সংমিশ্রণ রয়েছে। যাতে ফিরিশ্তা, জিন ও নবীদের আশ্রয় বা সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। তাদের নিকট ফরিয়াদ কামনা করা হয়েছে বা তাদেরকে ডাকা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আল্লাহ্ তা’আলার নাযিল করা কিতাব, তাঁর নাম ও বিশেষণ দিয়ে তাবিজ বা ঝাঁড়-ফুঁক করা জায়িয।

’আউফ বিন্ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা জাহিলী যুগে অনেকগুলো মন্ত্র পড়তাম। তাই আমরা রাসূল (সা.) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

اِعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَـمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ

‘‘তোমরা তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার সামনে উপস্থিত করো। কারণ, শির্কের মিশ্রণ না থাকলে যে কোন মন্ত্র পড়তে কোন অসুবিধে নেই’’[345]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْـحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ

---

[344] আবু দাউদ, ৩৮৮৩ ইবনু মাজাহ্, ৩৫৯৬

[345] মুসলিম, ২২০০ আবু দাউদ, ৩৮৮৬

‘‘রাসূল সা. কুদৃষ্টি তথা বদনযর, বিচ্ছু বা সর্পবিষ ইত্যাদি এবং পিপড়ার মন্ত্র পড়ার অনুমতি দেন’’[346]

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সা. মন্ত্র পড়া নিষেধ করে দিলে ’আমর বিন্ ’হাযেমর গোত্ররা তাঁর নিকট এসে বললো: হে আল্লাহ্’র রাসূল! আমরা একটি মন্ত্র পড়ে বিচ্ছুর বিষ নামাতাম। অথচ আপনি মন্ত্র পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন। অতঃপর তারা রাসূল (সা.) কে মন্ত্রটি শুনালে তিনি বললেন:

مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

‘‘এতে কোন অসুবিধে নেই। তোমাদের কেউ নিজ ভাইয়ের উপকার করতে পারলে সে তা অবশ্যই করবে’’[347]

শুধু কোন মন্ত্রের ফায়দা প্রমাণিত হলেই তা পড়া জায়িয হয়ে যায়না। বরং তা শরীয়তের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হয়। দেখে নিতে হয় তাতে শির্কের কোন মিশ্রণ আছে কি না?

ইবনুত্ তীন (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন:

إِنَّ الْحَيَّةَ لِعَدَاوَتِهَا الْإِنْسَانَ بِالطَّبْعِ تُصَادِقُ الشَّيَاطِيْنَ لِكَوْنِهِمْ أَعْدَاءَ بَنِيْ آدَمَ، فَإِذَا عُزِمَ عَلَى الْحَيَّةِ بِأَسْمَاءِ الشَّيَاطِيْنِ أَجَابَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا، وَكَذَا اللَّدِيْغُ إِذَا رُقِيَ بِتِلْكَ الْأَسْمَاءِ سَالَتْ سُمُوْمُهَا مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ

‘‘সাপ স্বভাবগতভাবে মানুষের শত্রু হওয়ার দরুন তার সাথে মানুষের আরেকটি শত্রু শয়তানের ভালো সখিত্ব রয়েছে। এতদ্দকারণেই সাপের উপর শয়তানের নাম পড়ে দম করা হলে সে তা মান্য করে নিজ স্থান ত্যাগ করে। তেমনিভাবে সাপের ছোবলে আক্রান্ত ব্যক্তিকেও শয়তানের নামে ঝাঁড় ফুঁক করা হলে মানুষের শরীর হতে বিষ নেমে যায়’’

মোটকথা, চার শর্তে, ঝাঁড়-ফুঁক করা জায়িয। যা নিম্নরূপ:

১. তা আল্লাহ্ তা’আলার নাম বা গুণাবলীর মাধ্যমে হতে হবে।

২. নিজস্ব ভাষায় হতে হবে। যাতে করে তা সহজেই বোধগম্য হয় এবং তাতে শির্কের মিশ্রণ আছে কিনা তা বুঝা যায়।

---

[346] মুসলিম, ২১৯৬

[347] মুসলিম, ২১৯৯

৩. যাদুমন্ত্র ব্যতিরেকে এবং শরীয়ত সমর্থিত জায়িয পন্থায় হতে হবে। কারণ, যে কোন উদ্দেশ্যে যাদুর ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফরীর শামিল।
৪. এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছে ছাড়া মন্ত্র (তা যাই হোক না কেন) কোন কাজই করতে পারবেনা। আর এর বিপরীত বিশ্বাস হলে তা বড় শির্কে রূপান্তরিত হবে।

❑ গণক-জ্যোতিষী বা ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস করা

গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা দু'টি কারণেই শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দু'টি নিম্নরূপ:
১. এগুলো করতে গেলে জিনদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য তাদের নামে মানত বা কোরবানি দিতে হয় কিংবা যে কোন ভাবে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়। যা শির্কের অন্তর্গত।
২. গণকরা ইলমুল গায়েবের দাবি করে থাকে।

গণকের নিকট যাওয়াই শরীয়ত বিরোধী তথা হারাম কাজ। বরং কুফরিও বটে। আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ''সাহাবায়ে কিরাম নবী (সা.) কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِشَيْءٍ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّيْءِ يَكُوْنُ حَقًّا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيُقَرْقِرُهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةٍ

তারা কিছুই নয়। তখন সাহাবারা বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! তারা কখনো কখনো সত্য কথা বলে থাকে। তখন তিনি বললেন: সে সত্য কথাটি ঐশী বাণী। জিনরা ফিরিশ্তাদের মুখ থেকে তা ছোঁ মেরে নিয়ে মুরগির করকর ধ্বনির ন্যায় তাদের ভক্তদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। অতঃপর তারা এর সাথে আরো শত শত মিথ্যা কথা জুড়িয়ে দেয়।[348]

[348] বুখারী, ৫৭৬২ মুসলিম, ২২২৮

মু'আবিয়া বিন্ 'হাকাম (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلاَمِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ، قَالَ: فَلاَ تَأْتِهِمْ

''আমি বললাম: হে আল্লাহ্'র রাসূল! বেশি দিন হয়নি আমি বরবর ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুসলমান হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আর এ দিকে আমাদের অনেকেই গণকদের নিকট আসা যাওয়া করে। তাদের নিকট যেতে কোন অসুবিধে আছে কি? তখন রাসূল (সা.) বললেন: তাদের নিকট কখনো যেও না।[349]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসঊদ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

''যে ব্যক্তি কোন গণক বা যাদুকরের নিকট গেলো এবং তার কথা বিশ্বাস করলো তখনই সে মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ বিধান তথা কুর'আন মাজীদকে অস্বীকার করলো অর্থাৎ কাফির হয়ে গেলো।''[350]

গণককে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে জিজ্ঞাসাকারীর চল্লিশ দিনের নামায বিনষ্ট হয়ে যায়। হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

''যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গেলো এবং তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলো তাতে করে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবেনা'[351]

❑ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শনে বা উহার বিশেষ আচরণে কোন-অমঙ্গল রয়েছে বলে বিশ্বাস করা বা যাত্রা লগ্নে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর বিশ্রী রূপদর্শন অথবা এ গুলোর কোনরূপ আচরণ এমনকি

---

349 মুসলিম, ৫৩৭ আবু দাউদ, ৯৩০

350 ত্বাবরানী ১০/১০০০৫

351 মুসলিম ২২৩০

কোন শব্দ বা ধ্বনির শ্রবণ অথবা কোন জায়গায় অবতরণ কারোর জন্য কোন অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে বিশ্বাস করা; শিরকে আসগার অন্তর্ভূক্ত।

কেননা সকল মঙ্গল অমঙ্গল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর বিশ্রী রূপদর্শন বা আচরণে এমন কোন অকল্যাণ নিহিত নেই যার অমূলক আশঙ্কা করা যেতে পারে। বরং সকল কল্যাণকে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ এবং পুণ্যের ফল হিসেবে স্বীকার করতে হবে। আর সকল অকল্যাণকে আল্লাহ্ তা'আলার ইনসাফ ও নিজ গুনাহ্'র শাস্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে।

দলীল

ক. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوْا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُوْلَ:
اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

''যাকে কুলক্ষণবোধ নিজ প্রয়োজন মেটানো থেকে বিরত রেখেছে বস্তুত সে শিরক করলো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন: এর কাফফারা কি হতে পারে? রাসূল (সা.) বললেন: তখন সে বলবে: হে আল্লাহ্! আপনার কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই। তেমনিভাবে আপনার অকল্যাণ ছাড়া আর কোন অকল্যাণ নেই এবং আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই''[352]

খ. আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ـ ثَلاَثًا ـ وَمَا مِنَّا إِلاَّ ... وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

''কুলক্ষণবোধ নিরেট শিরক। নবী (সা.) এ কথাটি তিন বার বলেছেন। আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ (রা.) বলেন: আমাদের প্রত্যেকেই কিছুনা কিছু এ ব্যাধিতে ভোগে

[352] আহমাদ : ২/২২০

থাকেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর সত্যিকারের তাওয়াক্কুল থাকলে তা অতিসত্বর দূর হয়ে যায়''[353]

গ. আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُوْلَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُوْنُ فِيْ الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيْءُ الْبَعِيْرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيْهَا، فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا، قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟

''ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। হুতোম পেঁচা, সফর মাস, রাশি-নক্ষত্র অথবা পথ ভুলানো ভূত কারোর কোন ক্ষতি করতে পারে না। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহ্'র রাসূল! কখনো এমন হয় যে, মরুভূমির মধ্যে শায়িত কিছু উট। দেখতে যেমন হরিণ। অতঃপর দেখা যাচ্ছে, চর্ম রোগী একটি উট এসে এগুলোর সাথে মিশে গেলো। তাতে করে সবগুলো উট চর্ম রোগী হয়ে গেলো। তখন রাসূল (সা.) বললেন: বলো তো: প্রথমটির চর্ম রোগ কোথা থেকে এসেছে?[354]

এ জাতীয় কুলক্ষণবোধ ব্যাধি আজকের নতুন নয়। বরং তা অনেক পুরাতন যুগেরই বটে। তখন মানুষ নবী ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অলক্ষুনে ভাবতো।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন:

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هَذِهِ، وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ، أَلاَ إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ

''যখন তাদের কোন সুখ-শান্তি বা কল্যাণ সাধিত হতো তখন তারা বলতো: এটি আমাদেরই প্রাপ্য। আর যখন তাদের কোন দুঃখ-দুর্দশা বা বিপদ-আপদ ঘটতো তখন তারা বলতো: এটি মূসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কারণেই ঘটেছে। তাদের জানা উচিত যে, তাদের সকল অকল্যাণও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ কথা জানে না''[355]

---

[353] বুখারী/আদাবুল্ মুফরাদ্, ৯০৯

[354] বুখারী, ৫৭০৭, মুসলিম, ২২২০

[355] আ'রাফ্ : ১৩১

আল্লাহ্ তা'আলা সা'লিহ্ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন:

قَالُوْا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ، قَالَ طَآئِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ

''তারা বললো: আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকেই সকল অকল্যাণের মূল মনে করছি। সা'লিহ্ (আ.) বললেন: তোমাদের সকল কল্যাণাকল্যাণ আল্লাহ্'র হাতে। মূলতঃ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে''[356]

উল্লেখ্য- কোন উত্তম ব্যক্তি বা বস্তু দেখে অথবা কোন ভালো কথা শুনে যে কোন কল্যাণের আশা করা বা সুলক্ষণ ভাবা শরীয়ত বিরোধী নয়। কারণ, এতে করে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভালো ধারণা জন্মে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলতা আরো বেড়ে যায়। এমনকি সে কল্যাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনার উদগ্র মানসিকতা তৈরি হয়। এ কারণেই রাসূল (সা.) কোন ভালো কথা বা শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করতেন এবং তা তাঁর পছন্দনীয় অভ্যাসও ছিলো বটে।

আনাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِيَ الْفَأْلُ، قَالُوْا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

'ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমূলক। তবে সুলক্ষণই আমার নিকট পছন্দনীয়। সাহাবাগণ বললেন: সুলক্ষণ বলতে কি বুঝানো হচ্ছে? তিনি বললেন: ভালো কোন শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করা'[357]

তাবাররুক জ সংক্রান্ত

- **শরীয়ত কর্তৃক অসমর্থিত কোন ব্যক্তি, বস্তু বা সময়-স্থানকে অবলম্বন করে ধর্ম বা বিষয়গত কোন প্রয়োজন নিবারণ অথবা অধিক কল্যাণ ও পুণ্যের আশা করাও শিরকে আসগার।**

সহজ ভাষায় বলতে হয়, কোর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মধ্যে বরকত রাখেননি সেগুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়।

---

[356] নামল: ৪৭

[357] বুখারী, হাদীস ৫৭৫৬, মুসলিম, ২২২৪

তাবাররুকের প্রকারভেদ

তাবাররুক বা বরকত কামনা সর্ব সাকুল্যে দু’ ধরনের হয়ে থাকে। যা নিম্নরূপ:

শরিয়ত সমর্থিত বৈধ তাবাররুক

বৈধ তাবাররুক বলতে যে ধরনের ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইসলামী শরীয়তে জায়িয সে গুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়।

১. নবী সত্তা বা তাঁর নিদর্শনসমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ:

এ জাতীয় তাবারুক শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত। কারণ, আল্লাহ্ তা’আলা নবী সত্তা ও তদীয় নিদর্শনসমূহে এমন বিশেষ বরকত রেখেছেন যা অন্য কারোর সত্তা বা নিদর্শনসমূহে রাখেননি।

’আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِيْ

‘‘আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর নিজ পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি তার উপর সূরা ফালাক্ব, নাস্ ইত্যাদি পড়ে দম করতেন। অতঃপর তিনি যখন শেষ বারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন যাতে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায় তখন আমিই তাঁর উপর সূরা ফালাক্ব, নাস্ ইত্যাদি পড়ে দম করতাম এবং তাঁর নিজ হাত দিয়েই আমি তাঁর শরীর বুলিয়ে দিতাম। কারণ, তাঁর হাত আমার হাতের চাইতে অধিক বরকতময়’’[358]

আনাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيْهِ، فَرُبَّمَا جَاؤُوْهُ فِيْ الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيْهِ

’’রাসূল (সা.) ফজরের নামায শেষ করলেই মদীনার গোলাম ও খাদিমরা পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হতো। যে কোন পাত্রই তাঁর নিকট উপস্থিত

---

[358] বুখারী, হাদীস ৪৪৩৯, মুসলিম, ২১৯২

করা হতো তাতেই তিনি নিজ হস্ত মুবারাক ঢুকিয়ে দিতেন। এমনকি অনেক সময় শীতের ভোর সকালে তাঁর নিকট পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে আসা হতো। অতঃপর তিনি তাতেও নিজ হস্ত মুবারাক ঢুকিয়ে দিতেন''[359]

আনাস্ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِيْ يَدِ رَجُلٍ

''আমি রাসূল (সা.) কে দেখতাম, নাপিত তাঁর মাথা মুন্ডাচ্ছে। আর এ দিকে সাহাবারা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। কোন একটি চুল পড়লেই তা পড়তো যে কোন এক ব্যক্তির হাতে। তারা তা কখনোই মাটিতে পড়তে দিতোনা''[360]

মিস্ওয়ার্ বিন্ মাখ্রামা ও মার্ওয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَيْنَيْهِ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِيْ كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ

''অতঃপর 'উর্ওয়া নবী কারীম (সা.) এর সাহাবাদেরকে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করছিলো। সে আশ্চর্য হয়ে বললো: আল্লাহ্ তা'আলার কসম! রাসূল (সা.) কখনো এতটুকু কফ ফেলেননি যা তাদের কোন এক জনের হাতে না পড়ে মাটিতে পড়েছে। অতঃপর সে তা দিয়ে নিজ মুখমন্ডল ও শরীর মলে নেয়নি। নবী (সা.) তাদেরকে কোন কাজের আদেশ করতেই তারা তা করার জন্য দৌড়ে যেতো। আর তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি সংগ্রহের জন্য তারা উঠে পড়ে লাগতো''[361]

উক্ত হাদীস এবং এ সংক্রান্ত আরো অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস এটিই প্রমাণ করে যে, রাসূল সত্তা এবং তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম, কফ, থুতু ইত্যাদি এবং তাঁর চুল ও

---

359 মুসলিম, ২৩২৪

360 মুসলিম, ২৩২৫

361 বুখারী, ২৭৩১

ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে এমন কিছু বরকত রেখেছেন যা তিনি অন্য কোথাও রাখেননি।

তবে দুনিয়ার কোথাও এ জাতীয় কোন কিছু পাওয়া গেলে সর্ব প্রথম সঠিক বর্ণনাসূত্রে আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা একমাত্র রাসূল (সা.) এর। অন্য কারোর নয়। কারণ, এ জাতীয় কোন কিছু কারোর সংগ্রহে থেকে থাকলে একান্ত বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে সে মৃত্যুর সময় তার কবরে তার সঙ্গে তা দাফন করার জন্য অবশ্যই অসিয়ত করে যাবে। বোকামি করে সে তা কখনো কারোর জন্য রেখে যাবেনা। তবে ঘটনাক্রমে তা থেকেও যেতে পারে। এ জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

২. আল্লাহ্'র যিকির ও নেককারদের সাথে বসে বরকত হাসিল করা

এটিও বহু বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِيْ الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ؟ قَالَ: تَقُوْلُ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَتَحْمِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ: فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

''নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার এমন অনেকগুলো ফিরিশ্তা রয়েছেন যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ান এবং যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তারা কোন জন সমষ্টিকে

যিকির করতে দেখেন তখন তারা পরস্পরকে এ বলে ডাকতে থাকেন যে, আসো! তোমাদের কাজ মিলে গেলো। অতঃপর তারা নিজ পাখাগুলো দিয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এরপর আল্লাহ্ তা’আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি এ ব্যাপারে তাদের চাইতেও বেশি জানেন, আমার বান্দাহ্রা কি বলে? ফিরিশতারা বলেন: তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশ্তারা বলেন: না, আল্লাহ্’র কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: তারা আমাকে দেখতে পেলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেন: তারা আপনাকে দেখতে পেলে আরো বেশি ইবাদাত করতো। আরো অধিক আপনার সম্মান, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: তারা আমার কাছে কি চায়? ফিরিশতারা বলেন: তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফিরিশ্তারা বলেন: না, আল্লাহ্’র কসম! হে প্রভু! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: তারা জান্নাত দেখলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেন: তারা জান্নাত দেখতে পেলে জান্নাতের প্রতি তাদের উৎসাহ ও লোভ আরো বেড়ে যেতো। আরো মরিয়া হয়ে জান্নাত কামনা করতো। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: তারা কি বস্তু থেকে আমার আশ্রয় কামনা করে? ফিরিশতারা বলেন: জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফিরিশ্তারা বলেন: না, আল্লাহ্’র কসম! হে প্রভু! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: তারা জাহান্নাম দেখলে কি করতো? ফিরিশতারা বলেন: তারা জাহান্নাম দেখতে পেলে জাহান্নামকে আরো বেশি ভয় পেতো এবং জাহান্নাম থেকে আরো বেশি পলায়নপর হতো। আল্লাহ্ তা’আলা বলেন: আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি: আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। জনৈক ফিরিশতা বলেন: তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের অন্তর্ভূত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ্

তা'আলা বলেন: তারা আমার উদ্দেশ্যেই বসেছে। সুতরাং তাদের সাথে যে বসেছে সেও আমার রহমত হতে বঞ্চিত হতে পারে না''[362]

উক্ত হাদীসে যিকিরের মজলিশ বিশেষ বরকত ও মাগফিরাতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি ইহার বরকত এমন ব্যক্তির ভাগ্যেও জুটবে যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের সাথে বসেছে।

৩. যে কোন মসজিদে নামায ও ইবাদাতের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ:

যে কোন মসজিদে বিশেষভাবে তিনটি মসজিদে নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের মাধ্যমে বরকত কামনা করা শরীয়ত সম্মত। সে তিনটি মসজিদ হলো: মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে 'আকসা।

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন:

صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

''আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম। তবে শুধু মসজিদে হারাম। তাতে নামায পড়ার সাওয়াব আরো অনেক বেশি''[363]

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ

''আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম। তবে শুধু মসজিদে হারাম। কারণ, তাতে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে লক্ষ ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম''[364]

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

صَلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيْهِ يَعْنِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَلَنِعْمَ الْمُصَلِّيْ هُوَ، وَلَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَكُوْنَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

---

362 বুখারী, ৬৪০৮ মুসলিম, ২৬৮৯

363 বুখারী, ১১৯০ মুসলিম, ১৩৯৪

364 ইবনে মাজাহ্, ১৪২৭ আহমাদ: ৩/৩৪৩

‘‘আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া বাইতুল মাক্বদিসে চার ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম। ভাগ্যবান সে মুসল্লী যে বাইতুল মাক্বদিসে নামায পড়েছে। অতি সন্নিকটে সে দিন যে দিন কারোর নিকট তার ঘোড়ার রশি পরিমাণ জায়গা থাকাও অধিক পছন্দনীয় হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে। যে জায়গা থেকে সে বাইতুল মাক্বদিস দেখতে পাবে’’[365]

তবে এ সকল মসজিদে নামায বা যে কোন ইবাদাতে বরকত রয়েছে বলে এ মসজিদগুলোর দেয়াল, পিলার, দরোজা, চৌকাঠ ইত্যাদিতে এমন কোন বরকত নেই যা সেগুলো স্পর্শ করার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। কারণ, এ ব্যাপারে শরীয়তের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

8. শরীয়ত স্বীকৃত খাদ্য, পানীয় বা ওষুধ কর্তৃক বরকত গ্রহণ:

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে যে খাদ্য, পানীয় বা ওষুধে বরকত রয়েছে যা কোর’আন বা হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত তা নিম্নরূপ:

ক. যাইতুনের তেল কর্তৃক বরকত গ্রহণ:

এ তেল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَّلاَ غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

‘‘যা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তেল দিয়ে যা প্রাচ্যেরও নয়, প্রতিচ্যেরও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও সে তেল যেন উজ্জ্বল আলো দেয়’’[366]

‘উমর, আবু উসাইদ্ ও আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

‘‘তোমরা যাইতুনের তেল খাও এবং শরীরে মালিশ করো। কারণ, তা বরকতময় গাছ থেকে সংগৃহীত’[367]

---

[365] হাকিম: ৪/৫০৯ ইবনে আসাকির্ : ১/১৬৩-১৬৪ ত্বাহাবী/মুশকিলুল্ আসার্: ১/২৪৮

[366] নূর:৩৫

[367] তিরমিযী, ১৮৫১, ইবনে মাজাহ্, ৩৩৮২

খ. দুধ পান ও তাতে বরকত কামনা করা:

আব্দুল্লাহ্ বিন ’আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْهِ، وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِّنْهُ ؛ وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيْهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ ؛ فَإِنِّيْ لاَ أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنَ

‘‘আল্লাহ্ তা’আলা যাকে কোন খাদ্য গ্রহণের সুযোগ দেন সে অবশ্যই বলবে: হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং আমাদেরকে এর চাইতেও আরো ভালো রিযিক দিন। আর যাকে আল্লাহ্ তা’আলা দুধ পানের সুযোগ দেন সে অবশ্যই বলবে: হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং আমাদেরকে তা আরো বাড়িয়ে দিন। কারণ, আমি দুধ ছাড়া এমন অন্য কোন বস্তু দেখছিনা যা একইসঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ের কাজ করে’’[368]

গ. মধু পান ও তা কর্তৃক উপশম কামনা করা:

আল্লাহ্ তা’আলা বলেন:

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ

‘‘ওর (মৌমাছি) উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় (মধু); যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগমুক্তি’’[369]

আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ، اسْقِهِ عَسَلاً، فَسَقَاهُ فَبَرَأَ

‘‘জনৈক ব্যক্তি নবী (সা.) কে বললেন: আমার ভাইয়ের পেটের রোগ (কলেরা) দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে আবারো এসে আপত্তি

---

[368] ইবনু মাজাহ্, ৩৩৮৫

[369] নাহল:৬৯

জানালো। রাসূল (সা.) আবারো বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে আবারো এসে আপত্তি জানালে নবী (সা.) আবারো বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে আবারো এসে বললো: আমি মধু পান করিয়েছি। কিন্তু কোন ফায়েদা হয়নি। তখন রাসূল (সা.) বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিই বলেছেন: মধুর মধ্যে রোগের উপশম রয়েছে। তবে তোমার ভাইয়ের পেঠ মিথ্যা বলছে। তাকে আবারো মধু পান করাও। অতঃপর সে আবারো মধু পান করালে তার ভাইয়ের পেটের রোগ ভালো হয়ে যায়''[370]

ঘ. যমযমের পানি কর্তৃক বরকত গ্রহণ:

এর মধ্যেও প্রচুর বরকত রয়েছে। আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাসূল (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মক্কা নগরীতে এ ত্রিশ দিন পর্যন্ত তোমাকে কে খাইয়েছে? তখন আমি বললাম:

مَا كَانَ لِيْ طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِيْ، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِيْ سُخْفَةَ جُوْعٍ، قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ

''এতোদিন যমযমের পানি ছাড়া কোন খাদ্য আমার নিকট ছিলনা। তবুও আমি মোটা হয়ে গিয়েছি। এমনকি আমার পেটে ভাঁজ পড়ে গেছে এবং আমি খিদের কোন দুর্বলতা অনুভব করছিনে। রাসূল (সা.) বললেন: নিশ্চয়ই যমযমের পানি বরকতময়। নিশ্চয়ই তা খাদ্য বৈ কি?''[371]

---

[370] বুখারী, ৫৬৮৪ মুসলিম, ২২১৭

[371] মুসলিম, ২৪৭৩

অবৈধ বা [ছোট] শিরক/বিদআত জাতীয় তাবাররুক

অবৈধ বা শিরক জাতীয় তাবার্রুক বলতে যে ধরনের ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মাধ্যমে বরকত কামনা করা ইসলামী শরীয়তে নাজায়িয সে গুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়।

১. বরকতের নিয়্যাতে কোন ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ বা কোন বস্তু স্পর্শ করণ:

যেমন: বরকতের নিয়্যাতে আরক্বাম্ বিন্ আরক্বাম্ সাহাবীর ঘর, হেরা ও সাউর গিরিগুহা যিয়ারাত এবং কোন কোন মসজিদ বা মাযারের দেয়াল, জানালা, চৌকাঠ বা দরোজা স্পর্শ বা চুমু দেয়া ইত্যাদি। এ সব বিদ্'আত, শিরক ও না জায়িয কাজ। কারণ, বরকত গ্রহণ একটি ইবাদাত যা অবশ্যই শরীয়ত সম্মত হতে হবে। যদি এগুলোতে কোন বরকত থাকতো তা হলে অবশ্যই রাসূল (সা.) তা নিজ উম্মাতকে জানিয়ে দিতেন এবং সাহাবায়ে কিরামও অবশ্যই এ গুলোতে বরকত কামনা করতেন। কারণ, তাঁরা কোন পুণ্যময় কর্মে আমাদের চাইতে কোনভাবেই পিছিয়ে ছিলেন না। যখন তাঁরা এতে কোন বরকত দেখেননি তাহলে কি করে আমরা সেগুলোতে বরকত কামনা করতে যাবো। তা একেবারেই যুক্তি বহির্ভূত।

রাসূল (সা.) কোন বস্তু কর্তৃক বরকত হাসিলকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করেছেন। আবু ওয়াক্বিদ্ লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لَـمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ ـ يُقَالُ لَـهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ ـ يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَـهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَى: اِجْعَلْ لَنَا إِلَـهًا كَمَا لَـهُمْ آلِهَةٌ! وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

''রাসূল (সা.) যখন 'হুনাইন্ অভিমুখে রওয়ানা করলেন তখন পথিমধ্যে তিনি মুশরিকদের ''যাতু আন্ওয়াত'' নামক একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যার উপর তারা যুদ্ধের অস্ত্রসমূহ বরকতের আশায় টাঙ্গিয়ে রাখতো। তখন সাহাবারা বললেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি আমাদের জন্যও একটি গাছ ঠিক করে দিন

যেমনিভাবে মুশরিকদের জন্য একটি গাছ রয়েছে। নবী (সা.) বললেন: আশ্চর্য! তোমরা সে দাবিই করছো যা মূসা (আ.) এর সম্প্রদায় তাঁর নিকট করেছিলো। তারা বলেছিলো: হে মূসা! আপনি আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বা মা'বূদ ঠিক করে দিন যেমনিভাবে অন্যদের অনেকগুলো মূর্তি বা মা'বূদ রয়েছে। (আ'রাফ: ১৩৮) রাসূল (সা.) বললেন: ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসারী হবে।[372]

২. শরীয়ত অসম্মত কোন সময় কর্তৃক বরকত কামনা করণ:

যেমন: নবী (সা.) এর জন্ম দিন, মি'রাজের রাত্রি এবং হিজরত, বদর যুদ্ধ ইত্যাদির দিনকে বরকতময় মনে করা। যদি এ সময় গুলোতে কোন বরকত থাকতো তা হলে রাসূল (সা.) অবশ্যই তা নিজ উম্মাতকে শিখিয়ে যেতেন এবং সাহাবায়ে কিরামও তা অবশ্যই পালন করতেন। যখন তাঁরা তা করেননি তা হলে বুঝা গেলো এতে কোন বরকত নেই। বরং তা কর্তৃক বরকত গ্রহণ বিদ্'আত।

৩. কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা তদীয় নিদর্শনসমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ:

মানুষের মধ্যে সত্ত্বাগতভাবে শুধুমাত্র রাসূল (সা.) এবং তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম, কফ, থুতু ইত্যাদি এবং তাঁর চুল ও ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন ইত্যাদিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে এমন কিছু বরকত রেখেছেন যা তিনি অন্য কোথাও রাখেননি।

---

[372] তিরমিযী, ২১৮০

শিরকে খফী [গোপন] শিরক

শিরকে খফী এমন একটি সূক্ষ্ম শিরক যা নিয়ত, সংকল্প ও উদ্দেশ্যের সাথে হয়ে থাকে।

- মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে (الرياء و السمعة) বা নিয়তে এবং মানুষের প্রশংসা শোনানোর জন্য নেক আমল করা।

‘আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. قَالَ قُلْنَا بَلَى. فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ; তিনি বললেন, তা হচ্ছে শিরকে খফী বা গুপ্ত শিরক [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এজন্যই তার ছালাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার ছালাত দেখছে বলে সে মনে করে’।[373]

রিয়া দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকেও মারাত্মক। তার কারণ দাজ্জালের ফিৎনার বিষয়টি সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু রিয়া মানুষের মনকে অব্যক্ত করে যা সংরক্ষণ অতীব কঠিন। আর তা মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহ তা‘আলার পরিবর্তে মানুষের দিকে ধাবিত করে। ফলে নবী করীম (সা.) এটাকে দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকে বেশী ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[373] আহমাদ হা. ১১২৭০

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

خَتم النُّبُوَّة
খতমে নুবুয়্যাত

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন-

وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى

> ''নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নবী এবং সন্তোষপ্রাপ্ত রাসূল।''

وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ، وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

> ''তিনি নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী, মুত্তাক্বীদের ইমাম, রাসূলগণের নেতা এবং সৃষ্টিকুলের রবের হাবীব (বন্ধু)''

وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوًى.

> ''আর তাঁর পরবর্তী যুগে নবুওয়াতের যে সব দাবী উত্থাপিত হয়েছে, তার সবগুলোই ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ''

وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ، وَكَافَّةِ الْوَرَى، بِالْحَقِّ وَالْهُدَى، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ.

> ''তিনি সত্য, হিদায়াত, নূর ও জ্যোতিসহকারে সকল জিন ও সমস্ত মাখলুকের প্রতি প্রেরিত।''

দরসুল আকিদা

নবী মুহাম্মাদ সা. ও অন্যান্য নবীগণের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্যান্য সকল নবী	আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা.
স্থান	নির্দিষ্ট স্থানের জন্য প্রেরিত	পুরো পৃথিবীর জন্য প্রেরিত
সময়	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরিত	কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যযন্ত নবুওয়্যাত বাকী থাকবে

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

القران كلام الله - ليس بمخلوق
আল-কুরআন আল্লাহর কালাম বা কথা; মাখলুক [সৃষ্ট] নয়

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন-

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ، وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾، عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ.

''নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর কালাম, যা আল্লাহর নিকট থেকে কথা হিসেবে শুরু হয়ে এসেছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না; এই কালামকে তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অহী হিসাবে নাযিল করেছেন আর ঈমানদারগণ তাঁকে এ ব্যাপারে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন যে, এটি সত্যিই আল্লাহর কথা বা কালাম, কোনো সৃষ্টির কথার মত সৃষ্টবস্তু নয়। অতএব, যে ব্যক্তি কুরআন শুনে তাকে মানুষের কালাম (কথা) বলে ধারণা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। (যে কুরআনকে মানুষের কথা বলবে) আল্লাহ তা'আলা তার নিন্দা করেছেন, তাকে দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন,

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

''শীঘ্রই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।''[374]আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের এ ভীতি তো তাকে প্রদর্শন করিয়েছেন যে বলে,

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ

---

[374] সূরা মুদ্দাস্‌সির,২৬

এটাতো মানুষের কথা বৈ আর কিছুই নয়’’[375] অতএব, আমরা জেনে নিলাম ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম যে, এ কুরআন মানুষের সৃষ্টিকর্তারই কালাম আর তা কোনো মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে না।’’

দরসুল আকিদা

সূ চী প ত্র

- আল-কোরআনের পরিচয়
- আল-কোরআনের বৈশিষ্ঠ্য

[375] সূরা মুদ্দাস্‌সির,২৫

আল-কোরআনের পরিচয়

শাব্দিক

কোরআনের শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে

১. ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলেমের মতে-'কুরআন' হল নির্ধারিত নাম। এটা এসমে মুশতাক বা অনির্ধারিত নাম নয়। তাঁরা বলেন এটা কালামুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন ইঞ্জিল, তাওরাত, যবুর বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরুপ সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থের নাম হল কুরআন; আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-"বরং এটা মহান কোরআন লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।"[376]

২. আরেক দল আলেম বলেন, 'কুরআন' শব্দটি অনির্দিষ্ট নাম। যার অর্থ মিলিত অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত তাই এটাকে 'কুরআন' বলা হয়।

৩. কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, 'কুরআন' শব্দটি 'ক্বারউন' হতে নির্গত। এসমে মাফউল থেকে এর অর্থ হবে পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

৪. অনেকে বলেছেন, 'কুরআন' শব্দটির অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদানুযায়ী আমলকারীকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়। তাই কুরআনকে 'কুরআন' নামকরন করা হয়েছে।

আল-কুরআনের পারিভাষিক পরিচয়

১. নুরুল আনোয়ার গ্রন্থকার বলেন, কুরআন হল রাসুল সা. এর উপর অবতারিত যা সহীফাসমুহে লিপিবদ্ধ আছে, যা রাসুল সা. থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত হয়ে এসেছে।

২. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে-কুরআন হল মহান আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির হেদায়াতের

---

[376] বুরুজ ২১-২২

জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নাম 'আল কোরআন'[377]

৩. আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান রহ. বলেন- কুরআন হল এমন এক আসমানী কিতাব যা আমাদের মহান নেতা মুহাম্মদ সা. এর উপর অবতীর্ণ, যার একটি সূরার মোকাবিলায় মানুষ অক্ষম

বৈশিষ্ট্য

অলৌকিকত্ব- চ্যালেঞ্জ

কুরআনের দাবি সে আল্লাহরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং এতে কোনও সন্দেহ নেই। কুরআন তাঁর এ দাবির সত্যতা নানাভাবে প্রমাণ করেছে। কুরআন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে,

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

---

377 আল মুজামুল ওয়াসিত ও মায়ারিফুল কোরআন, বাংলা, মাওলানা মুহীউদ্দীন আহমেদ

তবে কি তারা বলে, সে (নবী) নিজের পক্ষ থেকে এই ওহী রচনা করেছে? (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে তোমরাও এর মত দশটি স্বরচিত সূরা এনে উপস্থিত কর এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[378]

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন উম্মী নবী। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তোমরা তো অনেক লেখাপড়া জান। আরবী সাহিত্যে তোমাদের প্রচুর দখল ও দক্ষতা। তা এ কিতাব যদি তার মত একজন নিরক্ষর লোক রচনা করতে পারেন, তবে তোমাদের মত উঁচু মানের কবি-সাহিত্যিকগণ কেন পারবে না! সুতরাং তোমরা এর মত পূর্ণাঙ্গ কিতাব নয়; বরং এর মত দশটা সূরাই তৈরি করে দেখাও না!

পরবর্তী সময়ে এ চ্যালেঞ্জ আরও সহজ করে দেওয়া হয়। সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে-

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ.

তোমরা যদি এই (কুরআন) সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাক, যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল করেছি, তবে তোমরা এর মত কোনও একটি সূরা বানিয়ে আন। আর সত্যবাদী হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও। তারপরও যদি তোমরা এ কাজ করতে না পার আর এটা তো নিশ্চিত যে, তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।[379] সূরা ইউনুসে ইরশাদ হচ্ছে

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

---

[378] সূরা হূদ ১৩

[379] সূরা বাকারা ২৩-২৪

এ কুরআন এমন নয় যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে রচনা করা হবে, বরং এটা (ওহীর) সেইসব বিষয়ের সমর্থন করে, যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ (লওহে মাহফূজে) যেসব বিষয় লিখে রেখেছেন এটা তার ব্যাখ্যা করে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। তারপরও কি তারা বলে, রাসূল নিজের পক্ষ হতে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর মত একটি সূরাই (রচনা করে) নিয়ে এসো এবং (এ কাজে সাহায্য গ্রহণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[380]

তারা যদি মনে করত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো সহযোগিতায় কুরআন রচনা করেছেন, তবে তাদের জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা গ্রহণ খুবই সহজ ছিল। ভাষাজ্ঞানে এবং অন্য কারো সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাদের মতই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো বিশেষ সুবিধা ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিল। কথার যুদ্ধের পরিবর্তে তরবারীর যুদ্ধ গ্রহণ করেছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের সর্বোচ্চ সাহিত্য ও আলঙ্কারিক মান তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার বা এর বিপরীতে কোনো সাহিত্যকর্ম পেশ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

নবুয়তের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছেন। অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে কুরআনের ছোট্ট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় নি। কারণ তারা কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো

---

[380] সূরা ইউনুস ৩৭-৩৮

কাব্য বা সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে। এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল। আমরা জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে। দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয় তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে। বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফির নেতৃবৃন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত। কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয় নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা

কুরআন আল্লাহর বাণী তা হলো কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। কুরআনের মধ্যে অনেক আগাম খবর দেওয়া হয়েছে, যেগুলি পরবর্তীকালে ঠিক সংবাদ অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। এ সকল আগাম খবরের মধ্যে রয়েছে:

(১) মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘‘আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাস্জিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না’’[381]

(২) মহান আল্লাহ বলেছেন: ‘‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত-ক্ষমতাধর করবেন, যেভাবে তিনি ক্ষমতা দিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে, এবং অব্যশই তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ়-সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের

---

[381] সূরা: ফাত্হ, ২৭ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করা হয় পরে তা বাস্তবায়িত হয়।

দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্য তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না...''[382]

এখানে আল্লাহ ওয়াদা করলেন মুমিনদেরকে যে, তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাধর করবেন, খলীফা বা শাসক তাদের মধ্য থেকেই হবেন, তাদের মনোনীত দীন সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের ভয়-ভীতির অবস্থা পরিবর্তন করে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পুরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা দান করেন। আবূ বাক্র সিদ্দীকের (রা) সময়ে এই বিজয়, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার অবয়ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। উমার ফারূকের (রা) সময়ে তা আরো প্রসারিত হয়। উসমান ইবনু আফফানের (রা) সময়ে ক্ষমতা ও নিরাপত্তার চাদর আরো প্রসারিত হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যে মুসলিমগণ তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র প্রায় পুরোটুকুই অধিকার করেন। এভাবে আল্লাহর মনোনীত দীন এ সকল দেশের সকল দীনের উপর বিজয় লাভ করে। ফলে মুসলিমগণ নিরাপদে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন।

(৩) মহান আল্লাহ বলেছেন: ''অচিরেই তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পন করে''[383] এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছে।[384]

---

[382] সূরা নূর, ৫৫

[383] সূরা: ফাত্হ, ১৬

[384] ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় রাওয়ানা দেন। মদীনার মুনাফিকগণ এতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এব মনে করে যে, মক্কার কাফিরগণ মুসলিমদেরকে নির্মুল করবে। তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুসলিমগণ হুদাইবিয়ার সন্ধি শেষে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। তখন মহান আল্লাহ সূরা ফাতহে নির্দেশ দেন, যে সকল মুনাফিক এ যাত্রা থেকে বিরত ছিল তারা পরবর্তী যুদ্ধেও অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে না। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধের জন্য তাদেরকে আহবান করা

(৪) মহান আল্লাহ বলেন: ‘‘যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।’’[385]

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই ওয়াদাও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করেছে।

(৫) আল্লাহ বলেন: ‘‘আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।’’[386]

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। অগণিত মানুষ তাঁকে হত্যা করার ও তাঁকে ধরার বুক থেমে মুছে দেওয়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেউই তার ক্ষতি করতে সক্ষম হয় নি। তিনি আল্লাহর হেফাযতে থেকে পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে পৃথিবীর আবাসস্থল পরিত্যাগ করে পরকালীন মহান আবাসস্থলে গমন করেন।

(৬) আল্লাহ বলেন:‘‘আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী)পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে (আরব দেশের সীমানায়) কিন্তু তারা(রোমকগণ) তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক (তিন থেকে দশ) বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এ আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তারা অমনোযোগী।’’[387]

পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল অগ্নি উপাসক আর রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল খৃস্টান। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আগে থেকেই চলছিল। ৬১৮/৬১৯ খৃস্টাব্দের দিকে (নবুয়তের ৮/৯ম বৎসরের দিকে, হিজরতের ৩/4 বৎসর পূর্বে) পারস্য-বাহিনীর নিকট রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত

হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রোমান ও পারসিয়ান রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে কার্যকর হয়েছে।

385 সূরা নাসর, ১-২

386 সূরা মায়িদা, ৬৭

387 সূরা : ৩০, রূম, ১-৭ আয়াত।

হয়।[388] কিছু সময়ের মধ্যে এই পরাজয়ের সংবাদ মক্কাতেও পৌঁছে যায়। রোমকদের উপর পারস্যবাসীদের বিজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌঁছালে মক্কার কাফিরগণ আনন্দিত হন। তারা বলে, তোমরা মুসলিমগণ এবং খৃস্টানগণ ঐশ্বরিক গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবি কর। আর পারস্যবাসীগণ আমাদেরই মত কোনো কিতাব মানে না। আমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের ভ্রাতাগণের উপর বিজয় লাভ করেছেন। এভাবে আমরাও শীঘ্রই তোমাদের উপরে বিজয় লাভ করব এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়। পরাজয়ের প্রায় ৭ বৎসর পরে ৬২৭ খৃস্টাব্দে (৬হি) রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পারস্য সম্রাটের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হৃত এলাকাসমূহ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[389]

(৭) মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘‘আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব।’’[390]

এভাবে আল্লাহ কুরআন নাযিলের শুরুতেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিনি এই কুরআনকে সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে সংরক্ষণ করবেন। আর বাস্তবেও তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের সকল পণ্ডিত তা জানেন। এ মহান নেয়ামতের জন্য প্রশংসা মহান আল্লাহর।

অতীতের সংবাদ

কুরআন আল্লাহর অলৌকিক বাণী, তা হলো কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ববর্তী জাতি সমূহের সংবাদাদি। কুরআনে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের বিভিন্ন সংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা সর্বজন পরিজ্ঞাত যে, রাসূলুল্লাহ

---

388 পারস্য সম্রাটের সেনাদল মিসর অধিকার পূর্বক উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত কার্থেজ নগর আক্রমন করে। অপর একদল পারসিক সেনা এসিয়া মাইনর পুরোটাই রোমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিজয়ী বেশে বস্ফোরাস প্রণালীর তীরে উপনীত হয়। দুর্দান্ত স্লাভ জাতির আক্রমনে রাজধানী কন্সটান্টিনোপল আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে রোমক সম্রাট পারসিক সেনাদলের গতিরোধ করতে অক্ষম হন। মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪১

389 মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪৭।

390 সূরা : ১৫ হিজ্র, ৯ আয়াত।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো লেখাপড়া করেন নি। আলিমদের সাথে উঠাবসা বা জ্ঞানীদেরে থেকে শিক্ষালাভ করার সুযোগও তার হয় নি। বরং তিনি এমন একটি জাতির মধ্যে বেড়ে উঠেন যে জাতি মূর্তিপূজা করত এবং লেখাপড়া জানত না। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেও তারা দূরে ছিল। তিনি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য তার নিজ জাতিকে ছেড়ে দূরে গমন করেন নি, যে সময়ে তিনি অন্য দেশের পণ্ডিতদের থেকে এ সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারেন।[391] এরূপ একজন মানুষ কর্তৃক পূর্ববর্তী জাতি, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য প্রদান করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমেই তিনি তা লাভ করেন।[392]

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূর্ববর্তী জাতি বা ঘটনাসমূহের সংবাদ দানের ক্ষেত্রে কুরআনে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিষয়ের বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি যদি তার তথ্য সংগ্রহে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত গালগল্পের উপর নির্ভর করতেন, তবে এ সকল বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করতেন না।[393] খৃস্টের ক্রুসেবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কুরআন প্রচলিত

---

[391] নবুয়তের পূর্বে পূর্ববর্তী ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ বা পূর্ববর্তী জাতিদের সম্পর্কে তাঁর কোনোরূপ আগ্রহ ছিল বলে কেউ দাবি করতে পারবেন না। তিনি কখনো অন্য ধর্মের পন্ডিতদের নিকট যেয়ে এ সকল বিষয়ে তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করেন নি বা আলোচনা করেন নি। চলতি পথে কোনো ব্যক্তি তাকে কিছু বললেও তা নিয়ে পরে চিন্তা গবেষণাও করেন নি।

[392] যীশুখৃস্ট প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রপাঠ করেছেন বলে জানা যায় না, তবে তিনি ইহূদী সমাজে ইহূদী পন্ডিতদের মধ্যে বড় হয়েছেন, স্বভাবতই ইহূদী ধর্মের ও ধর্মগ্রন্থের বিষয়গুলি তিনি সমাজ ও পন্ডিতদের থেকে জেনেছেন। তারপরও যখন তিনি শরীয়ত বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন তখন ইহূদীরা আশ্চার্য হয়। বাইবেলে একে যীশুর অলৌকিকত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যোহন ৭/১৫-১৬: ‘‘তাহাতে যিহূদীরা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল? যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার। ...

[393] প্রসিদ্ধ ফরাসী চিকিৎসক ও গবেষক ড. মরিস বুকাইলি রচিত ‘The Bible, The Qur'an and Science’ (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান) পুস্তকটি পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, বাইবেলের অগণিত অবৈজ্ঞানিক, আজগুবি ও অবাস্তব গল্প-কাহিনী কুরআনে সতর্কতার সাথে পরিহার করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় বাইবেলের অতিরঞ্জনও কুরআনে পরিহার করা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির সন, তারিখ, বিশ্বের বয়স ইত্যাদি বিষয়ে বাইবেলের প্রসিদ্ধ তথ্যাদি সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। তিনি যদি ইহূদী খৃস্টানদের থেকেই এ সকল গল্প কাহিনী গ্রহণ করতেন তবে তিনি এগুলি বাদ দিলেন কেন? বিশেষত, যে যুগে মানুষ এ সব সন,

বাইবেলের বিরোধিতা করেছে। এ বিরোধিতা ইচ্ছাকৃত। কারণ প্রচলিত বাইবেলের এ সকল পুস্তক বিশুদ্ধ নয়, অথবা তা ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। কুরআনের বাণীই প্রমাণ করে যে, কুরআন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ভুলভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে: ‘‘ইস্রায়েল সন্তানগণ যে সকল বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন সেগুলির অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।’’[394]

মুনাফিকদের গোপন খবর

কুরআনের অলৌকিকত্বের পঞ্চম বিষয় হলো, কুরআনে মুনাফিকদের গোপন চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। তারা গোপনে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি আঁটতো। আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যথাসময়ে একের পর এক সে সকল গোপন ষড়যন্ত্র ও সলাপরামর্শের কথা জানিয়ে দিতেন। প্রত্যেক ঘটনায় বিস্তারিতভাবে তাদের কথাবার্তা, পরিকল্পনা ও কর্মের কথা জানানো হয়েছে। প্রত্যেক বারেই তা সত্য বলে পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে ইয়াহূদীদের অবস্থা, তাদের মনের কথা ও ষড়যন্ত্রও কুরআনে বিবৃত করা হয়েছে।

বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিমুক্তি

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে হত, তবে এর মধ্যে বহু অসংগতি পেত। সূরা নিসা ৪:৮২

তারিখ, ইতিহাস ও অবাস্তব কাহিনীগুলি শোনার জন্য পাগল ছিল, এগুলিকেই অলৌকিকত্ব মনে করত, এবং এ সকল গল্প দিয়ে সহজেই মানুষের হৃদয় প্রভাবিত করা যেত, সে যুগে তিনি এগুলি পরিহার করলেন কেন? আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় কুরআনের বর্ণনাই সঠিক এবং বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা অবৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

[394] সূরা : ২৭ নাম্ল, ৭৬ আয়াত।

কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আল্লাহর বাণী হওয়ার **(Divinity)** সপ্তম প্রমাণ স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য থেকে বিমুক্তি।[395] কুরআন একটি বৃহৎ গ্রন্থ যাতে অনেক জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত, একবারে তা প্রদত্ত হয় নি; বরং সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ও পরিস্থিতিতে এর বিভিন্ন অংশ অবতরণ করা হয় এবং বিভিন্ন সূরার মধ্যে সংযুক্ত হয়। এরূপ একটি গ্রন্থ যদি আল্লাহর বাণী না হয়ে কোনো মানুষের রচিত হতো, তবে নিঃসন্দেহে তাতে বিভিন্ন স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য দেখা যেত। সুদীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ এরূপ একটি বৃহদাকার গ্রন্থ বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। কুরআনে এরূপ স্ববিরোধিতা, বৈপরীত্য ও অসংগতি না থাকা প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহর বাণী।

হৃদয়ঙ্গম ও মুখস্ত করা সহজ

কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক হলো, শিক্ষার্থীর জন্য তা অতি সহজ হয়ে যায়। সহজেই তা মুখস্থ করা যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: ‘‘কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?’’[396] রাসূলুল্লা**হ সা.** এর যুগ থেকে সকল যুগে, এবং বর্তমান যুগে প্রতিটি মুসলিম সমাজ বা জনপদে অগণিত হাফিযে কুরআন বিদ্যমান, যারা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ রেখেছেন। যাদের যে কোনো একজনের স্মৃতির উপর নির্ভর করে কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশুদ্ধভাবে লিখে নেওয়া যায়। শব্দের পরিবর্তন বা ভুল তো দূরের কথা, স্বরচিহ্ন, বিভক্তিচিহ্ন বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি হারাকাতেও সামান্যতম ভুল হবে না।

---

395 বাইবেলে কোথাও আমরা দেখতে পাই যে, যীশু অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল মানুষ। আবার কোথাও দেখতে পাই যে, তাকে অস্বাভাবিক বদরাগি ও কঠোর মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এমনকি অস্বাভাবিক ক্রোধে তিনি নিরপরাধ বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলছেন, নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে গালিগালাজ করছেন। নিঃসন্দেহে এই চিত্রায়ণ স্ববিরোধী। পক্ষান্তরে ২৩ বৎসরের দীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ কুরআনে এক্ষেত্রে অলৌকিক সুসামঞ্জস্যতা দেখতে পাই। ঈসা (আ)-কে সর্বদা সংবেদনশীল, ক্ষমাশীল ও দয়ালু রূপে দেখতে পাই। মূসা (আ)-কে দৃঢ়চেতা, দ্রুত উত্তেজিত ও দ্রুত সংযত দেখতে পাই।

396 সূরা: ৫৪ কামার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত।

পক্ষান্তরে বিশ্বের কোথাও একজন খৃস্টানও পাওয়া যাবে না যিনি পুরো বাইবেল মুখস্ত রেখেছেন। পুরো বাইবেল বা পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল পুস্তক মুখস্ত করা তো অনেক দূরের কথা, শুধু নতুন নিয়ম বা সুসমাচারগুলি মুখস্ত করেছেন এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না। এটি ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ও ইসলামের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একটি সহজবোধগম্য পার্থক্য ও কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের প্রশ্নাতীত একটি প্রমাণ, যে কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষও তা অনুভব করতে পারেন।

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

صفات الله. ليست كصفات البشر

আল্লাহর গুণ; মানুষের গুণের মতো নয়

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন,

وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ .

> ''যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানবীয় কোনো গুণ আরোপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি এতে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে সে শিক্ষা নিতে সক্ষম হবে। আর (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফিরদের মত নিরর্থক কথা বলা হতে বিরত থাকবে এবং সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুণাবলীতে মানুষের মতো নন।'

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة:22-23]، وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ.

> ''আর জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য। তবে সে দেখা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করে নয়, আর তার পদ্ধতিও আমাদের অজানা। যেমনটি কুরআন ঘোষণা করে বলেছে,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

> ''সেদিন কতকগুলো মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জল হবে, সেগুলো তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'' সূরা আল-কিয়ামাহ ২২ এ দেখার সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে তিনি জানেন সে ভাবেই অনুষ্ঠিত হবে।''

وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا، وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عز وجل وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ، وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ.

> ‘‘আর এ সম্পর্কে যা কিছু সহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তা যেমনটি তিনি বলেছেন সেভাবে অবিকৃত অবস্থায় গৃহীত হবে আর সেগুলোর যে অর্থ তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটাই ধর্তব্য হবে এতে আমরা আমাদের মতের ওপর নির্ভর করে কোনো প্রকার অপব্যাখ্যা করব না, অনুরূপ কোনো প্রকার প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নিপতিত হয়ে কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না। কারণ, কোনো ব্যক্তি কেবল তখনই তার দীনকে (ভ্রষ্টতা ও বক্রতা থেকে) নিরাপদ রাখতে পারে, যখন সে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নির্দেশনার) কাছে নিঃশর্তভাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করবে এবং সংশয়ের ব্যাপারসমূহকে যে সেটা জানে সে আল্লাহর দিকেই প্রর্ত্যাবর্তন করাবে’’

وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ، وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ، وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ، فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، مُوَسْوَسًا تَائِهًا، شَاكًّا زَائِغًا ، لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا .

> ‘‘বশ্যতা স্বীকার আর আত্মসমর্পণ ছাড়া কারও পা ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের পিছনে লেগে থাকবে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, তার সে ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফাত ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত রাখবে। ফলে সে কুফরী ও ঈমান সত্য ও মিথ্যা, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি, সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনিশ্চয়তার বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে না সত্যবাদী মু’মিন হবে, আর না অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী হবো।’’

وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ، أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ، إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ لايَصِحُّ: فلا يصح الايمان بالروْية الا بتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَلُزُومِ التَّسْلِيمِ، وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ، فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ.

> ‘‘যে ব্যক্তি জান্নাতীদের দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পাওয়া সম্পর্কে কোনো ধারণার বশবর্তী হবে, (অথবা সেটাকে অনিশ্চিত বিষয় জ্ঞান করবে) অথবা নিজের বুঝ অনুসারে সে দেখার ভুল ব্যাখ্যা দিবে, তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, আল্লাহকে দেখার বিষয়টি, অনুরূপ রবের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় গুণাগুণের বিষয়ে অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং মনগড়া ব্যাখ্যা পরিহার করত, নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া ছাড়া আল্লাহর দর্শন লাভ সংক্রান্ত ইমান বিশুদ্ধ হবে না। এটাই হচ্ছে মুসলিমদের দীন (অনুসৃত নীতি) যে ব্যক্তি (রবের সাথে সংশ্লিষ্ট গুণাগুণকে) নফী (অর্থাৎ আল্লাহর কোন গুন নেই; এই বিশ্বাস) এবং তাশবীহ (তার গুণগুলিকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য) হতে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না, তার নিশ্চিত পদস্খলন ঘটবে এবং সে সঠিকভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে। কারণ, আমাদের মহান রব একক ও নজীরবিহীন হওয়ার গুণে গুণান্বিত। মাখলুকের মধ্যে কেউ তাঁর গুণে ভূষিত নয়।’’

وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

> ‘আর আল্লাহ তা‘আলা সীমা, পরিধি থেকে উর্ধ্বে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে মুক্ত। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না’’[397]

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَا، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ

397

بِمَا شَاءَ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ; فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.

''আর মি'রাজ সত্য, নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নৈশকালে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে উর্ধ্ব আকাশে উত্থিত করা হয়েছিল। সেখান থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে আরো উর্ধ্বে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁকে যা প্রত্যাদেশ করার ছিল তা করেছেন।'' ''তিনি যা দেখেছেন তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি''[398] সুতরাং আল্লাহর তাঁর ওপর আখিরাতে এবং দুনিয়ার জগতে সালাত ও সালাম পেশ করুন।''

وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ -غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ- حَقٌّ.

''আর হাউয (পানির আধার) যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে প্রদান করে সম্মানিত করেছেন, তা অবশ্যই সত্য।''

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ، كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ.

''আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত, যা তিনি উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন যেমনটি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য।''

وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ.

''মী-ছাক'' (দৃঢ় অঙ্গীকার), যা আল্লাহ তাআলা আদম এবং তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তা সত্য।''

وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُ.

''মহান আল্লাহ শুরু থেকে এবং এখন, সব সময়েই ভলো করেই জানেন, কত লোক জান্নাতে যাবে আর কত লোক জাহান্নামে যাবে। এতে ব্যতিক্রম হবে না। তাই এ সংখ্যা কমবেও না, বাড়বেও না।''

---

[398] সূরা আন-নাজম ১১

وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

> ''অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবহিত এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ সাধ্য করে দেওয়া হয়েছে''

وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ.

> ''শেষ কর্ম দ্বারা মানুষের কৃতকার্যতা বিবেচিত হবে এবং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় ভাগ্যবান বলে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হতভাগা সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় হতভাগা বলে নির্ধারিত হয়েছে।''

وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء:23]، فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

> **''আর ''তাকদীর'' সম্পর্কে আসল কথা এই যে, এটা সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি রহস্য; যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশ্তা কিংবা প্রেরিত কোনো নবীও অবহিত নন। এ সম্পর্কে তথ্য আবিস্কার করতে যাওয়া অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আশাহত হওয়ার নিশ্চিত কারণ, বঞ্চনার সিঁড়ি এবং সীমালংঘনের ধাপ। অতএব সাবধান! এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ, আল্লাহ তাআলা 'তাকদীর' সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

“তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তারা (তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে”[399]

অতএব, যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞেস করবে “তিনি কেন এ কাজ করলেন?” সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।”

فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ، وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ .

“(তাকদীর বিষয়ে যা জানা ও যার উপর ঈমান আনার প্রয়োজন), উপরোক্ত আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে তা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহর ওলী তথা বন্ধুদের মধ্যে যার অন্তর জ্যোতিদীপ্ত তার জন্য এতটুকু জানাই প্রয়োজন। আর এটিই হচ্ছে জ্ঞানে সুগভীর প্রজ্ঞা বিভূষিতদের স্তর। (যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সংবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেয় এবং তার কাছে আত্মসমর্পন করে)

কারণ, ইলম বা জ্ঞান দু’প্রকার। (১) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট বিদ্যমান[400] (২) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট অবিদ্যমান। বিদ্যমানকে অস্বীকার করাও যেমন কুফুরী, অবিদ্যমান জ্ঞানের দাবী করাও তেমনি কুফুরী। বিদ্যমান জ্ঞানের সাধনা করা, আর অবিদ্যমান জ্ঞানের অন্বেষন করা হতে বিরত থাকাই সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয়।”

[399] সূরা আল-আম্বিয়া, ২৩

[400] আর তা হচ্ছে শরী‘আতের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাজনিত জ্ঞান।

দরসুল আকিদা

القضاء والقدر
ক্বাদ্বা এবং ক্বাদর

সূ চী

- ক্বাদ্বা এবং ক্বাদরের পরিচয় এবং পার্থক্য
- তাক্বদীরের হুকুম
- তাকদীরের তাৎপর্য
- তাকদীরের রুকন
- তাক্বদীর লিপিবদ্ধের পাঁচটি পর্যায়

ক্বাদ্বা এবং তাক্বদীরের পরিচয়

‘আল-ক্বাদার’ (اَلْقَدَرُ) বা তাক্বদীরের আভিধানিক অর্থ

‘আল-ক্বাদার’ (اَلْقَدَر) শব্দটির ‘দাল’ বর্ণে যবর দিয়ে অথবা সাকিন করে দু’ভাবেই পড়া যায়। ‘ইবনে ফারেস রাহি. বলেন, ‘আল-ক্বাদ্‌র’ (اَلْقَدْرُ) অর্থঃ কোন কিছুর পরিধি, সীমা বা পরিমাণ।[401]

‘মু‘জামু মাক্বায়ীসিল্লুগাহ’ (معجم مقاييس اللغة) প্রণেতা বলেন, ‘আল-ক্বাদার’ (اَلْقَدَرُ) শব্দটি কোন কিছুর পরিধি বা শেষ সীমানা নির্দেশ করে। তিনি বলেন, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছুর পরিমাণ, শেষ সীমা ইত্যাদি নির্ধারণ করার নাম ‘আল-ক্বাদ্‌র’ (اَلْقَدْرُ) ‘আল-ক্বাদার’ (اَلْقَدَرُ) ও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।[402]

ক্বাদ্বা এবং তাক্বদীরের পারিভাষিক অর্থ

هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها

সবকিছু ঘটার আগেই সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সম্যক জ্ঞান, সেগুলি লাউহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করণ, তদ্বিষয়ে তাঁর পূর্ণ ইচ্ছার সমন্বয় এবং অবশেষে সেগুলিকে সৃষ্টি করাকে তাক্বদীর বলে।[403]

القضاء ও القدر এর মধ্যে পার্থক্য

কেউ কেউ বলেছেন, ক্বদ্বা ও কদরের অর্থ একই। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত কথা হলো, উভয় শব্দকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। আর যদি উভয়টিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে উভয়টি দ্বারা একই অর্থ বুঝতে হবে।

---

401. ইবনে ফারেস, মুজমালুল্লাগাহ, ৪/১৪৭

402. ইবনে ফারেস, মু‘জামু মাক্বায়ীসিল্লুগাহ, ৫/৬২

403. القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صالح المحمود - ص30

القدر: هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل.

ভবিষ্যতে সৃষ্টিসমূহের যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার অবগতিকে ‘কদর’ বলা হয়।

والقضاء: هو إيجاد الله للأشياء حسب علمه وإرادته.

আল্লাহ তা‘আলার ইলম ও ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করাকে ‘ক্বাদ্বা’ বলা হয়।

মোটকথা; আল্লাহ যখন নির্দিষ্ট কোনো জিনিস অমুক সময় হবে বলে নির্ধারণ করেন, তখন তাকে কদর বলা হয়। আর যখন ঐ জিনিসটি সৃষ্টি করার নির্দিষ্ট সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন তার ফায়সালা করা এবং অস্তিত্বে নিয়ে আসাকে ক্বাদ্বা বলা হয়। কুরআনুল কারীমে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَقُضِيَ الْأَمْرُ

‘‘তখন সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে যাবে’’[404] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ

‘‘আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়ছালা করেন’’[405]

এ রকম আয়াত আরো রয়েছে। সুতরাং কদর হলো আদিতেই আল্লাহর নির্ধারণের নাম। আর ক্বাদ্বা হলো সংঘটিত হওয়ার সময় সে সম্পর্কে ফায়ছালা করার নাম।

তাক্বদীরের হুকুম

তাকদীরের ওপর ঈমান আনা ঈমানের রুকনসমূহের একটি অন্যতম রুকন। যে ব্যক্তি তাকদীরকে অস্বীকার করল সে ইসলামী শরী‘আতের মূলনীতিসমূহের একটি অন্যতম মূলনীতিকে অস্বীকার করলো। অতএব সে কাফির হয়ে যাবে। উলামাগণ সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। ইমাম নববী রাহি, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহি, ইবনে হাজার রাহি. সহ অনেকেই এই ইজমা উল্লেখ করেছেন।

---

[404] সূরা বাকারা: ২১০

[405] সূরা গাফের: ২০

দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

‘নিশ্চয় প্রত্যেকটি জিনিসকে আমরা ‘ক্বাদর’ তথা পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি (আল-ক্বামার ৪৯) ইবনু কাছীর (রাহি.) বলেন, আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এই আয়াত দ্বারা তাক্বদীর সাব্যস্ত হওয়ার দলীল গ্রহণ করেন।

অন্য আয়াতে এসেছে,

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

‘আর আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্দিষ্ট, অবধারিত’ আল-আহযাব ৩৮ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রাহি.) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় অবশ্যই ঘটবে, এর সামান্যতম কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। তিনি যা চান, তা ঘটে। আর যা তিনি চান না, তা ঘটে না।

হাদীছে জিবরীলে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

‘আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান’

রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন,

لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

‘তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না’

এ ধরনের আরো বহু আয়াত এবং হাদীছ আছে, যেগুলি অকাট্যভাবে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে।

তাকদীরের তাৎপর্য

তাকদীর নির্ধারণ আল্লাহর গোপন রহস্য, তাঁর সৃষ্টজীবের মাঝে এ কথাটি শুধুমাত্র তাকদীরের গোপন দিকের জন্য প্রযোজ্য। কারণ সকল জিনিসের হাকীকত শুধুমাত্র আল্লাহ জানেন। মানুষ তা অবগত হতে পারে না। যেমন, আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, হিদায়াত করেন, মৃত্যু দান করেন, জীবিত করেন, নিষেধ করেন ও কিছু প্রদান করেন। তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

291- দরসুল আকিদা

ক. রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

إذا ذُكِرَ أَصْحابِي فأَمْسِكُوا و إذا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فأَمْسِكُوا وَ إذا ذُكِرَ القَدَرُ فأَمْسِكُوا

‘আমার ছাহাবা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম)-এর কথা উঠলে তোমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে না। তারকারাজির বিধিবিধান, প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে কথা উঠলে তোমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে না। অনুরূপভাবে তাক্বদীর সম্পর্কে কথা উঠলে তোমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে না’

খ. আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِى وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ: أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِى هَذَا الأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَتَنَازَعُوا فِيهِ

‘আমরা তাক্বদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট রাসূল (সা.) আসলেন। অতঃপর তিনি ভীষণ রেগে গেলেন, রাগের প্রচণ্ডতায় তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল; মনে হচ্ছিল, তাঁর কপোলদ্বয়ে ডালিম ভেঙ্গে তার রস লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি এমন তর্ক-বিতর্ক করার জন্য আদিষ্ট হয়েছ নাকি আমি এ মর্মে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তো তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করেছিল। তোমাদের প্রতি আমার কঠোর নির্দেশ রইলো যে, তোমরা এ নিয়ে তর্ক করবে না’

নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য

নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাক্বদীর নিয়ে বিনা দলীলে এবং বিনা জ্ঞানে অহেতুক এবং বিভ্রান্তিকর আলোচনা করা যাবে না। এবং হাদীছগুলিতে তাক্বদীর নিয়ে আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কেউ একগুঁয়েমী প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ কেন অমুককে হেদায়াত করলেন, আর অমুককে পথভ্রষ্ট করলেন? এত সৃষ্টি থাকতে আল্লাহ কেন মানুষের উপর শরী‘আতের দায়িত্ব ভার অর্পণ করলেন? আল্লাহ কেন অমুককে ধনী করলেন, আর অমুককে গরীব করলেন? ইত্যাদি...সেজন্য আবূ হুরায়রাহ (রাযি.) বর্ণিত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায়

মোল্লা আলী ক্বারী তাক্বদীর নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাযি) এর ঐদিনের আলোচনার ধরণ তুলে ধরেন এভাবে, আমরা তাক্বদীর নিয়ে বিতণ্ডা করছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বলছিলেন, সবকিছু যদি তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাহলে কেন বান্দাকে সুখ বা শাস্তি দেওয়া হবে? যেমনটি মু'তাযিলারা বলে থাকে। আবার কেউ কেউ বলছিলেন, একদলকে জান্নাতী এবং অপর দলকে জাহান্নামী হিসাবে নির্ধারণ করার তাৎপর্য কি? এর জবাবে তাঁদের কেউ কেউ বলছিলেন, কেননা বান্দার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। এর জবাবে আবার কেউ কেউ বলছিলেন, তাহলে তার সেই ইচ্ছাশক্তি কে সৃষ্টি করেছেন? আর এমন বিতণ্ডার কারণেই সেদিন রাসূল (সা.) রেগে গিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে এথেকে নিষেধ করেছিলেন।

তবে কেউ সত্যিকার অর্থে তাক্বদীর জানার জন্য প্রশ্ন করলে তাতে কোন দোষ নেই।

তাকদীরের রুকন[406]

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান পূর্ণতা লাভের জন্য নিম্নের 5টির প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই 5 টির কোন একটি বা একাধিক অমান্য করবে, তাক্বদীরের প্রতি তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে।

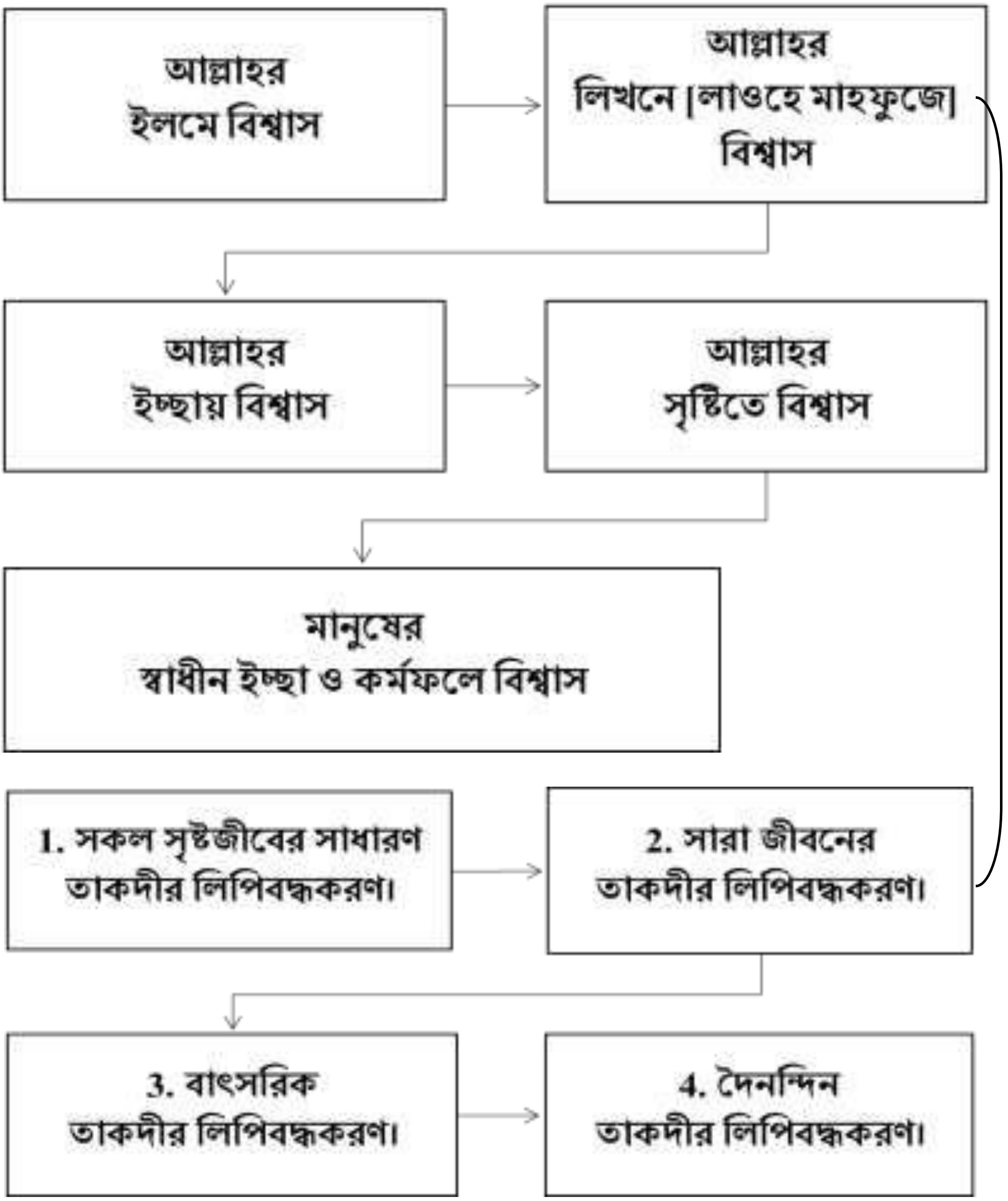

406 আদ-দুরারুস সানিয়্যা 5/247

الإيمان بعلم الله الشامل المحيط
আল্লাহর ইলমে বিশ্বাস

অর্থাৎ সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে; এমর্মে আমাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে। যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে, সে সম্পর্কে তিনি জানেন। আর যা ঘটেনি, তা যদি ঘটত, তাহলে কিভাবে ঘটত, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির ভাল-মন্দ, আনুগত্য-অবাধ্যতা ইত্যাদি সার্বিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি খবর রাখেন। তাদের যাবতীয় অবস্থা, হায়াত-মউত, আয়ূস্কাল, রিযিক্ব, নড়াচড়া, স্থির থাকা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত। তাদের মধ্যে কে দুর্ভাগা ও কে সৌভাগ্যবান হবে, বরযখী জীবনে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে, পুনরুত্থানের পরে তাদের কি হবে ইত্যাদি সব বিষয়েই তিনি চিরন্তন জ্ঞানের অধিকারী। অতএব যেহুতু আল্লাহ আগে থেকেই সবকিছু জানেন তবে সে জ্ঞান অনুসারে তিনি তা তাকদীর বা নির্ধারণ করতে বাধা কোথায়? সে হিসেবে তাকদীর অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। [407]

দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

‘তাঁর কাছেই গায়েবী বিষয়ের চাবিসমূহ রয়েছে; এগুলি তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে, তিনিই জানেন। তাঁর জানার বাইরে (গাছের) কোন পাতাও ঝরে না। তাক্বদীরের লিখন ব্যতীত কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্যও পতিত হয় না’[408]

অন্যত্রে তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

407. ফালাহ ইবনে ইসমাঈল, আল-ই‘তিক্বাদুল ওয়াজিব নাহ্‌ওয়াল ক্বাদার/৯।

408 আন‘আম ৫৯

'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই ক্বিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোথায় সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত'।[409] মহান আল্লাহ বলেন,

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমীনে বিচরণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত হবে'[410] অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

'তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত'[411]

হাদীছে এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যখন মুশরিকদের ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'তারা বেঁচে থাকলে কি আমল করত, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত'[412]

2. আল্লাহর লিখনে [লাওহে মাহফুজে] বিশ্বাস

الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة.

অর্থাৎ মহান আল্লাহ লাউহে মাহফূযে তাঁর চিরন্তন জ্ঞান মোতাবেক [কিয়ামাত পর্যযন্ত যা ঘটবে] সৃষ্টিজগতের সবকিছুর তাক্বদীর কলম দ্বারা লিখে রেখেছেন; তাঁর চিরন্তন জ্ঞানের কোন কিছুই এই লেখনী থেকে বাদ পড়ে নি। আর লাউহে মাহ্‌ফূযের এই লিখন ছিল আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে। তখন আল্লাহ কলম সৃষ্টি করে তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবকিছু লেখার নির্দেশ

---

[409] লুক্বমান ৩৪

[410] মুয্‌যাম্মেল ২০

[411] হাশর ২২

[412]. মুসলিম, হা/২৬৫৮, 'তাক্বদীর' অধ্যায়

দিয়েছিলেন।[413]

দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

'তুমি কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সব বিষয়ে আল্লাহ জানেন। এ সবকিছুই কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্‌র কাছে সহজ'।[414]

অন্যত্র মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

'যমীনে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর এমন কোন মুছীবত আসে না, যা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।নিশ্চয়ই এটি আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ'[415]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, 'আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ সবকিছুর তাক্বদীর লিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে'[416]

তাক্বদীর লিপিবদ্ধের পাঁচটি পর্যায়

প্রথম পর্যায়ঃ আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ লাউহে মাহ্‌ফূযে সবকিছুর তাক্বদীর লিখে রাখেন। লাউহে মাহ্‌ফূযে বান্দার ভাগ্যে ভাল বা মন্দ যা-ই লিখে রাখা হয়েছে, তা-ই সে পাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ মানুষ মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতা এসে তার আয়ু, কর্ম, রিযিক্ব এবং সে সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা, তা লিখে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

---

413. আল-ই'তিক্বাদুল ওয়াজিব নাহ্‌ওয়াল ক্বাদার/১১

414 হাজ্জ ৭০

415 আল-হাদীদ ২২

416. মুসলিম, হা/২৬৫৩ '

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيد

'তোমাদের যে কাউকে চল্লিশ দিন ধরে তার মায়ের পেটে একত্রিত করা হয়, তারপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে সে জমাটবদ্ধ রক্ত হয় এবং তারপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর চারটি বিষয়ের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তার কাছে ফেরেশতা পাঠান এবং তার রিযিক্ব, দুনিয়াতে তার অবস্থানকাল, তার আমলনামা এবং সে দুর্ভাগা হবে না সৌভাগ্যবান হবে তা লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে বলা হয়'[417]

লাউহে মাহ্‌ফূযের লিখন ছিল সমগ্র সৃষ্টিকুলের; কিন্তু মায়ের পেটের এই লিখন শুধুমাত্র মানুষ জাতির জন্য নির্দিষ্ট।[418]

প্রত্যেক ক্বদরের রাতে ঐ বছরের সবকিছু লেখা হয়। লাউহে মাহফূযের লিখন অনুযায়ী আল্লাহ ফেরেশতামণ্ডলীকে ঐ বছরের সবকিছু লিখতে নির্দেশ দেন। ইহাকে বাৎসরিক তাক্বদীর বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

'আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'[419]

ইবনে আব্বাস বলেন, ক্বদরের রাতে লাউহে মাহফূযের লিখন অনুযায়ী ঐ বছরের জন্ম, মৃত্যু, রিযিক্ব, বৃষ্টি ইত্যাদি সবকিছু আবার লেখা হয়। এমনকি ঐ বছর কে হজ্জ করবে আর কে করবে না, তাও লিখে রাখা হয়।[420]

পঞ্চম পর্যায়ঃ পূর্বের লিখিত তাক্বদীর অনুযায়ী প্রত্যেক দিন সবকিছুকে নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়। ইহাকে প্রাত্যহিক তাক্বদীর বলে। মহান আল্লাহ বলেন,

---

417. বুখারী, ২/৪২৪, হা/৩২০৮

418. জামে'উ শুরূহিল আক্বীদাতিত্-ত্বহাবিইয়াহ, ১/৫৬৯-৫৭০

419 দুখান ৩-৪

420. ইমাম ক্বুরত্বুবী, আল-জামে' লিআহকামিল ক্বুরআন ৬/১২৭।

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾

'তিনি প্রতিদিন কোন না কোন কাজে রত আছেন' (সূরা রাহমান ২৯)[421]

ইবনে জারীর (রাহি.) বলেন, রাসূল (সা.) উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যেক দিন তিনি কি করেন? রাসূল (সা.) বললেন, কাউকে ক্ষমা করেন, কারো বিপদাপদ দূর করেন, কারো মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আবার কারো মর্যাদার হানি করেন।[422]

তাক্বদীর লিপিবদ্ধের এই পাঁচটি পর্যায়ের শেষোক্ত চারটি পর্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দার বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতামণ্ডলীকে তাঁদের স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা[423] এবং এগুলি লাউহে মাহফূযে লিখিত তাক্বদীরের বাইরে নয়; বরং এগুলি লাউহে মাহফূযের তাক্বদীরেরই অন্তর্ভুক্ত।[424]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিইয়াহ (রাহি.) বলেন, ফেরেশতামণ্ডলীকে আল্লাহ তাক্বদীরের যেসব বিষয়ে অবহিত করান, তাঁরা কেবল সেগুলিই জানেন; সেগুলির বাইরে কিছুই জানেন না। যেমন: বান্দার মৃত্যু, রিযিক্ব, সে সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা ইত্যাদি।[425]

3. আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস

الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা হয়। যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না। আল্লাহ্‌র রাজ্যে এমনকি কোন কিছুর সামান্যতম নড়াচড়া বা স্থির থাকাও তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হয় না। তিনি কোন কিছুকে যখন, যেভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে করতে চান, তা ঠিক সেমতেই সংঘটিত হয়; তার তিল পরিমাণ ব্যত্যয় ঘটে না। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি ব্যতীত কোন হক্ব মাবূদ নেই।[426]

---

421. জামে'উ শুরূহিল আক্বীদাতিত্-ত্বহাবিইয়াহ, ১/৫৭০;

422. ইবনে জারীর ত্ববারী, তাফসীরে ত্ববারী (জামেউল বায়ান ফী তা'বীলিল ক্বুরআন), ২২/২১৪

423. মিরক্বাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ, ১/২৪০

424. আল-ঈমানু বিল-ক্বাযা ওয়াল-ক্বাদার/২৫২

425. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিইয়াহ, ১৪/৪৮৮-৪৯২

426. আল-ই'তিক্বাদুল ওয়াজিব নাহ্ওয়াল ক্বাদার/১৩

দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

‘তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ এবং তখনই তা হয়ে যায়।[427] অন্যত্র তিনি বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً

‘আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিতে পরিণত করতে পারতেন।[428] তিনি আরো বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

‘আর তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের সবাই ঈমান আনত[429] এ জাতীয় আরো বহু আয়াত আছে, যেগুলি আল্লাহ্‌র পূর্ণ ইচ্ছা প্রমাণ করে।

আবু হুরায়রাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, দো‘আ করার সময় তোমাদের কেউ যেন না বলে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন এবং আপনি চাইলে আমাকে রিযিক্ব দান করুন। বরং সে যেন পাকাপোক্তভাবে তলব করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা খুশী, তা-ই করেন, কেউ তাঁকে বাধ্য করে না।[430]

4. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস

خلقه تبارك وتعالى لكل موجود، لا شريك له في خلقه.

অর্থাৎ আল্লাহ সবকিছুই জানেন, তাঁর চিরন্তন এই জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি সবকিছুই লাউহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন, এ সবকিছুর পেছনে তাঁর পূর্ণ ইচ্ছা বিদ্যমান এবং **সেই ইচ্ছা অনুযায়ীই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করে থাকেন।** প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনি যে আকৃতিতে, যে সময়ে এবং যে বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করতে চান,

---

[427] ইয়াসীন ৮২

[428] হূদ ১১৮

[429] ইউনুস ৯৯

[430]. সহীহ বুখারী, ৪/৩৯৯-৪০০, হা/৭৪৭৭,

সেভাবেই সৃষ্টি করেন।[431] আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষ এবং তার কর্ম সৃষ্টি করেছেন। আসমান-যমীনে অণু-পরমাণুসহ এমন কোন কিছু নেই যে, আল্লাহ তাকে এবং তার নড়াচড়া বা স্থিরতাকে সৃষ্টি করেন নি[432] ঘরের জানালা বা অন্য কোন ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভেতরে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করলে তাতে অসংখ্য অণু-পরমাণু পরিলক্ষিত হয়, এমনকি এসব অণু-পরমাণুর একটি কণাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বাইরে নয়। বরং সেগুলির প্রত্যেকটি কণা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র চিরন্তন সূক্ষ্ম জ্ঞান রয়েছে, তিনি তাকে লাউহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন, তাতে তাঁর ইচ্ছা রয়েছে এবং সময় মত তিনি তা সৃষ্টি করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

‘আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্বশীল’[433]

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বিদা মতে, বান্দার কর্মেরও মূল স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌ই; কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়ন করে বান্দা। এরশাদ হচ্ছে,

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

‘আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন’[434] মুফাস্‌সিরগণ বলেন, উক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, বান্দার কর্ম আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট।[435] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

‘আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট বস্তু দ্বারা তোমাদের জন্য ছায়া বানিয়েছেন। পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল তৈরী করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে

---

431. আল-ই‘তিক্বাদুল ওয়াজিব নাহ্‌ওয়াল ক্বাদার/১৪।

432. মা‘আরেজুল ক্ববূল ৩/৯৪০

433 যুমার ৬২

434 সাফফাত ৯৬

435. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭/২৬;

তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর’[436]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহি.) বলেন, ‘আল্লাহ এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন যে, তৈরীকৃত পোষাক তাঁরই তৈরী। কারণ পোষাকের কাঁচামালকে পোষাক বলা হয় না; বরং মানুষ কর্তৃক পোষাকের রূপ দেওয়া হলেই কেবল তাকে পোষাক বলা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও এটিকে সরাসরি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলা হল’[437]

রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ

‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহই প্রত্যেকটি তৈরীকারক এবং তার তৈরীকৃত বস্তুকে সৃষ্টি করেন’[438]

ইমাম বুখারী (রাহি.) এই হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন, فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّنَاعَاتِ وَأَهْلَهَا مَخْلُوقَةٌ‘রাসূল (সা.) হাদীসটিতে ঘোষণা করলেন, তৈরীকৃত সবকিছু এবং সেগুলির তৈরীকারক আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি’[439]

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কর্ম মানুষ কর্তৃক বাস্তবায়নের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একজন ফার্মাসিস্ট কোন ওষুধ বা বিষ বানাতে যেয়ে কয়েক প্রকার পদার্থ চয়ন করে। এরপর প্রত্যেক প্রকার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থ গ্রহণ করে ওষুধ তৈরী করে। আবার দেখা যায়, ঐ একই পদার্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনে এবং সেগুলিকে সংমিশ্রণের মাধ্যমে বিষ তৈরী করে। **এখানে ঔষধি এই পদার্থগুলির স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, তেমনি ঐ ফার্মাসিস্ট, তার ক্ষমতা এবং জ্ঞানের স্রষ্টাও তিনি। বরং এই ওষুধ কিংবা বিষের স্রষ্টাও মূলতঃ আল্লাহই। অন্যভাবে বলা যায়, মহান আল্লাহ তার বান্দাকে কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞান দান করেছেন। ফলে সে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ থেকেই ভাল বা মন্দ জিনিস আবিষ্কার করছে। সে শূন্য থেকে কোন কিছু তৈরী করছে না; বরং যা**

---

[436] নাহ্‌ল ৮১

[437]. শিফাউল আলীল/১১৮

[438]. ইমাম বুখারী, খালক্বু আফআলিল ইবাদ, ‘বান্দাদের কর্মসমূহ’

[439]. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫।

করছে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু থেকেই করছে; আর আল্লাহ্‌র দেয়া ক্ষমতা দিয়েই করছেন। সূত্র[440]

5. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস

আল্লাহ বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও তার (বান্দার) কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন ও তাকে ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন। তাই বান্দাই প্রকৃতপক্ষে তার কর্মের সম্পাদনকারী, সারাসরি তা আদায়কারী এবং এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। কারণ, তার ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে। অতঃপর সে যদি ঈমান আনে, তবে সে তার ইচ্ছায় ও ইরাদায় ঈমান আনলো। আর সে যদি কুফুরী করে তবে সে তার ইচ্ছায় ও পূর্ণ ইরাদায় কাফির হলো।

মোটকথা, যে সকল কাজ আল্লাহ তা'আলা এই নিখিল বিশ্বে পরিচালনা করেন তা দু'ভাগে বিভক্ত:

এক: আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম তাঁর সৃষ্টি জীবের মাঝে পরিচালনা করেন, তাতে কারো কোনো প্রকার ইচ্ছা ও ইখতিয়ার নেই। বস্তুর সকল ইচ্ছা আল্লাহর জন্য। যেমন জীবিত করা মৃত্যু দান করা সুস্থ ও অসুস্থ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ

"আর আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন।

তিনি আরো বলেন,

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ

যিনি জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?[441]

দুই: আর যে সকল কর্ম সৃষ্টিজীব সম্পাদন করে থাকে, তা সবই ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আর তা সম্পাদনকারীর ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, কারণ আল্লাহ তাদের ওপর সেটা করার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন।

---

440. কাশফুল গায়ূম আনিল ক্বাযা ওয়াল ক্বাদার/১৮-১৯

441 সূরা আল-মুলক, ২

303- দরসুল আকিদা

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ

‘যে তোমাদের মধ্যে সোজা পথে চলতে চায়।’’[442]

তিনি আরো বলেন,

فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ

‘অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক।’’[443]

ভাল কাজ সম্পাদনের জন্য তারা প্রশংসার হক্কদার, আর খারাপ কাজ করার জন্য তারা অপমানের হক্কদার। আল্লাহ শুধুমাত্র ঐ কাজ করার জন্য শাস্তি দিবেন, যাতে বান্দার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ

‘‘আর না আমি বান্দাদের ওপর যুলুমকারী।’’ [444]

আর মানুষ ইচ্ছা ও নিরুপায়ের পার্থক্য জানে। যেরূপ কেউ ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিজ ইচ্ছায় অবতরণ করেন, আর কখনো কেউ তাকে ছাদ থেকে ফেলে দিতে পারে। প্রথম উদাহরণ হলো ইচ্ছার, আর দ্বিতীয় উদাহরণ হলো নিরুপায়ের।

---

[442] সূরা আল-তাকভীর, ২৫

[443] সূরা আল-ক্বাহাফ, ২৯

[444] সূরা ক্বাফ, ২৯

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا (فِيهِ) قَدْ رُقِمَ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ؛ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ؛ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ.

> **‘‘আর আমরা লাওহে মাহফুযে ঈমান রাখি, আরও ঈমান রাখি কলমের উপর। আর যা আল্লাহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তার সবকিছুতে। যা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তা যদি সকল সৃষ্ট জীব একত্রিত হয়েও রোধ করতে চায় তারা সেটা করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে, তাতে যে বিষয় সংঘটিত হবার কথা তিনি লিখেননি, সমস্ত সৃষ্ট জীব একত্রিত হয়েও তা ঘটাতে পারবে না। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিপিবদ্ধ হয়ে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। যা বান্দার নসীবে লেখা হয়নি, তা সে কখনই পাবে না আর যা বান্দার নসীবে লেখা আছে, তা কখনই বাদ পড়বে না।’**

وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ، وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ، وَالِاعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان:2]، وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب:38]. فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا، وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا.

‘‘বান্দার একথা জেনে রাখা উচিত যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব হতে অবহিত রয়েছেন। অতএব, তিনি সেটাকে অকাট্য ও অবিচল তাকদীর হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। আসমান ও যমীনের কোনো মাখলুক এটাকে বানচালকারী অথবা এর বিরোধিতাকারী নেই, অনুরূপ একে কেউ অপসারণ অথবা পরিবর্তন করতে পারবে না, একে সংকোচন কিংবা পরিবর্ধনও করতে পারবে না।

আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দৃঢ়তা, মারেফাতের মূলবস্তু এবং আল্লাহ তা‘আলার ওয়াহদানিয়াত ও রবুবিয়্যাত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন,

وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗ

‘‘তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ অনুপাত অনুসারে পরিমিতি প্রদান করেছেন।’’[445]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র বলেছেন,

وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا

‘‘আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।’’ সূরা আল-আহযাব,৩৮

‘অতএব, ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য যে ব্যক্তি তাক্বদীর সম্পর্কে আল্লাহর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছে এবং রোগগ্রস্ত অন্তর নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই সে স্বীয় ধারণা অনুসারে গায়েবের একটি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে এবং এ সম্পর্কে সে যা মন্তব্য করেছে তার ফলে সে মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীতে পরিণত হয়েছে’’

وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ. وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ.

‘‘আর ‘আরশ এবং কুরসী সত্য। আর আল্লাহ তা‘আলা ‘আরশ ও অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী।’’

---

[445] সূরা আল-ফুরকান,৩

مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ.

> ''তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুরই উর্ধ্বে। সৃষ্টিজগত তাঁকে পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে অক্ষম।''

وَنقُولُ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا.

> ''আমরা আরও বলি যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং মূসা আলাইহিস সালাম এর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন।(আমরা একথা বলি) এর প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে, এর সত্যতা স্বীকার করে এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে''

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন,

وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ.

> **''আর আমরা আল্লাহর ফিরিশতাগণ, নবীগণ ও রাসূলগণের ওপর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান রাখি এবং আমরা আরও সাক্ষ্য প্রদান করি যে, তারা প্রকাশ্য সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।''**

দরসুল আকিদা

- **ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান**
- **পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান**

(الإيمان بالملائكة)

ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান

একবচন الملك বহুবচন الملائكة [আল-মালা‘ঈকা] অর্থ. Angels ফেরেস্তা।

ঈমান বিল-গাইব (الإيمان بالغيب) তথা না দেখা বিষয়সমূহের ওপর ঈমানের এর অন্তর্ভুক্ত হলো: ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করা। এটি ঈমানের অন্যতম রুকন।

ফেরেশতাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউ জানে না।

ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে

1. ফেরেশ্তাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন-সুন্নাহে নাম জানা ফেরেশতা যেমন জিবরীল আ.; তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। এবং যাদের নাম জানিনা তাঁদের প্রতি মুজমাল তথা সংক্ষিপ্তাকারে ওভারাল ঈমান রাখা।

2. ফেরেশ্তাগণের যে গুণসমূহ আমরা জানি তা বিশ্বাস করা।

3. আমাদের জানামতে আল্লাহর আদেশে তাঁরা যে সকল কাজ করেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখা। যেমন: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করা, ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়া দিন রাত্রি তাঁর ইবাদাত করা।

১. ফেরেশ্তাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা।

দলীল

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণেই ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আল কোরান ও মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী কুফরি।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ,

آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

‘রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল,

কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল'[446]

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে'[447]

তাঁরাও আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি-মাখলুক এবং আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ্ তাঁদেরকে যা আদেশ করেন অবাধ্য না হয়ে তাঁরা তা সাথে সাথে পালন করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

বরং ফেরেশ্তাগণ তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারেন না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করেন।[448]

ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে জিবরিলে এসেছে। 'ঈমান কি?' জিবরীল আলাইহিস সালামের এ প্রশ্নের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخروتؤمن بالقدر خيره وشره

'তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করবে।'[449]

খ- ফেরেশ্তাগণের গুণাবলী:

সৃষ্টিগত গুণের মধ্যে রয়েছে যা আল্লাহর রাসূল (সা.) উল্লেখ করেছেন: তাঁরা নূরের তৈরী, রাসূল (সা.) বলেছেন:

---

446 সূরা আর বাকারা. ২৮৫

447 সূরা আন-নিসা ১৩৬

448 সূরা আম্বিয়া. ২৬-২৭

449 বুখারি ও মুসলিম

309- দরসুল আকিদা

خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ

ফেরেশ্‌তাগণকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[450]

আল্লাহতায়ালা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশ্‌তাগণকে বিভিন্ন সংখ্যক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টি মধ্যে যা ইচছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম।[451]

রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল আ. কে ছয়শত পাখাসহ দেখেছেন।[452]

আল্লাহর শক্তিতে ফেরেশ্‌তাগণ কখনো মানুষের রুপে পরিবর্তিত হয়ে থাকেন। যেমন, মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) এর নিকটে আল্লাহ্‌ তায়ালা জিবরীল আ. কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ইবরাহীম ও লুত্ব আলাইহিমাস্‌ সালামের নিকটে ফেরেশ্তাগণকেমানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন।

ফেরেশ্‌তাগণ অদৃশ্য জগত (তাঁদেরকে দেখা যায় না) তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর ইবাদাত করেন। পালনকর্তা বা মা'বূদ হওয়ার কোন যোগ্যতা তাঁদের মাঝে নেই। বরং তাঁরাই আল্লাহর বান্দা এবং সর্বদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করছেন যেমন আল্লাহ বলেন:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

তারা (ফেরেশ্‌তাগণ) আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করেন।[453]

---

[450] সহীহ্‌ মুসলিম, ১৪/২৭৩

[451] সূরা আল ফাত্বির ১

[452] বুখারী ও মুসলিম।

[453] সূরা আত তাহরীম 6

গ- ফেরেশ্‌তাগণের প্রকার ও কাজ

কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার মাখলুকের দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পাহাড়ের দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। সে শুক্রবিন্দু থেকে শুরু করে শিশুর গঠন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে। বান্দা যেই আমল করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মহা শুণ্যের গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। তারা তা ঘুরান ও পরিচালনা করেন। চন্দ্র-সূর্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন জ্বালানো, জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়া এবং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। জান্নাত, জান্নাতের পরিচালনা, তাতে বৃক্ষাদি লাগানো এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত স্থাপন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহর সর্বাধিক বড় সৈনিক। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন,

জিবরীল আ. তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর রাসূলগণের নিকটে ওহী নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রাপ্ত।

বৃষ্টি ও তা পরিচালনার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মীকাঈল আ.

সিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা হলেন ইসরাফীল আ.

আত্মাসমূহ কবজের দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মালাকুল মাওত হযরত আজরাঈল আ. ও তাঁর সহযোগী বৃন্দ।

কিরামান কাতেবীন: যারা মানুষের কর্মের হিসাব রাখেন, ডান দিকের ফেরেশতাগণ ভালো কাজের আর বাম দিকের ফেরেশতাগণ খারাপ কাজের হিসাব রাখেন।[454]

---

[454] শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেতীয়া ঈমানের রুকনসমূহ ডঃ সালেহ ফাওযান

ইসলামী আক্বিদায়; পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ

সূচী

- পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে ইসলামি আক্বিদা
- তাওরাত-ইনজিলের শুদ্ধতা যাচাইয়ের মানদন্ড
- তাওরাত- ইনজিল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ (কুরআন থেকে)
- তাওরাত- ইনজিল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ (বাইবেল থেকে)
- কুরআন দিয়ে বর্তমান ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা দাবি!!
- বর্তমান তাওরাত-ইনজিলের ব্যাপারে একটি মূলনীতি

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে প্রধান দুটি আক্বিদা

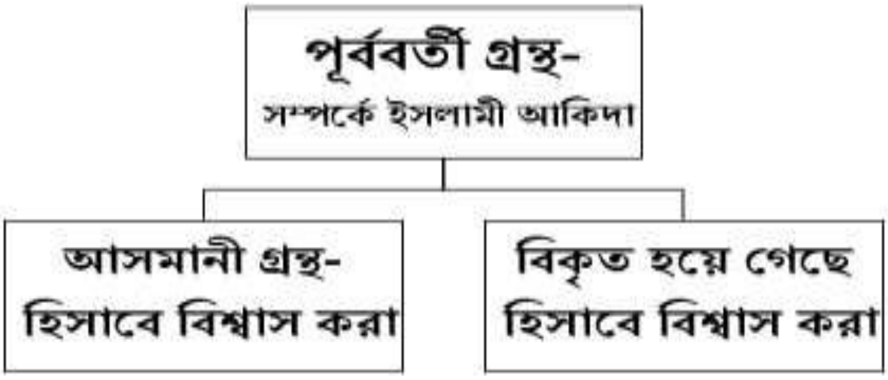

আসমানী গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাস করা

দলীল

পুর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের উপর বিশ্বাস করা আরকানুল ইসলাম একটি

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি ***এবং (আমরা বিশ্বাস করি) মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর।*** আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা মুসলিম (তাঁরই আনুগত্যকারী।)[455]

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, ***তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি।*** তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে,

---

[455] বাক্বারা ১৩৬

আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[456]

মোটকথা আমরা বিশ্বাস করি সেই তাওরাত যা আল্লাহ সুব. প্রদান করেছিলেন নবী মুসা আ. এবং আমরা বিশ্বাস করি সেই ইন্জিল যা দেয়া হয়েছিলো হযরত ঈসা আ. কে.

তাওরাত-ইন্জিল বনাম বর্তমান তথাকথিত তাওরাত-ইন্জিল (বাইবেল)

তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনসহ নবীদের প্রতি নাযিলকৃত সকল কিতাব ওহী। সবই আল্লাহ তাআলার কালাম। তবে ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনে কারীম ছাড়া অন্য সকল আসমানি কিতাব বিকৃতির শিকার হয়েছে। কোনোটিই তার মূল অবস্থায় বাকি থাকেনি। তাই আমাদের ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার যে, আসমানি কিতাব তাওরাত বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের পুরনো নিয়মের প্রথম পাঁচ পুস্তক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, গণনাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ অথবা অন্য শব্দে পয়দায়েশ, হিজরত, লেবীয়, শুমারী ও দ্বিতীয় বিবরণ) নয়; বরং ***তাওরাত হচ্ছে সেই কিতাব, যা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দান করেছেন। যবুর কিতাবও বাইবেলের পুরনো নিয়মের 'সামসঙ্গীত' বা 'গীতসংহিতা' নয়; বরং আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তা হচ্ছে যবুর শরীফ। তেমনি আসমানি কিতাব ইঞ্জিল বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়ম কিংবা নতুন নিয়মের প্রথম চারটি কিতাব (মথি সুসমাচার, মার্ক সুসমাচার, লূক সুসমাচার ও যোহন সুসমাচার) নয়; বরং ইঞ্জিল সেই কিতাব, যা আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা ইবনে মাঁইয়ামকে ওহীর মাধ্যমে দান করেছেন*** এবং ঈসা আলাইহিস সালাম তা বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রচার করেছেন। মোদ্দাকথা, বাইবেলের পুরনো নিয়ম ও নতুন নিয়ম (প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ)-এর কোনো গ্রন্থই ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত গ্রন্থ নয়। এগুলো পরবর্তীদের রচনা। কিন্তু এ রচনাগুলোর

---

[456] বাক্বারা ২৮৫

মূলকপিও খ্রিস্টানদের কাছে সংরক্ষিত নেই। এগুলোর রচয়িতা কে বা কারা, তাও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। বাইবেলের গ্রন্থগুলোর রচয়িতাদের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের যেসব আলোচনা তাদের ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের কিতাবাদিতে পাওয়া যায় তার সবটুকুই অনুমান ও ধারণাভিত্তিক-এ কথা খোদ খ্রিস্টান পণ্ডিত ও গবেষকগণও স্বীকার করেন। প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফের লেখকগণ কেউ ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারী ছিলেন না। তা ছাড়া এ গ্রন্থগুলো যাদের বলে দাবি করা হয় তাদের পর্যন্তও কোনো ‘মুত্তাসিল সনদ’ বা অবিচ্ছিন্ন-সূত্র খ্রিস্টানদের কাছে বিদ্যমান নেই।

বিকৃত হয়ে গেছে হিসাবে বিশ্বাস করা

তাওরাত- ইন্জিল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ (কুরআন থেকে)

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন যে, কিতাবীরা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে।

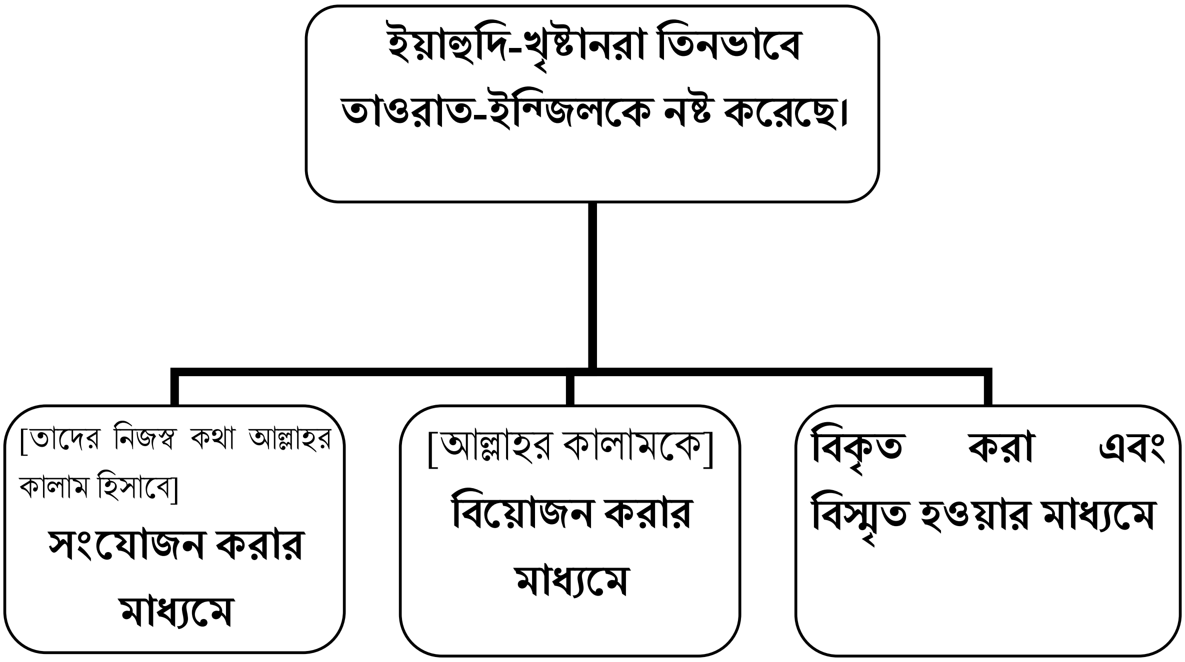

সংযোজন করার মাধ্যমে

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।[457]

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে।[458]

বিয়োজন করার মাধ্যমে

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا

‘আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল ? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানব মন্ডলীর জন্যে হোদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না।[459]

---

457 বাকারা ৭৯

458 আল-ইমরান ৭৮

459 আনআম 91

বিকৃত করা এবং বিস্মৃত হওয়ার মাধ্যমে

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ

(অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে (উপকার লাভ করার বিষয়টি) বিস্মৃত হয়েছে।[460]

(বাইবেল থেকে) বর্তমান তাওরাত-ইনজিল বিকৃতি হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমান

নবীর কিতাবে তাঁরই মৃত্যু ও কবরের গল্প!!

আমরা জানি যে, তাওরাত মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ। অথচ প্রচলিত তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪/৫-৬-৭ অধ্যায়ে মূসা (আ)-এর মৃত্যু, দাফন, কবর. তার উম্মাতের ত্রিশ দিন শোক পালন এবং যুগের আবর্তনের মূসার কবরটি হারিয়ে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

আর ইঞ্জিলের বিষয় তো আরো অদ্ভূত। আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ ঈসা (আ)-এর উপর ইঞ্জিল নাযিল করেন। ঈসা মাসীহ জীবদ্দশায় ইঞ্জিল প্রচার করেছেন কিন্তু প্রচলিত ইঞ্জিলগুলির সবগুলিতেই ঈসা মাসীহের মৃত্যু, কবর, কবর থেকে বের হওয়া.. (দেখুন. মথি ৪/২৩, ৯/৩৫, ১১/১৫; মার্ক ১/১৪, ১৫, ৮/৩৫; মার্ক ১০/২৯; লূক ৯/৬). ইত্যাদি বিবরণ বিদ্যমান। আল্লাহ মূসার (আ) কিতাবে তার মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলি এবং ঈসার (আ) কিতাবে তার মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলির বিবরণ নাযিল করেছিলেন?

---

[460] মায়িদা: ১৩, ১৪ ও ৪১

বাইবেল জাল হওয়া খোদ বাইবেলই স্বীকার করে-

কিতাবুল মোকাদ্দস প্রমাণ করে যে আল্লাহর কিতাবের জালিয়াতি হয়। ক্যাথলিকদের কিতাবুল মোকাদ্দসে বইয়ের সংখ্যা ৭৩; কিন্তু প্রটেস্ট্যান্টদের কিতাবুল মোকাদ্দসে বইয়ের সংখ্যা ৬৬। ৭টি বই-ই বেশি কম। উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান বইগুলির মধ্যেও আয়াত ও অধ্যায়ে অনেক বৈপরীত্য। আবার প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের কিং জেমস ভার্শন ও রিভাইযবড স্টান্ডার্ড ভার্শনের মধ্যে শতশত আয়াত ও হাজার হাজার শব্দের পার্থক্য। একটি সঠিক হলে অন্যটিকে জাল। অথবা সবগুলিই জাল।

‘ইঞ্জিল’ বনাম [According To]‘মতানুসারে ইঞ্জিল’

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের ২৭ টা বইয়ের মধ্যে মাত্র প্রথম চারটা বইকে খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিল বলে দাবি করেছেন। মূল গ্রিক বা ইংরেজি বাইবেলে এগুলোর নাম নিম্নরূপ:

- ❑ (১) The Gospel according To St. Matthew:

সাধু মথির মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল/ সাধু মথির মতানুসারে ইঞ্জিল।

- ❑ (২) The Gospel **According To** St. Mark:

সাধু মার্কের **মতানুসারে** ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল।

- ❑ (৩) The Gospel **According To** St. Luke:

সাধু লূকের **মতানুসারে** ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল।

- ❑ (8) The Gospel **According To** St. John:

সাধু যোহনের **মতানুসারে** ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল।

নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি পুস্তক লেখে তা ‘ইঞ্জিল’ বলে দাবি করেন, এজন্যই পুস্তকগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়। যীশুর তিরোধানের শতাধিক বছর পরে অনেক মানুষ ‘ইঞ্জিল’ লেখে প্রচার করতে শুরু করেন যে, এগুলো যীশুর ইঞ্জিল। এজন্য এগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়: ‘অমুকের মতানুসারে এটা ইঞ্জিল’।

সন্দেহজনক ইন্জিল (Apocryphal New Testament)

প্রায় অর্ধশত ‘মতানুসারে ইঞ্জিল’দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করে এ চারটাকে বাছাই করেন।

শতাধিক ইঞ্জিল, পত্র ও পুস্তক প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিষ্টানদের মধ্যে ‘ইঞ্জিল শরীফ’ ও ‘নতুন নিয়মের আসমানি পুস্তক’ হিসেবে প্রচলিত ছিল। তবে সেগুলো কোনো চার্চ স্বীকৃত ‘নতুন নিয়মের’ মধ্যে স্থান পায়নি। এগুলোকে নতুন নিয়মের গোপন, সন্দেহজনক বা জালপুস্তক (New Testament Apocrypha) অথবা সন্দেহজনক বা গোপন নতুন নিয়ম (Apocryphal New Testament) বলা হয়। এ বিষয়ে এনকার্টার Bible প্রবন্ধের The New Testament পরিচ্ছেদের precanonical writings অর্থাৎ ‘চার্চস্বীকৃত নতুন নিয়ম সৃষ্টির আগের লেখালেখি’ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

“The 27 books of the New Testament are only a fraction of the literary production of the Christian communities in their first three centuries. ··· As many as 50 Gospels were in circulation during this time.” “খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলো খ্রিষ্টীয় প্রথম তিন শতকে যা কিছু লেখেছিল ২৭টা পুস্তক হচ্ছে তার অতি সামান্য অংশ। ··· এ সময়ে প্রায় ৫০টা ইঞ্জিল প্রচলিত ছিল।”

এনকার্টার সন্দেহজনক নতুন নিয়ম (Apocryphal New Testament) প্রবন্ধে বলা হয়েছে: Apocryphal New Testament ··· title that refers to more than 100 books written by Christian authors between the 2nd and 4th centuries.“সন্দেহজনক নতুন নিয়ম..বলতে এক শতেরও অধিক পুস্তক বুঝানো হয় যেগুলো খ্রিষ্টান লেখকরা ২য় থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে লেখেছিলেন।”[461]

---

[461] উইকিপিডিয়ার The New Testament Apocrypha ও The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden. লিখে সার্চ করুন। অথবা

বিকৃতির ধারাবাহিকতা

বিকৃতি ও জালিয়াতির ধারা কুরআন নাযিলের পরেও অব্যাহত আছে। আপনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিগত ২০০ বৎসরের বাইবেলগুলি একত্রে অধ্যয়ন করলেই দেখবেন যে, প্রত্যেক সংস্করণেই অনেক পরিবর্তন। ভাষার পরিবর্তন নয়, বরং তথ্যের পরিবর্তন, বিকৃতি, এমনকি অনেক আয়াত বা শ্লোক পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর সময়ে ১৬১১ খৃস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় 'বাইবেলের' বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। এটিই অন্যান্য ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল ভিত্তি। এটি কিং জেমস ভার্শন (King James Version: KJV) এবং অথোরাইযড ভার্শন (Authorised Version: AV) নামে পরিচিত। ১৯৫২ খৃস্টাব্দে আমেরিকার ৩২ জন খৃস্টান ধর্মগুরু একত্রিত হয়ে কিং জেমস বাইবেলের ভুলভ্রান্তিদূর করে রিভাইযড স্টান্ডার্ড র্ভাশন (Revised Standerd Version) এখানে এ দুটি সংস্করণের মধ্যে বিদ্যমান কয়েকটি বিকৃতি-

<u>ইঞ্জিল থেকে ইচ্ছাকৃত বিয়োজন</u>

যীশু তার শিষ্যদেরকে কিয়ামত সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন বলে মথি, মার্ক ও লূক উল্লেখ করেছেন। মথির বর্ণনা অনুসারে এ প্রসঙ্গে যীশু বলেন: (মথি ২৪/৩৪-৩৬) "(৩৪) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। (৩৫) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩৬) কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের কথা কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" এ হলো অথোরাইযড ভার্শন বা কিং জেমস ভার্শন (AV/ KJV)-এর ভাষ্য (But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.)

আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, এখানে তিনটি শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছিল। শব্দগুলি নিম্নরূপ (neither the Son): "পুত্রও জানেন না" রিভাইযড স্টান্ডার্ড

---

http://www.biblestudytools.com/ Apocrypha/
এবং http://www.interfaith.org/christianity/ Apocrypha/

ভার্সন (RSV)-এ শব্দগুলি সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বাক্যাংশটুকু-সহ শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে: "কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"

এ কথা-সহ এ শ্লোকটি প্রমাণ করে যে, যীশু বা যীশুর মধ্যে বিদ্যমান "পুত্র" সত্বা ঈশ্বর ছিলেন না। এমনকি কিয়ামত কখন হবে সে জ্ঞানও তাঁর ছিল না। যীশুকে ঈশ্বর বলে যারা বিশ্বাস করেন তাদের জন্য কথাটি মেনে নেওয়া অসম্ভব। এজন্য বাইবেল লেখকগণ এ বাক্যাংশটুকু মুছে দিয়েছিলেন।

আরো মজার ব্যাপার হলো লূকের বাইবেল থেকে এ শ্লোকটি পুরোই ফেলে দেওয়া হয়েছে। লূক ২১/৩২-৩৪ নিম্নরূপ: "(৩২) আমি তোমাদেরকে সত্য বলিতেছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হইবে সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হইবে না। (৩৩) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩৪) কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপর আসিয়া পড়ে।"

<u>ইঞ্জিলের মধ্যে ইচ্ছাকৃত সংযোজন</u>

ত্রিত্ববাদ প্রমান করার জন্য

কিং জেমস ভার্শন অনুসারে (যোহনের প্রথম পত্রের ৫/৭-৮) নিম্নরূপ: "কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহারা তিন একই। এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই। (For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and the three are one. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.)"

এভাবে সহস্রাধিক বৎসর বাইবেল পাঠ করা হয়েছে। এখন খৃস্টান পণ্ডিতগণ একমত যে, একথাগুলি ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংযোজিত। এখানে মূল কথা ছিল "তিনজন সাক্ষী রয়েছেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনজনের সাক্ষ্য একই।"

ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বাইবেল লেখকগণ অতিরিক্ত কথাগুলি সংযোজন করেন। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শনের ভাষ্য নিম্নরূপ: There are three witnesses , the Spirit, the water and the blood; and these three agree. "বস্তুত তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।

ইঞ্জিলের মধ্যে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি

প্রেরিত ৩/১৩- কিং জেমস ভার্শনে নিম্নরূপ: (The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus...)

অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর আপনার (নিজের) পুত্র যীশুকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন..."

কিন্তু রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শনে কথাটি নিম্নরূপ: (…hath glorified his servant Jesus...) অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর আপনার বান্দা (নিজের গোলাম) যীশুকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন..."

অর্থাৎ ঈসা মাসীহ আল্লাহর বান্দা ছিলেন এ কথাটি গোপন করতে 'বান্দা' শব্দটি 'পুত্র' বানানো হয়েছিল। একইরূপ জালিয়াতি দেখুন প্রেরিত ৪/২৭। সেখানেও (thy holy servant Jesus: RSV) "তোমার পবিত্র দাস যীশু" কথাটি বিকৃত করে (thy holy child Jesus: KJV) "তোমার পবিত্র পুত্র যীশু" বানানো হয়েছিল

কুরআন দিয়ে বর্তমান ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা দাবি!!

খৃস্টান মিশনারীরা উপরের তথ্যগুলি গোপন করে মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিতে কুরআনের আয়াতের আংশিক বিকৃত অর্থ দিয়ে দাবি করেন যে, প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল সঠিক। আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না; যারা ঈমান আনে ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, আল্লাহ্‌র বাক্যাবলির কোনো পরিবর্তন নেই; ওটাই মহাসাফল্য।[462]

এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহর বন্ধুদের সুসংবাদ ও সাফল্যের বিষয়ে আল্লাহর বাক্য, বাণী বা বিধান কেউ পরিবর্তন করতে বা আল্লাহর বন্ধুদের ব্যর্থ করতে পারবে না। খৃস্টান প্রচারকগণ সকল কথা বাদ দিয়ে (লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ) 'আল্লাহর বাক্যবালির পরিবর্তন নেই' কথাটি দিয়ে দাবি করেন যে, তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি আল্লাহর কালাম, সেহেতু কেউ তা পরিবর্তন করতে পারবে না। অতএব প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আদি ও অকৃত্রিম আল্লাহর কালাম!

প্রতারণা ধরতে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

এখানে আল্লাহর কালেমা বা বাক্যের কথা বলা হয়েছে, আল্লাহর কিতাবের কথা বলা হয় নি। আল্লাহ যে কথা বলেন তা আল্লাহর বাক্য বা কালেমা। আর আল্লাহর কালামের লিখিত রূপ 'কিতাব' এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর বাক্য বা কথা পরিবর্তন হয় না; কারণ আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কিন্তু আল্লাহর কালামের লিখিত গ্রন্থ বিকৃত হয় না তা কখনোই আল্লাহ বলেন নি। বরং তিনি বারংবার বলেছেন যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ আল্লাহর কালামের লিখিত রূপ পরিবর্তন করেছে, অনেক কালাম ভুলে গিয়েছে বা হারিয়ে ফেলেছে এবং অনেক জাল বই লিখে আল্লাহর নামে চালিয়েছে।

তাওরাত-ইনজিলের শুদ্ধতা যাচাইয়ের মানদন্ড

এ সকল বিকৃতি ও জালিয়াতির পাশাপাশি এগুলির মধ্যে কিছু কিছু ভালোকথা বিদ্যমান। তবে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কোনো পথ নেই। এজন্য আল্লাহ কুরআনকে যাচাইয়ের মানদণ্ড করেছেন এবং এগুলির মূল শিক্ষা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত ও সংরক্ষিত করেছেন।

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ

---

462 ইউনূস: ৬২-৬৪

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।[463]

বর্তমান তাওরাত-ইনজিলের ব্যাপারে একটি মূলনীতি[464]

এ সকল পুস্তকের যে সকল কথা ও কাহিনীকে কুরআন সত্য বলেছে সেগুলি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। আমরা কোনো দ্বিধা ও আপত্তি ছাড়া সেগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করি। যেগুলিকে কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে সেগুলি নিঃসন্দেহে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত। আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই সেগুলিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করি। আর যেগুলি বিষয়ে কুরআন সত্য ও মিথ্যা কোনো প্রকারের কিছু না বলে চুপ থেকেছে, সেগুলির বিষয়ে আমরাও চুপ থাকি। আমরা সেগুলিকে সত্য বলেও গ্রহণ করি না, আবার সরাসরি মিথ্যাও বলি না।

আল-কুরআনুল কারীমই পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের নিয়ন্ত্রক, সংরক্ষক বা বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মাপকাঠি। কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যে যা কিছু সত্য রয়েছে তা প্রকাশ ও সমর্থন করে এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা প্রকাশ করে দেয় এবং তার প্রতিবাদ করে।

যে সকল মুসলিম আলিম প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা ও বিকৃতি প্রকাশ করেছেন, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে কলম ধরেন নি বা সেগুলিকে উদ্দেশ্য করে গ্রন্থ রচনা করেন নি। বরং তারা ‘‘পবিত্র বাইবেলের’’ পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান এ সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক পুস্তকগুলির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, যেগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা ও সংকলন করা হয়েছে এবং এরপর

---

463 সূরা মায়িদা: ৪৮

464 তাওরাত-ইনজিল ও ঈসায়ী ধর্মমত। ডা. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রাহি.

দাবি করা হয়েছে যে, এগুলি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পুস্তক।

মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত যে, আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে মূসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত তাওরাহ। আর আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে ঈসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত ইঞ্জিল। আর ‘‘পবিত্র বাইবেল’’-এর পুরাতন ও নতুন নিয়ম বা ‘‘তাওরাত শরীফ’’, ‘‘ইঞ্জিল শরীফ’’ বা ‘‘যাবূর শরীফ’’ নামে প্রচলিত পুস্তকগুলি কখনোই সেই তাওরাত, ইঞ্জিল বা যাবূর নয়।

কুরআনে উল্লিখিত মূসা আ. ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল যদি কেউ অস্বীকার করেন তবে তার ঈমান নষ্ট হবে। আর ‘‘পবিত্র বাইবেল’’ নামে বা তাওরাত বা ইঞ্জিল নামে বর্তমানে প্রচলিত, আল্লাহর বাণী নাম দিয়ে বা নবী-রাসূলগণের লেখা বলে প্রচারিত জাল ও মিথ্যা এ সকল মিথ্যা গল্প, কাহিনী ও বিবরণ অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাতে ঈমানী দায়িত্ব পালিত হবে। কারণ মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং নবী-রাসূলগণের পবিত্রতা ও নিষ্পাপত্বের সাথে সাংঘর্ষিক এ সকল মিথ্যা ও জাল গল্প, কাহিনী ও বিবরণগুলির মিথ্যাচার ও জালিয়াতি প্রকাশ করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

তাওরাতের প্রচলিত তিনটি সংস্করণ বা ভার্সনের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বৈপরীত্য। এগুলিতে রয়েছে অনেক ভুল ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু এবং মাওআব অঞ্চলে তার কবর দেওয়ার বিবরণ। আমরা নিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ বিশুদ্ধ তাওরাত নয়।

প্রচলিত চারটি ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্যেও রয়েছে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এগুলির মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য রয়েছে। এতে যীশুর ক্রুশারোহণ (খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে), ক্রুশে মৃত্যু, তার কবরস্থ করণ ইত্যাদি বিবরণ রয়েছে। আমরা সুনিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই ঈসা আ. -এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়।

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন,

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ.

''আমাদের ক্বিবলাকে (বায়তুল্লাহকে) যারা ক্বিবলা বলে স্বীকার করে আমরা তাদেরকে মুসলিম ও মু'মিন বলে আখ্যায়িত করি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা শরী'আতকে স্বীকার করে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে।''

وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ.

''আমরা আল্লাহর সত্ত্বা (জাত) সম্পর্কে অন্যায় গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না এবং তাঁর দীন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হই না।''

وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ .

''কুরআন সম্পর্কে আমরা কোনো তর্কে লিপ্ত হই না এবং সাক্ষ্য প্রদান করি যে, কুরআন বিশ্ব চরাচরের রবের কালাম (কথা) এটা নিয়ে জিবরীল আমীন অবতীর্ণ হয়েছেন অতঃপর তিনি তা সকল রাসূলদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেন। এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম (বাণী), কোনো সৃষ্টির কথা এর সমতুল্য নয়। আর আমরা একে সৃষ্ট বলি না এবং (এ ব্যাপারে) আমরা মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধাচরণ করি না।

وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ.

''কোনো গুনাহর কারণে কোনো আহলে ক্বিবলাকে (মুসলিমকে) কাফির বলে অভিহিত করি না; যতক্ষণ না সে উক্ত গুনাহকে হালাল (জায়েয) মনে করে''

وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.

''আর আমরা বলি না যে, ঈমান আনার পর কোনো গুনাহ্ করাতে ক্ষতি নেই।''

نَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نُقَنِّطُهُمْ .

''আমরা আশা করি যে, সৎকর্মশীল মু'মিনগণকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা তাদের সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়ে যাবো না, আর তাদেরকে জান্নাতী বলে ঘোষণাও দান করবো না। আর আমরা তাদের গুনাহসমূহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং আমরা তাদের জন্য আশংকা বোধ করব, কিন্তু আমরা তাদেরকে নিরাশ করব না।''

وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ .

''নিঃশঙ্ক ও নৈরাশ্যবোধ একজন মুসলিমকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। আহলে ক্বিবলার জন্য সত্য পথ তো এতদুভয়ের মাঝামাঝি থাকার মধ্যেই নিহিত।''

দরসুল আকিদা

সূচী

- তাকফীর এর পরিচয়
- তাকফীরের শর্ত
- তাকফীরের প্রতিবন্ধক
- ইসলামে তাকফীরী সম্প্রদায়
- খারেজীদের কিছু বিভ্রান্তি

তাকফীর এর পরিচয়

তাকফীর (التكفير) এবং *ইকফার* (الإكفار) অর্থ ''কাফির বানানো'' অর্থাৎ কাউকে কাফির বলা বা অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করা (to accuse of unbelief, charge with infidelity)

পরিভাষায়- যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বা বিশ্বাসী বলে দাবি করছেন তাকে অবিশ্বাসী বা কাফির বলে আখ্যা দেওয়াকে সাধারণভাবে ''তাকফীর'' বলা হয়।

ইমাম তাহাবী রাহি. বলেন-

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ... وَلا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ بِجُحُودِ مَا أَخَلَهُ فِيهِ.

''আমাদের কিবলাপন্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মু মিন'মুসলিম বলে আখ্যায়িত করব; যতক্ষণ তারা নবী যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য বলে সাক্ষ্য দিবে। ... আমাদের কিবলাপন্থী কোনো মুমিনকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফির বলি না, যতক্ষণ না সে এ পাপ হালাল মনে করবে।..যেসব বিষয় বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত করেছে, এমন কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গণ্ডি হতে বের হয় না।''

আহলে কিবলা প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, 'আহলে কিবলা' বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তাওহীদ, রিসালাত, আরকানুল ঈমান ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি মুসলিম উম্মার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন তবে তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হয় না। যেমন তাওহীদুর রুবূবিয়্যাত অস্বীকার করা, তাওহীদুল উলূহিয়্যাত অস্বীকার করা, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তাঁর শরীয়তের উর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা ইত্যাদি।

এরূপ অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কিবলামুখি হয়ে সালাত পড়েন বা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করেন তবুও তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হবে না। কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেন নি, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলামুখি হওয়া অর্থহীন।[465]

তাকফীরের শর্ত

ভূমিকা

শরয়ী দলিল প্রমাণের আলোকে ইমামরা অনেক কথা, কাজ ও আকিদা-বিশ্বাসকে কুফর সাব্যস্ত করেছেন। যেমন বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, অমুক কথা বলবে বা অমুক বিশ্বাস রাখবে সে কাফের' এ থেকে অনেকে মনে করেন, এসব কথা, কাজ বা আকিদার কোনোটাতে কেউ লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে। বাস্তবে কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। *একটি কাজ কুফর হলেই যে তাতে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে এবং তার ওপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করা হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও মাওয়ানে বা প্রতিবন্ধক রয়েছে।* সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাফের হওয়ার জন্য তার মাঝে শর্তগুলো পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া যেতে হবে এবং প্রতিবন্ধকগুলোর কোনোটা না থাকতে হবে। যদি শর্তগুলো পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়, পাশাপাশি প্রতিবন্ধকগুলোর কোনোটা না থাকে তখনই সে কাফের বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি শর্তগুলোর কোনো একটা না পাওয়া যায় কিংবা কোনো একটা প্রতিবন্ধকও থাকে তাহলে কুফরে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাফের হবে না।

যেমনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করা বা তার শানে কটুক্তি করা কুফর। যে ব্যক্তি এমন করবে সে কাফের। এটি সর্বসম্মত ফাতওয়া; কিন্তু নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি দেখুন

[465] মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৭-২৬২

ক) কাফেররা হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আটক করে শাস্তি দিতে শুরু করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করতে বাধ্য করে। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে মুখে এক-দুটি কুফরি কথা বলে ফেলেন। এতে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সব ঘটনা শুনান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা শুনে বললেন, ওরা যদি আবারও কখনও আটক করে তাহলে এভাবেই জীবন বাঁচিয়ে নিয়ো। এ ব্যাপারে একটি আয়াতও নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“*যারা ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করে এবং কুফরির জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয়, তাদের ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি তবে ওই ব্যক্তি ছাড়া যাকে কুফরি করতে বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপর অবিচল থাকে।*’[466]

এখানে ‘ইকরাহ’ (বাধ্য করা, জবরদস্তি করা) প্রতিবন্ধকটি বিদ্যমান থাকায় কুফর করার পরও ওই সাহাবী কাফের হননি।

খ) কা’ব বিন আশরাফের ঘটনা আমরা সকলেই জানি। তাকে হত্যার কৌশল হিসেবে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাসূলের শানে অবমাননামূলক কিছু কথা বলার অনুমতি চান। তিনি তাকে অনুমতি দেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি কিছু কুফরি কথা বলে কা’ব বিন আশরাফকে আশ্বস্ত করেন এরপর সুযোগ বুঝে হত্যা করেন। জিহাদের প্রয়োজনে এটি বৈধ। জিহাদের ব্যাপারটি ইকরাহের (জবরদস্তি করার) মতোই। এজন্যই কুফরি কথা বলার পরও কুফরের হুকুম বর্তায়নি। সারকথা হল, সব ধরনের কুফরের বেলায়ই; তা কথা হোক কিংবা কাজ- শর্ত ও মাওয়ানে [প্রতিবন্ধক] বিবেচনা করে কুফরের সিদ্ধান্ত দিতে হয়। অনুরূপভাবে কুরআন সুন্নাহয় অনেক পাপাচারীর ব্যাপারে ধমকি এসেছে যে, তারা জাহান্নামী। যেমন কোনো মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে

---

466 সূরা নাহল ১০৬

পলায়ন করা, যাকাত আদায় না করা ইত্যাদি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কেউ কোনো মুসলমানকে হত্যা করলেই সোজা জাহান্নামে চলে যাবে বা ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করলেই নিশ্চিত জাহান্নামি হবে। কোনো ভাবেই সে আর জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে না। না, ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এমনও হতে পারে, হত্যাকারী বা আত্মসাৎকারী পরবর্তীতে তাওবা করে ফেলবে, ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন কিংবা দুনিয়াতে নানান বিপদাপদ দিয়ে, মৃত্যুর সময় কষ্ট দিয়ে কিংবা কবরের আযাব দিয়ে তার সেই অপরাধের শাস্তি ক্ষমা করে দিবেন। পুনরুত্থানের পর তাকে কোনো শাস্তিই ভোগ করতে হবে না। সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

তাকফিরের বিষয়টিও এমনই। কেউ কুফর করলেই কাফের হয়ে যাবে, তার ওপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করতে হবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং তার ব্যাপারে শুরুতুত তাকফির-তাকফিরের সকল শর্ত এবং মাওয়ানিউত তাকফির-তাকফিরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো বিবেচনা করার পরই সিদ্ধান্ত দিতে হবে, সে কাফের হবে, কি হবে না?

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

قد ينقل عن أحدهم أنه كفّر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، ذلك له شروط وموانع

“কখনো কোনো ইমাম থেকে বর্ণিত হয়ে থাকে যে, তিনি কোনো কথার কারণে কাউকে তাকফির করেছেন। আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝানো যে, উক্ত কথাটি কুফর, যেন এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কুফরি কথা বললেই যে কেউ কাফের হয়ে যাবে, ব্যাপারটি এমন নয়। হতে পারে সে এ ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা তাবিলের (ব্যাখ্যার) আশ্রয় নিয়ে কথাটা বলেছে। নির্দিষ্ট ব্যক্তি কাফের সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটি আখেরাতে তার ওপর শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার মতোই। উভয়টির ক্ষেত্রেই কিছু শর্ত ও প্রতিবন্ধক রয়েছে।”[467]

---

[467] মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়াহ ৫/২৪০

তাকফীরের জন্য থাকা জরুরী
তাকফিরের শর্ত
البلوغ
বালেগ-প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া
العقل
সুস্থমস্তিস্ক সম্পন্ন হওয়া
الصحة
হুঁশ থাকা
الطوع
স্বেচ্ছায় করা
الاختيار
ভুলক্রমে না হওয়া
তাকফীরের জন্য
না থাকা জরুরী
তাকফিরের প্রতিবন্ধক
الإكراه
জবরদস্তি করা, বাধ্য করা
التأويل- তাবিল
কোন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া
الجهل
অজ্ঞতা

তাকফিরের শর্ত ও প্রতিবন্ধক

কারো কথা বা কাজে কুফর পাওয়া গেলে তাকে তাকফির করার জন্য তার মাঝে কিছু বিষয় থাকা জরুরি, আর কিছু বিষয় না থাকা জরুরি. যে বিষয়গুলো থাকা জরুরি ওগুলোকে বলা হয় ‘শুরুতুত তাকফির’ বা তাকফিরের শর্ত। তার মাঝে এই বিষয়গুলো পাওয়া গেলে তাকফির করা যাবে, না পাওয়া গেলে তাকফির করা যাবে না। আর যে বিষয়গুলো না থাকা জরুরি ওগুলোকে বলা হয় ‘মাওয়ানিউত তাকফির’ বা তাকফিরের প্রতিবন্ধক। এগুলোর কোনোটা পাওয়া গেলে, তাকফিরের সকল শর্ত পাওয়া গেলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির করা যাবে না। তাকফিরের উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো নিম্নরূপ

البلوغ- বালেগ-প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : অতএব অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন শিশুর কথা বা কাজে কুফর পাওয়া গেলে তার ওপর মুরতাদের শাস্তি আসবে না। হ্যাঁ, তাকে যথাযথ শাসন করা হবে, সেটি ভিন্ন কথা।

العقل- সুস্থমস্তিস্ক সম্পন্ন হওয়া : অতএব কোন পাগল কুফরি কথা বললে বা কুফরি কাজ করলে তার ওপর মুরতাদের শাস্তি আসবে না।

الصحة- হুঁশ থাকা : অতএব বেহুঁশ বা মাতাল অবস্থায় কেউ কুফর করলে কাফের হবে না।

الطوع- স্বেচ্ছায় করা : অতএব যদি ইকরাহ তথা জবরদস্তির মাধ্যমে কুফর করানো হয় তাহলে কুফর সাব্যস্ত হবে না।

الاختيار- ভুলক্রমে না হওয়া : অতএব যদি অন্য কোন কথা বলতে গিয়ে ভুলে মুখ থেকে কুফরি কথা বেরিয়ে যায় তাহলেও কাফের হবে না।

তাকফিরের উল্লেখযোগ্য মাওয়ানে’ বা প্রতিবন্ধকগুলো নিম্নরূপ,

الإكراه- জবরদস্তি করা, বাধ্য করা : অতএব কাউকে পিস্তল ঠেকিয়ে কুফরি কথা বলানো হলে ওই ব্যক্তি কাফের হবে না।

التأويل- তাবিল বা কোন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া: যেমন খারেজিরা ব্যাপকভাবে মুসলমানদেরকে মুরতাদ মনে করে এবং তাদের জান-মাল বৈধ মনে করে। কোন মুমিনকে কাফের মনে করা এবং তার জান-মাল বৈধ মনে করা যদিও কুফর, কিন্তু তারা যেহেতু শরীয়তেরই কিছু দলিলের তাবিল বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ আকিদা পোষণ করেছে-যদিও তাদের সেই ব্যাখ্যাটি ভুল- তাই তাদেরকে তাকফির করা হয় না। তবে তারা পথভ্রষ্ট হিসাবে বিবেচিত হবে।

الجهل-অজ্ঞতা: যেমন দারুল হরবে (কাফের রাষ্ট্রে) বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল। দারুল হরবে যেহেতু ইসলামের সকল বিধি বিধান সম্পর্কে জানার সুযোগ সাধারণত হয় না। তাই সেই নওমুসলিম যদি অজ্ঞতার কারণে কোন কুফরি কথা বলে ফেলে বা কুফরি কাজ করে ফেলে তাহলে এ কারণে সে কাফের হবে না।

উপরোক্ত শর্ত ও প্রতিবন্ধকগুলো ছাড়া তাকফিরের আরও বিভিন্ন শর্ত ও প্রতিবন্ধক আছে। প্রত্যেকটাতে আবার বিশদ ব্যাখ্যাও আছে। তাকফির করার সময় সবগুলোকে সামনে রাখা জরুরি।

ইসলামে তাকফীরী সম্প্রদায়

উম্মতে মুসলিমার মাঝে সর্বপ্রথম যে ফিতনা দেখা দিয়েছে তা হলো এই তাকফিরি ফিতনা। এ ফিতনার দ্বারাই উম্মতের মাঝে ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। খলিফায়ে রাশেদ হযরত উসমান রাযি.কে তাকফির ও হত্যার মাধ্যমে এ ফিতনার সূত্রপাত। সেই যে ফিতনা শুরু হল আর শেষ হয়নি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم

“গুনাহ ও নাফরমানির ভিত্তিতে মুসলিমদের তাকফির করা থেকে সাবধান থাকা জরুরি। কারণ, এটিই ইসলামের ইতিহাসে দেখা দেয়া সর্বপ্রথম বিদআত। ফলশ্রুতিতে তারা মুসলিমদের তাকফির করেছে এবং জান মাল বৈধ গণ্য করেছে।”[468]

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রকাশিত প্রথম বিভ্রান্তিগুলোর অন্যতম ছিল ‘‘তাকফীর’’ বা মুসলিমকে কাফির বলা। দ্বিতীয় হিজরী শতকে বিদ্যমান বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে মিল ছিল, তা হলো, নিজেদের ছাড়া অন্যান্য মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করা। এদের মধ্যে ‘‘খারিজী’’ ফিরকার আকীদার মূল ভিত্তিই ছিল ‘‘***তাকফীর’’তাকফিরের ক্ষেত্রে উগ্রপন্থা অবলম্বন করা খারেজি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য।*** ছোটখাট কারণে মুসলিমদেরকে তাকফির করে তাদের জান মাল বৈধ করে নেয়া এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা খারেজি শ্রেণীর কাজ। মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘদিন এ শ্রেণীর ফিতনা থেকে নিরাপদ ছিল। এ যুগে আবার এদের উদ্ভব ঘটেছে। এদের উগ্রতা আর বাড়বাড়ির কারণে কাফের, মুরতাদ এবং তাদের পোষ্য দরবারি আলেমরা সুযোগ পেয়ে গেছে। তারা ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম এবং জিহাদ মানেই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাত প্রমাণের অপচেষ্টার নতুন পথ পেয়েছে। খারেজী ফিরকা ছাড়াও অন্যান্য ফিরকা পাপের কারণে বা মতভেদীয় বিষয়ে ভিন্নমতের কারণে মুসলিমদেরকে ঢালাওভাবে কাফির বলতে থাকে।

---

[468] মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৩/৩১

খারেজিদের উল্লেখযোগ্য কিছু বিভ্রান্তি

এক. যারা তাদের আকিদায় বিশ্বাসী হবে না তারা কাফের।

দুই. খারেজিরা এমন কাজের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের কাফের ঘোষণা করে যার ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহর মতে মুসলিমদের কাফের ঘোষণা করা যায় না। অধিকাংশ খারেজিদের বিশ্বাস, কোন মুসলিম কবিরা গুনাহয় লিপ্ত হলে কাফের হয়ে যায়। বর্তমান যুগের খারেজিরা আরও এগিয়ে আছে, তারা কবিরা গুনাহ ছাড়াও সামান্য সামান্য বিষয়েই মুসলিমদের তাকফির করে বসে।

তিন. বর্তমানের অনেক খারেজি মনে করে দারুল হরবে বসবাসকারী সকল মুসলিম কাফের। আর দারুল হরব বলতে তারা বুঝায়, তাদের আয়ত্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সব রাষ্ট্র। এ যুগের খারেজিদের কেউ কেউ তো মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে আইডি কার্ড করলেও কাফের হয়ে যাবে বলে মনে করে।

চার. খারেজিরা নিজেদের জামাআতকে ইমান ও কুফরের মাপকাঠি বানায়। যারা তাদের জামাআতের অংশ নয় এমন সবাইকে তারা কাফের গণ্য করে। আবার অনেকে এমন সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং হত্যা করা জায়েজ মনে করে। অথবা মনে করে তাদের জামাআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরে আকবর

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন,

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ

> ‘কোনো মানুষ শুধু তা অস্বীকার করলেই ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে, যা স্বীকার করে সে তাতে প্রবেশ করেছে’

দরসুল আকিদা

কুফর-নিফাক্ব

সূচী

- কুফরের পরিচয়
- কুফরের প্রকারভেদ
- কুফরে আকবার রূপ/প্রকাশ
- কুফরে আসগার [ছোট কুফুরী] পরিচয়; উদাহরণ

কুফরের পরিচয়

আরবী ‘কুফর’ (كفر) শব্দটি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির মূল অর্থ ‘আবৃত করা’।

কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম ‘কুফর’ করেছেন। চাষীকে ‘কাফির’ (আবৃতকারী) বলা হয়, কারণ তিনি শষ্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে ‘কুফর’ বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে অবৃত করা। অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়।[469]

ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফর বা অবিশ্বাস। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় ‘কুফর’ বলে গণ্য। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার, ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে ‘ঈমান’ বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘কুফর’ বলে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর। তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় শিরিক বলা হয়।

কুফরের প্রকারভেদ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুফরকে দু ভাগে ভাগ করা হয়:

---

469 কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আক্বিদা-ডা. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রাহি. পৃষ্টা-১৬৩

কুফরে আকবার- বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস বঝানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে। এর পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তিভোগ।

আর কুফর আসগার- বলতে বুঝানো হয় কঠিন পাপসমূহকে যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, তবে এরূপ পাপে লিপ্ত মানুষদেরকে ইসলাম ত্যাগকারী বা প্রকৃত কাফির বলে গণ্য করা হয় না। তাদেরকে নামান্তর জাহান্নামবাসী বলেও বিশ্বাস করা হয় না। বরং তাদেরকে পাপী ও শাস্তিযোগ্য মুসলিম বলে গণ্য করা হয়। কুফর আসগারকে কুফর মাজাযী বা রূপক কুফরও বলা হয়।

কুফরে আকবার রূপ/প্রকাশ

কুরআনের আলোকে কুফর আকবার-এর নিম্নরূপ প্রকাশ রয়েছে:

বিস্তারিত বিবরণ,

❑ [কুফর উল ইনকার] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফুরী

এর দলীল আল্লাহর বাণী:

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓۚ أَلَيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لِّلۡكَٰفِرِينَ

'যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে, অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি এসব কাফিরের আবাস নয়?[470]

❑ [কুফর আল কিবার] মনে বিশ্বাস রেখেও অহংকারশত অস্বীকার করা

এর দলীল আল্লাহর বাণী:

وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

'যখন আমরা ফিরিশতাদের বললাম, আদমকে সাজদাহ কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল'।[471]

ফেরআউন ও অন্যান্য কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ সুব বলেন-

"তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!"[৪৭২]

❑ [কুফরু শাক্ক] সংশয়জনিত কুফুরী:

একে ধারণাজনিত কুফুরীও বলা হয় এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدٗا وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗا قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلٗا لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا

---

[470] সূরা আল-আনকাবূত ৬৮

[471] সূরা আল-বাকারাহ ৩৪

[472] নামল-১৪

"নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি আমার রবের কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়ই, তবে তো আমি নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব। তদুত্তরে তার সাথী তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু আল্লাহই আমার রব এবং আমি কাউকে আমার রবের সাথে শরীক করি না।" [473]

❑ **[কুফর উল ই'রাধ] উপেক্ষা প্রদর্শন ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কুফুরী:**

এর দলীল আল্লাহর বাণী:

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ

"আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[474]

❑ **[কুফর উল নিফাক] নিফাকী ও কপটতার কুফুরী-**

এর দলীল হলো:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ

"এটা এজন্যে যে, তারা ঈমান আনবার পর কুফুরী করেছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব, তারা বুঝে না"[475]

❑ **কুফর উল ইসতিহযাহা:** ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দরুন অবিশ্বাস।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াত এবং তার রাসুলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? কোনো অজুহাত পেশ করোনা। তোমরা ঈমান আনার পর অবিশ্বাস করেছো।"[476]

❑ **কুফর উল কুরহ:** আল্লাহর কোনো বিধানকে ঘৃণার দরুন অবিশ্বাস।

---

[473] সূরা কাহফ ৩৫-৩৮

[474] সূরা আল-আহকাফ ৩

[475] সূরা আল-মুনাফিকূন ৩

[476] সুরা তাওবা ৬৫-৬৬

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।"[477]

❑ কুফর উল ইসতিহাল ওয়াল ইসতাবদাল:

ইসতিহাল তথা হারামকে হালাল বানানোর দরুন অবিশ্বাস। কুরআন অথবা সুন্নাত দ্বারা, বিশেষত মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান অস্বীকার করাও একই পর্যায়ের কুফরী। সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির ফরয হওয়া অস্বীকার করা, ব্যভিচার, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হারাম হওয়া অস্বীকার করা, সালাতের, তাহারাত, রাক'আত, সময়, সাজদা, রুকু ইত্যাদির পদ্ধতি অস্বীকার, ব্যতিক্রম করা ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফর। তবে অজ্ঞতার কারণে অস্বীকার করলে তা ওযর বলে গণ্য হতে পারে। কোনো ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফর বলে গণ্য হবে না।

ইসতাবদাল তথা- আল্লাহর আইনকে বদল করার চেষ্টার দরুন অবিশ্বাস। এটি কয়েকভাবে হতে পারে। ক) অস্বীকার না করে আল্লাহর আইন (শরীয়তকে) প্রত্যাখ্যান করা। খ) আল্লাহর আইনকে অস্বীকার তথাপি প্রত্যাখ্যান করা। গ) আল্লাহর আইনকে মানুষের বানানো আইন দ্বারা বদল করা।

আল্লাহর নাযীলকৃত আইন রদবদল করা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ﴾

তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে **তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম।** নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।[478]

---

[477] সুরা মুহাম্মাদ ৮-৯

[478] নাহল-১১৬

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহুল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। **এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর,** যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [479]

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

বল, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছ?[480]

---

[479] তাওবা-৩৭

[480] ইউনুস- ৩৭

কুফুরের দ্বিতীয় প্রকার

কুফরে আসগার [ছোট কুফুরী]

এ প্রকারের কুফুরী মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত করে না। একে ‘আমলী কুফুরী’ ও বলা হয়। ছোট কুফুরী দ্বারা সেসব গোনাহের কাজকেই বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও সুন্নাহ’য় যাকে কুফুরী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের কুফুরী বড় কুফুরীর সমপর্যায়ের নয়। যেমন, আল্লাহর নি‘আমতের অকৃতজ্ঞতা ও কুফুরী করা যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗ يَأۡتِيهَا رِزۡقُهَا رَغَدٗا مِّن كُلِّ مَكَانٖ فَكَفَرَتۡ بِأَنۡعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ

“আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এমন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। তথায় প্রত্যেক স্থান হতে আসত প্রচুর রিযিক ও জীবিকা। অতঃপর সে জনপদের লোকেরা আল্লাহর নি‘আমতের প্রতি অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করল।”[481]

এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও এ ধরনের কুফুরীর অন্তর্গত। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

“কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ। আর তার সাথে যুদ্ধ করা কুফুরী”[482]

তিনি সা. আরো বলেন-

لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

“আমার পর তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে যেও না, যাতে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দিবে”[483]

গায়রুল্লাহর নামে কসমও এ কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

---

[481] সূরা আন-নাহল, ১১২

[482] সহীহ বুখারী ৪৮-সহীহ মুসলিম ৬৪

[483] সহীহ বুখারী ১২১ সহীহ মুসলিম ৬৫, ৬৬

345- দরসুল আকিদা

“যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করল, সে কুফুরী কিংবা শিরক করল”[484]

কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ মুমিন হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর নিহতদের ব্যাপারে ক্বিসাস গ্রহণ করা ফরয করা হয়েছে।”[485]

এখানে হত্যাকারীকে ঈমানদারদের দল থেকে বের করে দেওয়া হয় নি; বরং তাকে ক্বিসাসের অলী তথা ক্বিসাস গ্রহণকারীর ভাই হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ

“অতঃপর হত্যাকারীকে তার (নিহত) ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে (নিহতের ওয়ারিসগণ) প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং (হত্যাকারী) উত্তমভাবে তাকে তা প্রদান করবে।”[486]

নিঃসন্দেহে ‘ভাই’ দ্বারা এখানে দ্বীনী ভাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ

“মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই; অতএব, তোমরা তোমাদের দু’ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা কর”[487]

---

484 সুনান আবু দাউদ ৩২৫১

485 সূরা আল-বাকারাহ ১৭৮

486 সূরা আল-বাকারাহ, ১৭৮

487 সূরা আল-হুজুরাত ৯- ১০

তথ্যসুত্র-

কুফুরীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ [সালেহ আল ফাউযান হাফি. [Islam house]

কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আক্বিদা-[ডা. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রাহি.]

https://sunnahonline.com/library/beliefs-and-methodology/87-types-of-kufr-disbelief

Modern kufr

SECULARISM

সূচী

- Definition of Secularism [সংজ্ঞা]
- সেক্যুলারিজমের ভিত্তি
- History of Secularism
- ইসলামী আক্বিদায় সেক্যুলারিজম
- পরিশিষ্ট

১৮৫১ সালে ব্রিটিশ নাস্তিক লেখক George Jacob Holyoake (১৮১৭-১৯০৪) "Secularism" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।[488]

Definition of Secularism/ সংজ্ঞা

১) ক্যামব্রিজ অভিধানে বলা হয়েছে-

The belief that the religion should not be involved with the ordinary social and political activities of a country.

অর্থ্ঃ- সেকুলারিজম (তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থ) এই কথা বিশ্বাস করা যে, কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ইত্যাদির মধ্যে ধর্মকে জড়ানো অনুচিৎ।

২) অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে-

Secularism-(refers to) the belief that the religion should not be involved in the organization of society, education etc.

সেকুলারিজম (তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থ) এই কথা বিশ্বাস করা যে, কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে ধর্মকে জড়ানো অনুচিৎ।

3) Oxford Advanced Learner's অভিধানে বলা হয়েছে-

Secularization-(refers to) the process of removing the influence or power that religion has over something

ধর্মনিরপেক্ষকরণ (সেকুলারাইজেশন) হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা -কোনো কিছুর উপর ধর্মের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা-শক্তি রয়েছে; তাকে ক্রমাহ্বয়ে দূরীভূত করে দেয়।

4) **National Secular Society/secularism লিখেছে-**

The separation of religion and state is the foundation of secularism. It ensures that religious groups don't interfere in affairs of state, and makes sure the state doesn't interfere in religious affairs.

---

[488] Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Secularism

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল ভিত্তি হল ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন। ধর্মের অনুসারীরা যাতে রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং কোনো রাষ্ট্র যাতে ধর্মীয় বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সে বিষয়টি কে নিশ্চিত করে'[৪৮৯]

৫) বাংলা উইকিপিডিয়া-তে বলা হয়েছে-

"ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (ইংরেজিঃ Secularism) বলতে কিছু নির্দিষ্ট প্রথা বা প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। এক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না। ধর্মনরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে যাতে বলা হয় মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো, বিশেষত রাজনীতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নিভ্র্র করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার"। রাজনৈতিক ব্যবহারের দিক থেকে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে সাধারণ আইনজারি এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজম অর্থে উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যবহার করা হয় না। উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলিত ধারণা হল, নাগরিকদের ধর্ম থাকবে তবে রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না। "নিরপেক্ষ" শব্দের অর্থ কোনও পক্ষে নয়। "ধর্ম-নিরপেক্ষ" শব্দের অর্থ, কোন ধমের্র পক্ষে নয়। অর্থাৎ **সমস্ত ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন ঝবপঁষধরংস শব্দের আভিধানিক অর্থ একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ঠনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত**।[৪৯০]

[489] *[দেখুন: http://www.secularism.org.uk/what-is-secularism.html]*

[490] দেখুন: https://bn.wikipedia.org/wiki/ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

৬) বাংলাদেশ ‘বাংলা একাডেমীর ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারী’ বলছে,

Secular-(অর্থ) পার্থিব, ইহজাগতিকতা,জড়, জাগতিক। ঝবপঁষধৎ ঝঃধঃব **‘গীর্জার সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র’। এ অর্থ অনুযায়ী মুসলিম দেশে এর ব্যাখ্যা হবে মসজিদের সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র।** Secularism নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ নয়-এই মতবাদ। জাগতিকতা, ইহবাদ্ব।[৪৯১]

তারা কোনো রাখঢাক না করেই Secularism (সেকুলারিজম-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) শব্দটির সাফ সাফ অর্থটিই জানিয়ে দিয়েছেন। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়’ বা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে অস্বীকার করে না’ ইত্যকার সাইড ব্যাখ্যার অবতারনা করেনি।

অক্সফোর্ড ইংরেজী-উর্দু ডিকশনারীতে Secularism অর্থ লেখা আছে, لا دينية لا مذهبية (ধর্মমুক্ততা, ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ততা)।

[৪৯১] বাংলা একাডেমীর ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারী’, ২০১২ সালের সংস্করণ; জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদনায় প্রকাশিত

উপরোক্ত সবগুলি সংজ্ঞার সামারাইজেশন হলো

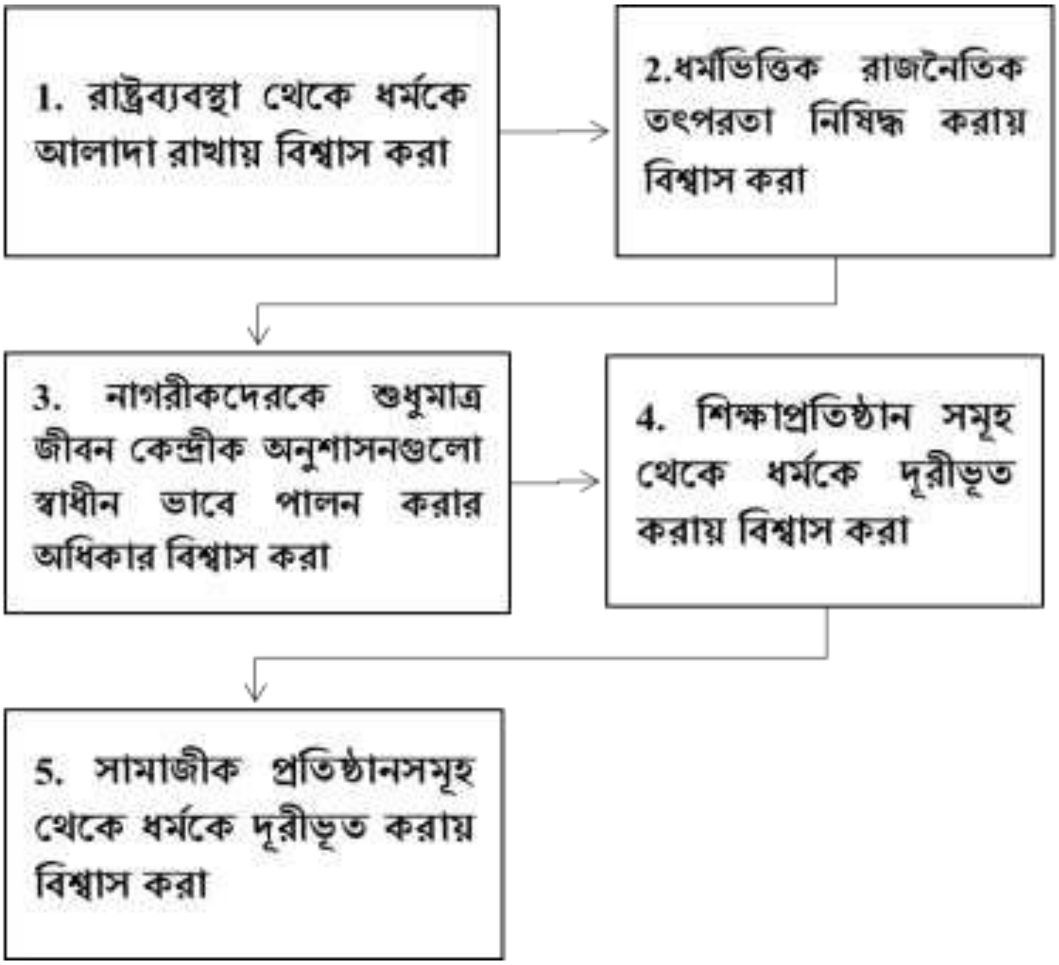

সেক্যুলারিজমের ভিত্তি

রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ধর্মকে আলাদা রাখায় বিশ্বাস করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সর্ব প্রধান শর্ত ও ভিত্তি। এর খোলাসা অর্থ হল, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস করে, রাষ্ট্রের মৌলিক চেতনা-বিশ্বাস ও সরকারের সার্বিক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আইনকানুনের প্রবেশ ১০০% নিষিদ্ধ থাকবে, যাতে রাষ্ট্রযন্ত্র ও ধর্ম; এ দু'টি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা থাকে; মানে ধর্মীয় আইনের আলোকে যাতে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে না পারে। এটাই হল Secular State (ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র)-এর মূল কথা।

351- দরসুল আকিদা

মৌলিকভাবে ৩টি বিভাগের সমন্বয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সরকার (Government) গঠিত হয় –

ক) ধর্মনিরপেক্ষ আইন বিভাগ (Secular Legislative Division)

খ) ধর্মনিরপেক্ষ নির্বাহী বিভাগ (Secular Executive Division)

গ) ধর্মনিরপেক্ষ বিচার বিভাগ (Secular Judicial Division)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উপরোক্ত এই ৩ টি বিভাগের প্রতিটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পদ ও পদের সার্বিক কার্যক্রমের মধ্যে বিশেষ কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আইনকানুনের প্রবেশকে ১০০% নিষিদ্ধ রাখাকে তার মূল ভিত্তি বলে বিশ্বাস করে, আর কেবল তবেই একটি ১০০% খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) গঠিত হওয়া সম্ভব।

ক) ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রণয়নী বিভাগ (Secular Legislative Division)

এই বিভাগের আওতায় থাকে আইনসভা (Parliament/Legislative Assembly) এর সদস্যরা রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার একক আইনানুগ অধিকারী কর্তা (Legislators) হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং নাগরীকদের জন্য সাংবিধানিক আইন রচনা করে থাকে। এই আইনসভা বাংলাদেশে ‘জাতীয়-সংসদ’ হিসেবে পরিচিত, আর এর সদস্যদেরকে বলা হয় সাংসদ।

ধর্মনিরপেক্ষকাবাদ বিশ্বাস করে, (ক) এই আইনসভার সদস্যরাই হবে দেশের সংবিধানিক আইন রচনার একমাত্র আইনানুগ অধিকারী কর্তা (Legislators), (খ) তারা সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিবিধানকে ১০০% দূরে রেখে শুধুমাত্র নিজেদের জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা খাটিয়ে দেশের নাগরীকদের জন্য আইন রচনা করবে, (গ) আইনসভার সদস্যরা যে আইন তৈরী করবে সেটাই হবে রাষ্ট্রের চুড়ান্ত আইন, যা সকল জনগণের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে এবং জনগণ শুধুমাত্র উক্ত সংবিধানকেই (ফরযে আইন হিসেবে) মানতে বাধ্য থাকবে, (ঘ) সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো ধর্মীয় আইন মানা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম) থাকবে, মানলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ (রাষ্ট্রিয় পাপ), এর বিরোধীতা (বাগাওয়াত্) করলে তা হবে কখনো কখনো রাষ্ট্রদ্রোহিতা,

যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত রয়েছে। এটাই হল ধর্মনিরপেক্ষ আইন-প্রণয়নী বিভাগ (Secular Legislative Division)-এর মূল চেহারা ও খাসলত।

খ) ধর্মনিরপেক্ষ নির্বাহী বিভাগ (Secular Executive Division) রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক (Administrative) কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্ব এই নির্বাহী বিভাগের উপর ন্যাস্ত থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান (দেশ ভেদে প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি) থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ব্যাক্তি ও তাদের স্ব-স্ব কার্যাবলি এই বিভাগের আওতায় রয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস করে, (ক) রাষ্ট্রের এই নির্বাহী বিভাগের সকল পদাধিকার, ক্ষমতায়ন ও কোনো পদের কার্যাবলি নির্ণয় ও প্রয়োগের প্রশ্নে যে কোনো ধর্মীয় বিধিবিধানকে ১০০% দূরে রাখা অত্যাবশ্যক শর্ত (ফরযে আইন) (খ) এক্ষেত্রে‘আইনসভা’র সদস্যদের দ্বারা রচিত সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো ধর্মীয় আইন মানা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম), মানলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ (পাপ), এর বিরোধীতা (বাগাওয়াত্) করলে তা হবে কখনো কখনো রাষ্ট্রদ্রোহিতা, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত রয়েছে। এটাই হল ধর্মনিরপেক্ষ আইন-প্রণয়নী বিভাগ (Secular Executive Division)-এর মূল চেহারা ও খাসলত

গ) ধর্মনিরপেক্ষ বিচার বিভাগ (Secular Judicial Division) এই বিভাগের দায়িত্ব হল আইনসভায় পাশ হওয়া সংবিধান অনুসারে দেশের নাগরীকদের বিচারকার্য সম্পাদন করা।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস করে, (ক) রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের আওতাধীন বিচারকের পদ ও পদায়ন সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রমের ভিত্তি হবে শুধুমাত্র ‘আইনসভা’র সদস্যদের দ্বারা রচিত সংবিধান; (খ) দেশের সকল বিচারকার্য পরিচালিত হবে শুধুমাত্র ‘আইনসভা’র সদস্যদের দ্বারা রচিত সংবিধানের আলোকে, (গ) ‘আইনসভা’র সদস্যদের দ্বারা রচিত সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো ধর্মীয় আইন মানা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (হারাম) থাকবে, মানলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ (পাপ), এর বিরোধীতা (বাগাওয়াত্) করলে তা হবে কখনো কখনো রাষ্ট্রদ্রোহিতা, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত রয়েছে। এটাই হল

353- দরসুল আকিদা

ধর্মনিরপেক্ষ বিচার বিভাগ (Secular Judicial System)-এর মূল চেহারা ও খাসলত।

[উপরোক্ত এই তিনটি বিভাগের আওতাধীন আরো অনেক শাখা-প্রশাখা (Branches) রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। বিস্তারিত জানার প্রয়োজন থাকলে আপনি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারী ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো নির্ভযোগ্য সূত্রে জেনে নিতে পারেন।]

মৌলিকভাবে সাধারণতঃ উপরোক্ত খাসলত ও চেহারা বিশিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রণয়নী বিভাগ, ধর্মনিরপেক্ষ নির্বাহী বিভাগ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিচার বিভাগ এই ৩ অংশের মিশ্রণেই গঠিত হয় বর্তমান জামানার একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার (Secular Government) অন্য কথায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State), আর এই ৩ অংগের যে কোনো পদ, পদাধিকার, পদায়ন বা ক্ষমতায়ন সহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলীর মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রবেশাধিকার ১০০% নিধিদ্ধ (হারাম) করায় বিশ্বাস করা একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মৌলিক শর্ত, যা ছাড়া কারো জন্য নিজকে খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে দাবী করা খোদ্ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথেই মিরজাফোরী করা। এজন্যই আপনি যদি নিজকে খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে দাবী করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে মিরজাফোরী করতে না চান, তাহলে আপনাকে অবশ্য অবশ্যই রাষ্ট্রের সরকারের এই ৩ টি অংগের প্রত্যেকটি থেকে ইসলামী শরীয়তের যে কোনো বিধানের প্রবেশকে ১০০% নিধিদ্ধ (হারাম) করায় বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক (ফরযে আইন)

আর এটাই হল উপরের সংগাগুলোতে কথিত the separation of religion and government (ধর্ম ও সরকারের মাঝে বিভাজন) অথবা Separation of religion and state (ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন)' বা the state should be separate from religion (রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা রাখা বাঞ্চনিয়') কিংবা The separation of religion and state is the foundation of secularism (ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন ই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল ভিত্তি) ইত্যাদির মূল কথা।

History of Secularism

1. ধর্মনিরপেক্ষতাটা বেশি দিন আগের পরিভাষা নয়। অনেক আগ থেকে তা শুরু হয়েছে এমন নয়। ফরাসী বিপ্লবের পরের ঘটনা এগুলো। বিপ্লবটা ১৭৮০/১৭৯০এর দিকের অর্থাৎ ১৮০০ এর কাছাকাছি সময়ের। ইসলামী খেলাফতের পতনের পরের ঘটনা। ইসলামী খেলাফত শেষ হওয়ার পর মুসলমানরা এসবের সম্মুখীন হয়েছে।

'ধর্ম থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থা পৃথক থাকতে হবে' এই ধারণাটি হঠাৎ করে কারও মনে আসে নি। এটা ইউরোপের একটা ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার ফল। ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস খুব ভয়ংকর, বলা হয়ে থাকে "অন্ধকারের যুগ" (Age of Darkness) তবে এই অন্ধকারের ইতিহাসটি শুধুমাত্র ইউরোপেরই ইতিহাস, সমগ্র পৃথিবীর নয়। যদিও বা সামাজিক বিজ্ঞান কিংবা পশ্চিমাদের ইতিহাসের বই পড়লে মনে হতে পারে পুরো পৃথিবী জুড়েই বোধহয় অন্ধকার যুগ বিরাজমান ছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপে ছিল চার্চভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। সমাজে প্রধানত তিন ধরণের লোক ছিল, চার্চের যাজক সম্প্রদায়, রাজা বা শাসক সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ। চার্চগুলো ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, এমনকি রাজাদেরকেও যাজকদের দেয়া কোন রায়ের সামনে মাথা পেতে মেনে নিতে হত। মধ্যযুগে খ্রিস্টান ধর্মের অনেক প্রচার-প্রসার হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যে, এর কারণ খ্রিস্টানিটির সত্যতা বা বৈধতা নয়, বরং খ্রিস্টানিটি এমন একটা ধর্ম যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের কে শাসক এবং যাজকদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করে।

খিস্টানিটি এমন একটা ধর্ম যেটা ইহুদিদের জন্য শুধুমাত্র কিছু কৃত্যানুষ্ঠান, খাদ্য এবং কিছু নৈতিক বিষয় সম্পর্কে সাধারণ আইডিয়া দেয় এর বেশি কিছু নয়। তাই, যাজক সম্প্রদায়ের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব ছিল না তারা খ্রিস্টানিটি দিয়ে শাসন করবে, কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, লেনদেন, চুক্তি, বিচার ব্যবস্থা, শাস্তির বিধান,সরকারের কাঠামো, জবাবদিহিতা- এই বিষগুলোর কোন কিছু নিয়ে কোন মতামত দেয়ার ক্ষমতা রাখে না, কারণ খ্রিস্টানিটিতে এসবের কিছুই বলা নেই। তাই যাজকরা তাদের মন মত শাসন করত, তদপুরি "ঈশ্বরের আইন", এই ব্যানারে তারা তাদের যেকোন অবিচারকে বৈধ করে ফেলত। তাই, ইউরোপে

শাসক, যাজক এবং ফিউডদের মধ্যকার স্বার্থ নিয়ে চরম প্রতিযোগিতা চলেছে দীর্ঘ সময় ধরে।
একসময় মানুষ বুঝতে পারল, চার্চগুলো দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যার উপরে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে তারা আবিষ্কার করল, বাইবেলের মধ্যে ভুরি ভুরি ভুল,শুধুমাত্র মানুষদের বোকা বানিয়ে এই চার্চগুলো টিকে আছে, তাই অনিবার্যভাবেই চার্চের সাথে ইউরোপিয়ান দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রুপ নিল। মানুষ দাবি করল সমাজ থেকে চার্চের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরুপে বাতিল করতে হবে। একসময় চার্চগুলো বুঝতে পারল, সংস্কার করা ছাড়া তারা সমাজে টিকে থাকতে পারবে না। এরপরেই সমাজের কর্তৃত্ব থেকে চার্চগুলোর কালো হাত সরে গেল এবং রাষ্ট্র একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে সার্বভোমত্ব লাভ করল, যেখানে মানুষ নিজের তার জন্য আইনগুলো তৈরি করবে, সেখানে ধর্মের কোন প্রভাব থাকবে না। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব এবং জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠল। এর একটা হল পুজিবাদ এবং আরেকটি সমাজতন্ত্র।
2. সুতরাং দেখাই যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব একটা বিশেষ অঞ্চলে, একটা বিশেষ সমস্যার জন্য সমাধান খুজতে গিয়ে ইউরোপেই এর আবির্ভাব, অন্য কোথায়ও নয়। এটা এক্সক্লুসিভলি ইউরোপিয়ান প্রোডাক্ট। এর জন্মের পিছনে একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক, ভূ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট আছে যেটা শুধু ইউরোপিয়ানদের ক্ষেত্রেই সত্য ছিল, অন্য কারও ক্ষেত্রে নয়। তাই, এটা absolute বা বিশ্বজনীন কোন আইডিয়া হতে পারে না, এটা একটি টাইম-স্পেসিফিক এবং প্লেস-স্পেসিফিক আইডিয়া।
3. ধর্মনিরপেক্ষতা যখন থেকে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে তখন কিন্তু অন্যান্য ধর্মওয়ালারা রাষ্ট্রের সাথে লড়াই করেছে এমন নয়। রাষ্ট্রের আইন নিয়ে তো তাদের কোনো মাথাব্যাথাই ছিল না। খ্রীষ্টানরা তো তাদের ধর্মকে চার্চকেন্দ্রিক করে ফেলেছে আগেই। অন্য ধর্মওয়ালারা এ নিয়ে কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি করে না। ইন্ডিয়ার উগ্রপন্থী বিজেপি কি কখনো দাবি উঠিয়েছে যে, গীতা, মহাভারত অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাতে হবে? খ্রীষ্টানরাও একথা বলেনি। কারণ তাদের নিকট ইসলামের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিগুলোই নেই। এই

অতুলনীয় ও সুমহান নীতি কেবল ইসলামেরই রয়েছে। সেক্যুলারিজম এসেছেই ইসলামকে প্রতিহত করার জন্য, স্রষ্টার আইনের বদলে নিজেদের মনমতো করে মানুষকে শাসন করার জন্য। সো এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট; রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখাই মুসলিম দেশে সেক্যুলারিজম ইমপোর্ট করার আসল উদ্দেশ্য। কেননা একমাত্র ইসলামের নীতিমালাই তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

4. মুসলিম শাসকদের ইসলামী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। গোটা পৃথিবীর অনেক অংশই যখন সভ্যতা বিবর্জিত ছিল ইসলামই তখন সভ্যতার রাস্তা দেখিয়েছে। সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে অন্য যে কোনো নীতি থেকে হাজারো গুণ ভালো তা ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছে। মূলত এটাই ছিল তাদের বাধা। এ কারণেই হয়তো সেক্যুলারিজমকে Anti Islam বলা হয়েছে। Anti Religion নয়। ধর্মবিরোধী নয়, আসলে ইসলাম বিরোধী। এই সত্যটাকে অনুধাবন করতে হবে। কারণ ধর্মের কথা তারাও বলে। তবে ওটা বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করা পর্যন্তই এবং ডলারের গায়ে In God we trust লিখে দেওয়া পর্যন্তই। অবশ্য এতটুকুতেই ওরা খুশি। এর বেশি দরকারও মনে করে না। তো সেক্যুলারিজম দরকারই হয়েছে ইসলামকে ঠেকানোর জন্য। এ কারণেই Anti Islam ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

5. সেকুলারিজম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ইউরোপিয়ান চিন্তাবিদরা একটা বড় ভুল করতে শুরু করল, তাদের মানবীয় সীমাবদ্ধতার কারণে। তারা সবকিছুকেই সেকুলারিজমের লেন্স থেকে দেখতে শুরু করল। যখনই কোন আইডিয়া যখন তাদের সংজ্ঞায়িত করা মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হল, তখনই তারা এটাকে “অযৌক্তিক”, “বানোয়াট”, “সেকেলে” বলে চালিয়ে দিতে লাগল। সব ধর্মকে তারা ভাবল সেই খ্রিস্টান ধর্মের মত করে, যার কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই এবং বাস্তবতার সাথে যার অনেকগুলো ব্যাপার সাংঘর্ষিক। তাই আজকে আমরা দেখি যখনই সমাজে ইসলামের আলোচনা উঠে আসে,তখনই তারা “medieval"(মধ্যযুগীয়) শব্দটা বলে ইসলামকে অস্বীকার

করে বসতে চায়, কারণ তাদের ডিকশনারিতে “modernity” (আধুনিকতা) শব্দটির একমাত্র প্রতিশব্দ সেকুলারিজম।

ইসলামী আক্বিদায় সেক্যুলারিজম

সেকুলারিজম মতবাদটি বিশ্বাস করলে তাওহীদ ফিল উলুহিয়্যাহ ও ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। তা কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র তাঁর নাজিলকৃত ইসলামী শরীয়ত (ইসলামী বিধিবিধান) মানাকে মুসলমানদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন এবং ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত সকল শরীয়তকে মানা হারাম করে দিয়েছেন,

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

‘অতঃপর (হে নবী মুহাম্মাদ!) আমি তোমাকে (আমার) নির্দেশিত একটি শরীয়তের উপর স্থাপন করেছি। অতএব তুমি তার অনুসরণ করে চলো এবং যারা (এই শরীয়ত সম্পর্কে) জানে না তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না’।[492]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وان احكم بينهم بما انزل الله

‘‘আর তাদের মাঝে আপনি ফয়সালা করুন ঐ আইন দ্বারা, যা আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন।’’[493]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

‘(হে মুমিনগণ!) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে (নবী মুহাম্মাদের উপর) তোমাদের জন্য (শরীয়ত হিসেবে) যা নাজিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুগত্য করে চলো। আর তাঁকে বাদ দিয়ে (অন্য এমন অন্য কোনো) অভিভাবকের অনুগত্য-অনুসরণ করো না (যারা এই শরীয়ত বহির্ভূত অন্য কোনো শরীয়তের কথা বলে)’[494]

---

492 সূরা জাসিয়া ১৮

493 সূরা মায়েদা :৪৯

494 সূরা আ’রাফ ৩

মুসলিম হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামে প্রবেশ করা আবশ্যক; তা *ইবাদাত বা ব্যাক্তিজীবন, পারিবারিকজীবন, সামাজিক বা রাষ্ট্রিয়জীবনই* যে কোনটির ক্ষেত্রে হোক না কেনো।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।"[495]

ইবন কাসীর (রহ.) এ-আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রা.) এ-আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ-আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন,

ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تَدَعوا منها شيئًا

"তোমরা পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বীনের সমস্ত আইনের আনুগত্য কর এবং সেখান থেকে কোনো কিছুই পরিত্যাগ করো না।"

এই আয়াতের তাফসীরে মুফতি শাফী (রহ.) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও এবাদতের সঙ্গেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সঙ্গেই হোক অথবা রাজনীতির সঙ্গেই হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সঙ্গেই হোক কিংবা শিল্পের সঙ্গে; ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা সবাই তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। [496]

ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে যারা নিজের খেয়ালখুশি মতো ইসলামের বিধি-বিধানসমূহকে আংশিকভাবে পালন করতে চায়, যারা নিজের খেয়ালখুশি মতো কুরআনের কিছু বিধান মানবে আর কিছু বিধান মানবে না; তাদেরকে আল্লাহ কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এই বলে যে,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِى ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ

---

495 সূরা বাকারা: ২০৮

496 মা'আরেফুল কুরআন

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন এরা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।"[497]

পরিশিষ্ট

মোটকথা এই মতবাদ মানলে শরীয়তের বড় একটা অংশকে অস্বীকার করে দিতে হয়। তাই আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গভীর থেকে দেখতে হবে তাহলে এর ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ভাসাভাসা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই। এর ক্ষতিটা যে কত গভীর ও ব্যাপক হতে পারে তা অনুধাবন করা `মুসলিম হিসাবে থাকার` জন্য কর্তব্য। আর সেক্যুলারিজম এমন কোনো বিষয় নয় যে, তার অসারতা সম্পর্কে জবাব দিতে হলে মাটি খুড়ে বের করে দলিল দিতে হবে। বরং শরীয়তের বিষয়গুলো হল- সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। এখানে অস্পষ্টতা বা অন্ধকারের স্থান নেই। ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে আইন-আদালত, রাষ্ট্রনীতি সব কিছুই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। কিন্তু এখন ভাবটা এমন যে, নামায, রোযা ইত্যাদি মানুষকে তাদের ধর্ম মতো করতে দাও। -আর রাষ্ট্র ও আদালত পরিচালিত হবে মানবরচিত আইনে। সুতরাং কুরআনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য থাকুক বা না থাকুক।

মনে রাখতে হবে! ইসলাম কয়েকটি রিচুয়াল বা আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, এটা আক্ষরিক অর্থেই একটা জীবন ব্যবস্থা। একটা মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে পরিচালিত করবে সেটা থেকে শুরু করে কিভাবে রাষ্ট্র চালাতে হবে তার সবকিছুই ইসলামে পাওয়া যায়। আপনি পুরো কুরআন মজীদ, বিশেষ করে মাদানী সূরাগুলো মনোযোগ দিয়ে অর্থসহ পড়ুন এবং লক্ষ্য করুন তাতে নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদির বাইরে অন্যান্য বিষয়ের আরো কত আয়াত রয়েছে। হাদীসগ্রন্থগুলোতে ইবাদাত অধ্যায়গুলোর তুলনায় পরিবারনীতি, সমাজনীতি, বিচারনীতি, লেনদেন পদ্ধতি, কৃষি-সেচ ইত্যাদি অধ্যায়গুলোর হাদীস সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব করুন তাহলে দেখবেন দ্বিতীয় অংশের হাদীসের সংখ্যা কত বেশি। সেক্যুলারিজম

---
[497] সূরা বাকারা : ৮৫

মানতে হলে আপনাকে ঐসব কিছুই এখন রহিত হয়ে গেছে-ঘোষণা করতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

অথবা যে ব্যক্তি ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শে বিশ্বাসী তাকে যদি কোনো সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিচারক বা কাযী নিযুক্ত করা হয় তার ধর্ম কি তাকে শরীয়তের বাইরে গিয়ে কোনো বিচার করার সুযোগ দিবে? তখন তো তিনি অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের জেরার মুখে পড়বেন। তিনি কি বলতে পারবেন যে, এই আয়াত ঐ সন পর্যন্ত, ঐ প্রজন্মের জন্য ছিল? এ রকম করলে সবই ছেড়ে দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব হল হুদূদ-কিসাস কার্যকর করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেক্যুলার হওয়ার কারণে তাকে কিতাবুল হুদূদের হাদীসগুলোতে, সূরা নূরের আয়াতসমূহে টীকা লাগিয়ে দিতে হবে যে, এগুলো প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। তাই সেক্যুলারিজম নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। দৃঢ়তার সাথে বুঝতে হবে যে, এটা সম্পূর্ণ লা দ্বীনী ও Anti Islam নীতি।

আল্লাহ আমাদেরকে এসব মডার্ন ফিতনা থেকে আমাদের ইমান-আক্বিদাকে হেফাযত করুন

দরসুল আকিদা

নিফাক্ব

সূচী

- নিফাকের পরিচয়
- নিফাকের বিষয়ে সালাফদের এওয়ারনেস-
- নিফাকীর প্রকারভেদ
- বড় নিফাকী ও ছোট নিফাকীর মধ্যে পার্থক্য
- কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকদের কিছু চরিত্র

নিফাকের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ

আভিধানিকভাবে নিফাক শব্দটি نافق ক্রিয়ার মাসদার বা মূলধাতু। বলা হয়- نَافَقَ، يُنَافِقُ، نِفَاقًا وَمُنَافَقَةً শব্দটি النَافِقَاء থেকে গৃহীত যার অর্থ ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর গর্তের অনেকগুলো মুখের একটি মুখ। তাকে কোনো এক মুখ দিয়ে খোঁজা হলে অন্য মুখ দিয়ে সে বের হয়ে যায়।

এও বলা হয়ে থাকে যে, নিফাক শব্দটি نفقٌ থেকে গৃহীত যার অর্থ- সেই সুড়ঙ্গ পথ যাতে লুকিয়ে থাকা যায়।

শরী'আতের পরিভাষায় নিফাকীর অর্থ হলো- ভেতরে কুফুরী ও খারাবী লুকিয়ে রেখে বাহিরে ইসলাম যাহির করা। একে নিফাক নামকরণের কারণ হলো সে এক দরজা দিয়ে শরী'আতে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়।

নিফাকের বিষয়ে সালাফদের এওয়ারনেস

আমাদেরকে নিফাককে কঠিনভাবে ভয় করতে হবে। আমরা যাতে আমাদের মনের অজান্তে নেফাকের মধ্যে নিপতিত না হই সেদিকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে নিফাক অত্যন্ত খারাপ গুণ যা একজন মানুষের সামাজিক মর্যাদা থেকে নিয়ে সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেয়। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানকে ধ্বংস করে দেয়। সমাজে সে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়।

সাহাবীগণ এবং তাদের পর সালফে সালেহীনরা নিফাককে কঠিন ভয় করতেন

- ❑ আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন সালাতে তাশাহহুদ পড়ে শেষ করতেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট নিফাক হতে পরিত্রাণ কামনা করতেন এবং তিনি বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করত। তার অবস্থা দেখে একজন সাহাবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟، فقال دعنا عنك، فو الله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيُخلع منه

"কি ব্যাপার হে আবু দারদা! তুমি নিফাককে এত ভয় কর কেন? তখন সে বলল, আমাকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, একজন

লোক মুহূর্তের মধ্যেই তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। ফলে সে দীন হতে বের হয়ে যায়’’[498]

- হানযালা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিফাককে ভয় করার ঘটনা আমাদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। তিনি নিজেই তার ঘটনার বর্ণনা দেন।

لقيَنِي أبو بكر فقال كيف :أنت يا حنظلة؟ قال قلت يذكّرنا بالنار والجنة حتى كأنّا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا .قال أبو بكر :فو الله، إنا لنلقى مثل هذا .فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله قلت :نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَاكَ ؟ قلت :يا رسول الله، نكون عندك تذكّرنا بالنار والجنة حتى كأنّا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وَالَّذِي نَفْسي بيِدِهِ، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ عِنْدِي، وَفي الذِّكْر، لَصافَحتْكُمُ الملائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُم وَفي طُرُقِكُم، لَكنِ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً

‘‘একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে আমার সাক্ষাত হলে, সে আমাকে বলে, হে হানযালা তুমি কেমন আছ? আমি উত্তরে তাকে বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! আমার কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলল, সুবহানাল্লাহ! তুমি কি বল? তখন আমি বললাম, আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে থাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জান্নাত ও জাহান্নামের কথা আলোচনা করে তখন আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নামকে দেখতে পাই। আর যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হই, তখন আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমাদের অবস্থাও তোমার মতোই। তারপর আমি ও আবু বকর উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে

---

[498] সীয়ারে আ-লামুন নুবালা ৬/৩৮২

উপস্থিত হয়ে তার নিকট প্রবেশ করি এবং বলি হে আল্লাহর রাসূল! হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল, তা কীভাবে? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার দরবারে উপস্থিত থাকি তখন আপনি আমাদের জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমাদের অবস্থা এমন হয়, যেন আমরা জান্নাত ও জাহান্নামকে দেখছি! আর যখন আমরা আপনার দরবার হতে বের হই এবং স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হই, তখন আমরা অধিকাংশই ভুলে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, আমি ঐ সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমার নিকট থাকা অবস্থায় তোমাদের যে অবস্থা হয়, সে অবস্থা যদি তোমাদের সব সময় থাকতো, তাহলে ফিরিশতারা তোমাদের সাথে তোমাদের বিছানায় ও চলার পথে সরাসরি মুসাফা করত। তবে হে হানাযালা! কিছু সময় এ অবস্থা হবে, আবার কিছু সময় অন্য অবস্থা হবে।[499] এ নিয়ে তোমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নাই। এতে একজন মানুষ মুনাফিক হয়ে যায় না।

হাদীসে হানযালা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মুনাফিক হয়ে গেছে, এ কথার অর্থ হলো, তিনি আশংকা করেন যে, তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন। কারণ, তিনি দেখলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিশে তার অবস্থার যে ধরন হয়ে থাকে, সেখান থেকে উঠে চলে গিয়ে যখন স্ত্রী, সন্তান, পারিবারিক কাজ ও দুনিয়াদারিতে লেগে যান, তখন তার অবস্থা আর ঐ রকম থাকে না। হানযালা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার এ দ্বৈত অবস্থাকেই মুনাফেকী বলে আখ্যায়িত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দেন যে, এ তো কোনো নিফাক নয়, আর মানুষ সর্বদা একই অবস্থার ওপর থাকার বিষয়ে দায়িত্বশীল নয়। কিছু সময় এক রকম থাকবে আবার কিছু সময় অন্য রকম থাকবে এটাই স্বাভাবিক।[500] (একজন মানুষের ঈমানও সব সময় এক রকম থাকে না। কখনো ঈমান বাড়ে আবার কখনো ঈমান কমে। আল্লাহ তা‘আলা কথা, আল্লাহর দীনের

---

499 সহীহ মুসলিম, ২৭৫০

500 শরহে নববী লি-মুসলিম ১৭/৬৬-৬৭

কথা জান্নাত জাহান্নামের কথা আলোচনা হলে, তখন মানুষের ঈমান বাড়ে আর যখন মানুষ দুনিয়ার কাজ কর্মে লিপ্ত হয় তখন মানুষের ঈমান কমে। আমাদের উচিত হলো, আমরা বিজ্ঞ আলিম উলামা ও সালফে সালেহীনদের মজলিশে গিয়ে তাদের থেকে কুরআনের আলোচনা ও হাদীসের আলোচনা শোনা। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যারা বাণিজ্যিক বক্তা, মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কিচ্ছা কাহিনী, দুর্বল হাদীস, বানোয়াট হাদীস ও মিথ্যা কল্প কাহিনী দিয়ে ওয়াজ করে তাদের মজলিশে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবে)

- খলিফাতুল মুসলিমিন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যাকে দুনিয়াতে জান্নাতের সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনিও নিফাককে ভয় করতেন যেমন, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন,

دُعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها، فتعلّقتُ به فقلتُ :اجلس يا أمير المؤمنين، فإنّه من أولئك أي :من المنافقين، فقال :نشدتك الله، أنا منهم؟ قال : لا، ولا أبرئ أحداً بعدك

"একবার উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে একটি জানাযায় হাজির হতে দাওয়াত দেওয়া হলে, তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অথবা বের হওয়ার ইচ্ছা করেন। আমি তার পিছু নিয়ে তাকে বললাম! হে আমিরুল মুমিনীন আপনি বসুন! কারণ, আপনি যে লোকের জানাযায় যেতে চান সে ঐসব মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি! তুমি বলতো আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, না। তোমার পর আমি আর কাউকে এভাবে দায়মুক্ত ঘোষণা করব না"[501]

- ইবন আবি মুলাইকা রহ. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি, তারা প্রত্যেকেই নিজের নফসের ওপর নিফাকের আশংকা করেন। তাদের কেউ এ কথা বলেনি: তার ঈমান জিবরীল বা মিকাইলের ঈমানের মতো মজবুত।[502]

---

[501] আল-মুসান্নাফ ৮/৬৩৭

[502] সহীহ বুখারী ১/২৬

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, কাওমের লোকদের অন্তরসমূহ ঈমান ও বিশ্বাস এবং নিফাকের কঠিন ভয়ে ভরে গেছে। তাদের ছাড়া অনেক এমন আছে যাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করে নি অথচ তারা দাবি করে তাদের ঈমান জিবরীল ও মিকাইলের ঈমানের মতো।[503]

তাদের উল্লিখিত উক্তির অর্থ এ নয় যে, তারা ঈমানের পরিপন্থী আসল নিফাক বা বড় নিফাককে ভয় করছে। বরং তারা ভয় করছে ঈমানের সাথে যে নিফাক একত্র হতে পারে তাকেঅর্থাৎ ছোট নিফাক সুতরাং এ নেফাকের কারণে সে মুনাফিক মুসলিম হবে মুনাফিক কাফির হবে না।[504]

নিফাকীর প্রকারভেদ

নিফাকী দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: ইতেক্বাদ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিফাকী:

একে বড় নিফাকী বলা হয়। এতে মুনাফিক ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলামকে যাহির করে এবং কুফুরীকে গোপন রাখে। এ প্রকারের নিফাকী ব্যক্তিকে পুরোপুরিভাবে দীন থেকে বের করে দেয়। উপরন্তু সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রকারের মুনাফিকদেরকে যাবতীয় নিকৃষ্ট গুণাবলীতে অভিহিত করেছেন। কখনো কাফির বলেছেন, কখনো বেঈমান বলেছেন, কখনো দীন ও দ্বীনদার লোকদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী হিসেবে তাদেরকে বর্ণনা করেছেন এবং এও বলেছেন যে, তারা দীন-ইসলামের শত্রুদের প্রতি পুরোপুরিভাবে আসক্ত, কেননা তারা ইসলামের শত্রুতায় কাফিরদের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরা সব যুগেই বিদ্যমান, বিশেষ করে যখন ইসলামের শক্তি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়।

যেহেতু এ অবস্থায় তারা প্রকাশ্যে ইসলামের মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়, তাই তারা যাহির করে যে, তারা ইসলামের মধ্যে আছে, যেন ইসলাম ও মুসলিমদের

---

503 মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৫৮

504 এহইয়াউ 'উলুমুদ্দিন ৪/১৭২

বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারে এবং মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে থেকে নিজেদের জান-মালের হিফাযত করতে পারে।

অতএব, মুনাফিক বাহ্যিকভাবে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দিলেও অন্তরে এসব কিছু থেকেই সে মুক্ত, বরং এগুলোকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহর প্রতি তার ঈমান নেই এবং এ বিশ্বাসও নেই যে, তিনি তাঁর এক বান্দার ওপর পবিত্র কালাম নাযিল করেছেন, তাকে মানুষের প্রতি রাসূল করে পাঠিয়েছেন, আল্লাহর হুকুমে তিনি তাদেরকে হিদায়াত করবেন, তাঁর প্রতাপ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করবেন এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এসব মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, তাদের রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন এবং বান্দাদের সামনে তাদের মু'আমেলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তারা এসব মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এই প্রকার নিফাকির সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।[505]

আল্লাহ এ প্রকার মুনাফিকদেরকে কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে গণ্য করেছেন।

إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمۡ نَصِيرًا

"নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। তাদের জন্য তুমি কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"[506]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ

"তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না।

---

505 বাক্বারা ৮

506 সূরা আন-নিসা, ১৪৫

তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি কারণ তারা মিথ্যাচার করে বেড়াত।”[507]

দ্বিতীয় প্রকার: আমলের নিফাকী

এ প্রকারের নিফাকী হলো- অন্তরে ঈমান রাখার পাশাপাশি মুনাফিকদের কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া। এ নিফাকীর ফলে ব্যক্তি ইসলামী মিল্লাতের গণ্ডী থেকে বের হয় না, তবে বের হওয়ার রাস্তা সুগম হয়ে যায়। এ ধরনের লোকদের মধ্যে ঈমান ও নিফাকী উভয়ের অস্তিত্বই রয়েছে। নিফাকীর পাল্লা ভারী হলে সে পূর্ণ মুনাফিকে পরিণত হয়। এ কথার দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

“চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোনো একটি থাকবে তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব থাকবে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। যখন তাকে আমানতদার করা হয়, সে খিয়ানত করে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন চুক্তি করে, বিশ্বাস ঘাতকতা করে, আর যখন ঝগড়া-বিবাদ করে, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে”[508]

অতএব, যার মধ্যে এ চারটি স্বভাব একত্রিত হয় তার মধ্যে সকল প্রকার অসততার সম্মিলন ঘটে এবং মুনাফিকদের সব গুণাবলিই তার মধ্যে প্রকৃষ্টভাবে পাওয়া যায়। আর যার মধ্যে সেগুলোর যে কোনো একটি পাওয়া যায় তার মধ্যে নিফাকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। কেননা বান্দার মধ্যে কখনো একাধারে উত্তম ও মন্দ স্বভাবসমূহ এবং ঈমান ও কুফুরী-নিফাকীর স্বভাবসমূহের সমাহার ঘটে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে তার ভালো ও মন্দ কাজ অনুযায়ী সে সাওয়াব ও শাস্তির উপযুক্ত হয়।

---

[507] সূরা আল-বাকারাহ, ৯-১০

[508] সহীহ বুখারী ৩৪, ২৪৫৯; সহীহ মুসলিম, ৫৮

আমলী নিফাকের মধ্যে রয়েছে- মসজিদে জামা‘আতের সাথে সালাত আদায়ে অলসতা করা। কেননা এটি মুনাফিকদেরই একটি গুণ।

মোটকথা নিফাকী অতীব খারাপ ও বিপজ্জনক একটি স্বভাব। সাহাবীগণ এতে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত থাকতেন। ইবন আবি মুলাইকা বলেন,

أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীর দেখা পেয়েছি যারা প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিফাকে পতিত হওয়ার ভয় করতেন।”[509]

বড় নিফাকী ও ছোট নিফাকীর মধ্যে পার্থক্য:

বড় নিফাকী	ছোট নিফাকী
বড় নিফাকী বান্দাকে ইসলামী মিল্লাতের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়।	ছোট নিফাকী (আমলী নিফাকী) মিল্লাত থেকে বের করে না।
বড় নিফাকীর মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে ভেতরে ও বাহিরে (বাতেন ও যাহের) দু‘রকম থাকে।	ছোট নিফাকীর মধ্যে আকীদাহ নয়; বরং শুধু আমলের ক্ষেত্রে অন্তরথ-বাহির দু‘রকম থাকে।
বড় নিফাকী কোনো মুমিন থেকে প্রকাশ পায় না;	ছোট নিফাকী কখনো মুমিন থেকে প্রকাশ পেতে পারে।
বড় নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ তওবা করে না। আর তাওবা করলেও তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।	ছোট নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি অনেক সময়ই তাওবা করে থাকে এবং আল্লাহ ও তার তাওবা কবুল করেন।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, ‘অনেক সময় মুমিন বান্দা নিফাকীর কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তার তাওবা কবুল করে নেন। কখনো তার অন্তরে এমন বিষয়ের উদয় হয় যা নিফাকীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু আল্লাহ ঐ বিষয়কে তার অন্তর থেকে দূর করে দেন। মুমিন বান্দা কখনো

[509] সহীহ বুখারী ১/১৮

শয়তানের প্ররোচনায় এবং কখনো কুফুরীর কুমন্ত্রনায় পড়ে যায়। এতে তার হৃদয় সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। যেমন, সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম বলেছিলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالْحَدِيثِ، لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَان

“হে রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার অন্তরে এমন কিছু অনুভর করে, যা ব্যক্ত করার চেয়ে আসমান থেকে জমীনের উপর পড়ে যাওয়াই সে অধিক ভাল মনে করে। একথা শুনে তিনি বললেন: এটা ঈমানেরই স্পষ্ট আলামত”[510] অন্য বর্ণনায় এসেছে: ‘‘অন্তরের কথাটি মুখে ব্যক্ত করাকে সে খুবই গুরুতর ও বিপজ্জনক মনে করে।” তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এক ষড়যন্ত্রকে কুমন্ত্রণায় পরিণত করেছেন।’’[511] একথার অর্থ হলো প্রবল অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের কু-মন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া এবং হৃদয় থেকে তা দূরীভূত হওয়া ঈমানের স্পষ্ট নিদর্শন।

---

[510] সহীহ মুসলিম ১৩০ মুসনাদ আহমাদ ৯১৫৬

[511] সহীহ মুসলিম ১৩২

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকদের কিছু চরিত্র
১. মুনাফিকদের অন্তর রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত
২. মুনাফিকদের অন্তরে অধিক লোভ-লালসা
৩. মুনাফিকরা অহংকারী ও দাম্ভিক
৪. মুনাফিকদের চরিত্র হলো, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা
৫. মুমিনদের সাথে বিদ্রূপ
৬. মানুষকে আল্লাহর রাহে খরচ করা হতে বিরত রাখা
৭. মুনাফিকদের মূর্খতা ও মুমিনদের মূর্খ বলে আখ্যায়িত করা
৮. কাফিরদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব
৯. তারা মুমিনদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকে
১০.মুনাফিকদের চরিত্র হলো, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া ও ইবাদতে অলসতা করা
১১. দ্বিমুখী নীতি ও সিদ্ধান্ত হীনতা
১২. মুমিনদের ধোঁকা দেওয়া
১৩. গাইরুল্লাহর নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে যাওয়া
১৪. মুমিনদের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা
১৫. মিথ্যা শপথ করা, কাপুরুষতা ও ভীরুতা

১৬. তারা যা করে নি তার ওপর তাদের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করত
১৭. মুনাফিকরা নেক আমলসমূহের দুর্নাম করত
১৮. তারা নিম্নমান ও অপারগ লোকদের প্রতি সন্তুষ্টি
১৯. মুনাফিকরা খারাপ কাজের আদেশ দেয় আর ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে
২০. জিহাদকে অপছন্দ করা ও জিহাদ হতে বিরত থাকা
২১. অপমান ও অপদস্থের দায়িত্ব কাঁধে নেয়া
২২. মুমিনদের থেকে পিছে হটা
২৪. জিহাদে না গিয়ে বিভিন্ন ওজুহাত দাঁড় করানো
২৬. মুমিনদের মুসিবতে খুশি হওয়া
২৭. যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, আর যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে আর যখন ঝগড়া করে অকাট্য ভাষায় গাল-মন্দ করে
২৮. সময় মতো সালাত আদায় না করা
২৯. জামা‘আতে সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকা
৩০. অশ্লীল কথা বলা ও বেশি কথা বলা
৩১. গান শ্রবণ করা

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন,

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ.

আর ঈমান হচ্ছে, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তর দিয়ে সত্যায়ণ করা''

وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ.

''শরী'আত এবং তার ব্যাখ্যায় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, তা সবই হক্ব বা সত্য।''

وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى، وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَى.

''ঈমান এক। আর ঈমানদার ব্যক্তিরা সে মৌলিক দিক থেকে সবাই সমান; তবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া, কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং উত্তম বস্তুকে আকড়ে ধরার মাধ্যমে।''

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ .

''সব মুমিন ব্যক্তিই দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওলী বা বন্ধু। আর তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তাঁর অধিক অনুগত এবং কুরআনের বেশী অনুসারী।''

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

''আর ঈমান (এর বিস্তারিত রূপ) হচ্ছেঃ আল্লাহ, তাঁর মালায়েকা (ফিরিশতা), তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাক্বদীরের ভাল মন্দ, মিষ্টি ও তিক্ত, সবই আল্লাহর তরফ থেকে (তাঁরই অনুমতিতে) ঘটে থাকে এ ঈমান (স্বীকৃতি) রাখা।''

وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ .

> ''আর আমরা উল্লিখিত বিষয় সবগুলোর ওপর ঈমান (দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি) পোষণ করি। আমরা রাসূলদের মধ্যে (ঈমানের ক্ষেত্রে) কোনো তারতম্য করি না। তাঁরা যে সকল বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন তা সবই সত্য বলে স্বীকার করি।''

وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللَّهَ عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ، وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ، كَمَا ذَكَرَ عز وجل فِي كِتَابِهِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

> ''রাসূলুল্লাহ সা. এর উম্মাতের মধ্যে যারা (শিরক ব্যতীত অপরাপর) কবীরা গুনাহ করবে তারা তাওবা নাও করলেও জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না- যদি তারা তাওহীদ তথা একত্ববাদী হয়ে মারা গিয়ে থাকে। যখন তারা ঈমানদার অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিচারের ওপর নির্ভরশীল হবে; যদি তিনি চান তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং নিজ গুণে তাদের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

''শিরক ব্যতীত অন্যান্য সব অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।''[512]

وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ،

> ''আর যদি তিনি চান, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করাবেন এবং তাও হবে তার ন্যায়বিচার। অতঃপর আল্লাহপাক তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর (অনুমতিপ্রাপ্ত) সুপারিশকারীদের সুপারিশের ফলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিবেন এবং জান্নাতে প্রেরণ করবেন।

---

[512] সূরা আন-নিসা: ৪৮

375- আকিদাতুত তাহাবী

وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ، وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَايَتِهِ ;اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ثَبِّتْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ.

> ‘‘এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মা‘রিফাতের অধিকারী (স্বীকারকারী) নেককার বান্দাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের তাঁর অস্বীকারকারীদের ন্যায় করেন নি, যারা তাঁর হিদায়াতের পথ থেকে অকৃতকার্য হয়েছে। তারা তাঁর বন্ধুত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি’’

দরসুল আকিদা

ঈমান

- **ইমানের পরিচয়**
- **ইমান-ইসলামের সম্পর্ক**
- **ইমান কি বাড়ে/কমে?**
- **ঈমান ভঙ্গের কারণ**

ইমানের পরিচয়

ঈমানের আভিধানিক অর্থ : ‘আল-ঈমান’ (الإيمان) শব্দটি বাবে إفعال -এর মাছদার বা ক্রিয়ামূল। অভিধানিক অর্থ- اَلتَّصْدِيْقُ ‘আন্তরিক বিশ্বাস’, اَلْإِقْرَارُ وَالطَّمَأْنِيْنَةُ ‘স্বীকৃতি ও প্রশান্তি’। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহঃ) শেষোক্ত অর্থটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। রাগেব আল-ইছফাহানী বলেন, ঈমানের মূল অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়া।[513]

পারিভাষিক অর্থ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একাংশের [ইমাম আবু হানিফা রাহি. ইমাম তাহাবী রাহি. এবং ইমাম মাতুরিদি রাহি.] মতে-

والإيمان: هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان. وجميع ما صح عن رسول الله ﷺ من الشرع والبيان كله. حق

আর ঈমান হচ্ছে, **<u>মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তর দিয়ে সত্যায়ণ করা ।</u>** শরী‘আত এবং তার ব্যাখ্যায় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, তা সবই হক্ব বা সত্য।’’ [আকিদাতুত ত্বাহাবী]

تصديق بالقلب والإقرار باللسن فقط۔

অন্তুর দিয়ে সত্যায়ণ- এবং মুখ দিয়ে স্বীকৃতি- [আকিদাতুত ত্বাহাবী]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অপর অংশের মতে; [ইমাম শাফেয়ী রাহি. এবং ইমাম আহমদ রাহি.]

تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ

অন্তরের বিশ্বাষ- মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। মূল ও শাখাসহ হৃদয়ে বিশ্বাস, প্রথম দু’টি মূল ও শেষেরটি হ’ল শাখা, যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।[514]

---

513 আল-মুফরাদাত, পৃঃ ৩৫

514 ইবনু মান্দাহ, কিতাবুল ঈমান ১/৩৩১

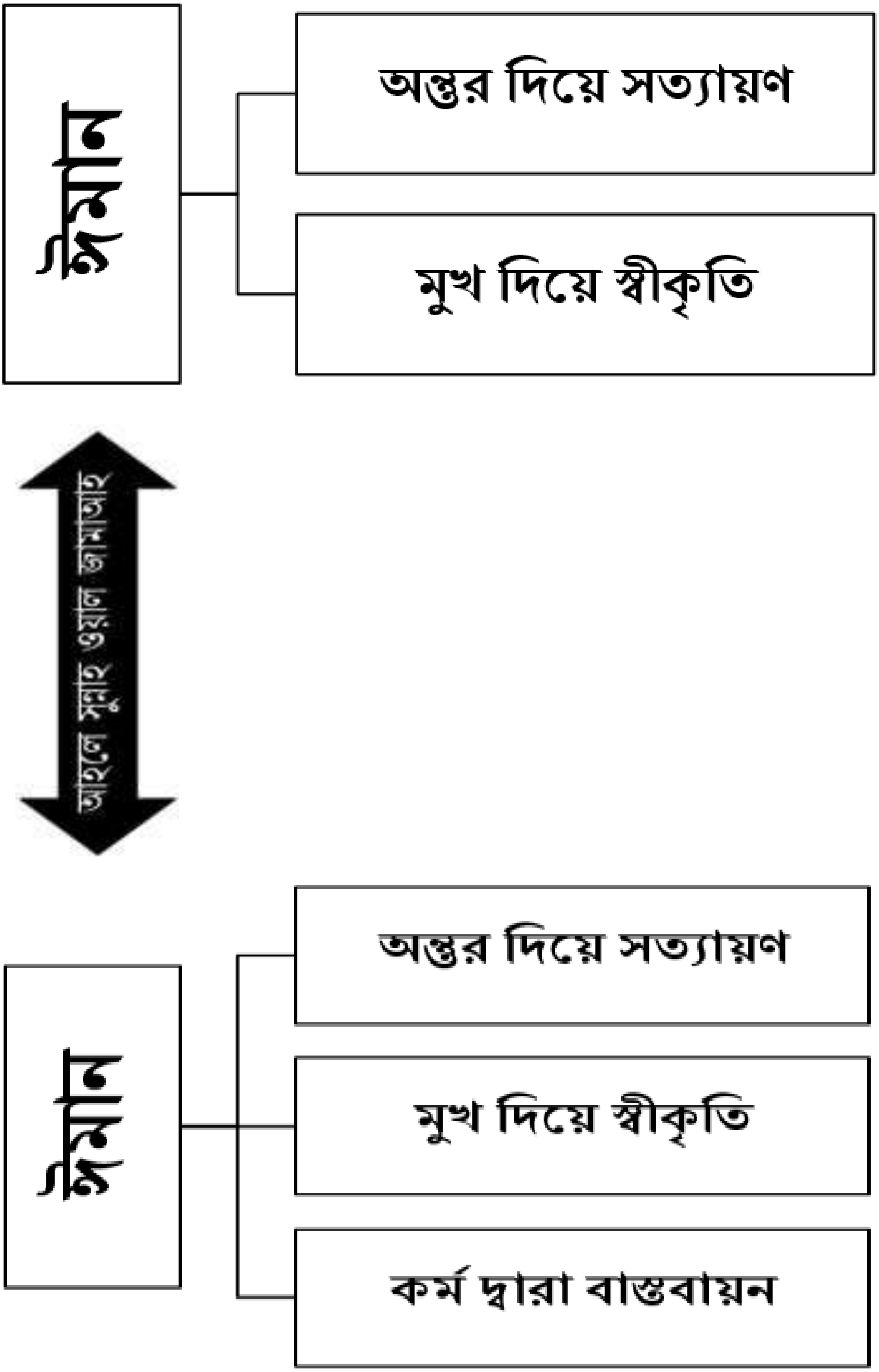
ঈমান
অন্তর দিয়ে সত্যায়ণ
মুখ দিয়ে স্বীকৃতি
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ
ঈমান
অন্তর দিয়ে সত্যায়ণ
মুখ দিয়ে স্বীকৃতি
কর্ম দ্বারা বাস্তবায়ন

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে সম্পর্ক

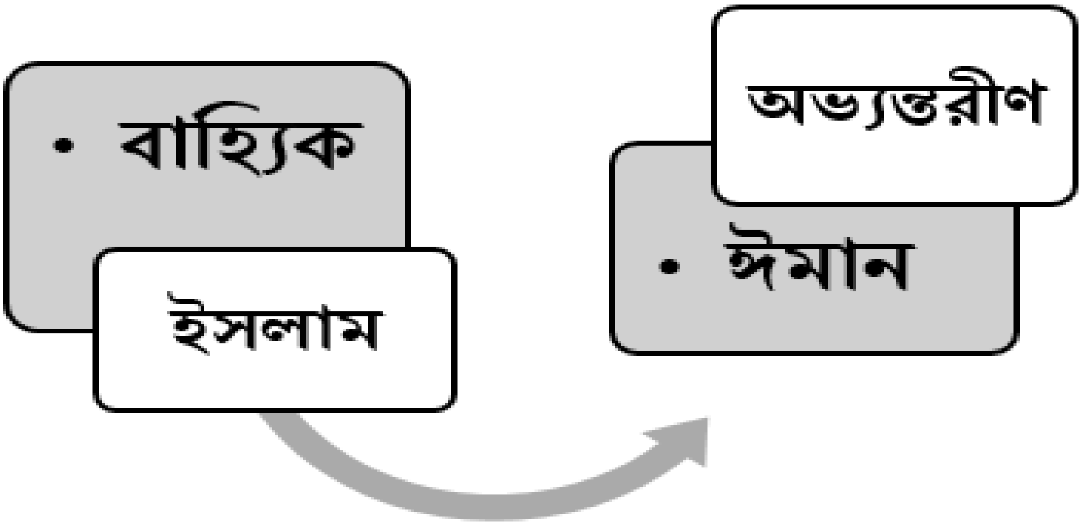

الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق؛ لأن الإيمان تصديق القلوب وكل ما يتعلق بالإسلام من قول وعمل، والإسلام كذلك هو الانقياد لله والخضوع له بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، فإذا أطلق أحدهما شمل الآخر، كما قال :إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ ..[سورة آل عمران: 19]، يعني والإيمان داخل في ذلك، أما إذا جمعا فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، إذا جمع بينهما كما في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان، فسر له النبي الإسلام بالأمور الظاهرة كالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر له الإيمان بأمور باطنة قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الفرق بينهما: عند الاجتماع يكون الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، وعند انفراد أحدهما يدخل فيه الآخر، وهكذا قوله ﷺ: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فالإيمان بضع وسبعون شعبة يدخل فيه الإسلام؛ ولهذا ذكر أفضل ذلك: لا إله إلا الله، وهي أصل الإسلام، فدل

ذلك على أن الإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام، وهكذا إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان عند أهل السنة.

ইসলাম (الإسلام) ও ঈমান (الإيمان) শব্দদ্বয় যখন সাধারণভাবে ও পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন উভয়টি সমার্থবোধক, আর যখন একত্রে অথবা নির্দিষ্ট বা শর্তযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। সুতরাং ইসলাম হলো বাহ্যিক কথা ও কাজ সমষ্টির নাম। আর ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মসমূহের নাম, আর আবশ্যক হলো বান্দার মধ্যে উভয়টির সমাবেশ ঘটানো। অতএব, ঈমান ব্যতীত ইসলাম যথেষ্ট নয়, আর ইসলাম ছাড়াও ঈমান যথেষ্ট নয়।

ঈমান কি বাড়ে/কমে?

والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى.

Faith is one and its people are equal by default.

ঈমান এক। আর ঈমানদার ব্যক্তিরা সে মৌলিক দিক থেকে সবাই সমান। তবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া, কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং উত্তম বস্তুকে আকড়ে ধরার মাধ্যমে। [আকিদাতুত ত্বাহাবী]

মৌলিক ঈমানের ভেতরে হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এটা ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম ত্বাহাবী রাহি.'র মাযহাব। শাফেয়ী এবং উলামায়ে কিরামের মতে ঈমানে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তাদের দলীল হলো কুরআন ও সুন্নাহর অনেক নসের 'যাহেরী'[বাহ্যিক] শব্দ। সেখানে সুস্পষ্টভাবেই ঈমানের ব্যাপারে 'হ্রাস'-'বৃদ্ধি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য হচ্ছে, ঈমান হলো জরুরি কিছু বিষয় সত্যায়ন (এবং স্বীকার) এর নাম। যেগুলো থেকে সামান্য কম করলেও কেউ মুমিন থাকবে না। আবার বেশি করারও মুমিন হওয়ার জন্য জরুরি নয়। সেসব বিষয়ে ঈমান আনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান। তাছাড়া প্রথম যুগের সাহাবায়ে কিরামকেও মুমিন বলা হয়, অথচ তখন সত্যায়ন (ও স্বীকারোক্তি) ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। অর্থাৎ তখন আমল ছিলই না। তারা কি

তখন অসম্পূর্ণ মুমিন ছিল? হ্যা এতটুকু বলা যায়, তখন তাদের ঈমান ছিল মুজমাল। এরপর বিভিন্ন আহকাম নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর প্রতি ঈমানও তাফসীল তে থাকে। আর ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে যেসব নস এসেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হচ্ছে ওগুলো ঈমানের নূর ও ইয়াকীনের শক্তি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে তাহকীকের বেলা দেখা গেছে এই মতবিরোধ কেবলই শাব্দিক। অর্থাৎ বাস্তবিক অর্থে কোন মতবিরোধ নেই। কারণ যারা বলেন ঈমানের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তাদের উদ্দেশ্য হলো 'মুতলাকুল ঈমান' (ন্যূনতম ঈমান; আমল অন্তর্ভুক্ত নয়) অর্থাৎ যতটুকু ঈমান আনা জরুরি সেখানে কম-বেশি নেই। যারা বলেন ঈমানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ঈমান মুতলাক' (পূর্ণ ঈমান ও আমল) এ কম-বেশি ঘটে থাকে। আর একারণেই রাসূলের হাদীস 'যখন কোনো ব্যক্তি ব্যাভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না'- এখানে 'ঈমান মুতলাক' (পূর্ণ ঈমান) উদ্দেশ্য; মুতলাকুল ঈমান (ন্যূনতম ঈমান) উদ্দেশ্য নয়। কারণ আহলে সুন্নাহর সকলে একমত যে, কবীরা গোনাহের মাধ্যমে ঈমান নাকচ হয় না। একইভবে য হাদীসে এসেছে, ঈমানের ৭০ টির অধিক শাখা। এর উদ্দেশ্য ঈমানের শাখাগুলোর বিভাজন মৌলিক ঈমানের নয়। কারণ সকলেই একমত যে কেউ যদি সারাজীবনেও রাস্তা থেকে ময়লা দূর না করে তবুও মুমিন থাকবে, কাফের হবে না। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঈমান যদি 'দৃঢ় বিশ্বাস (আকদুন জাযিম) এর নাম হয়ে থাকে, সেখানে স্তরভেদ হওয়ার কেনো সুযোগ নেই। হ্যা আমলের ক্ষেত্রে স্তরভেদ হওয়ার সুযোগ আছে। একারণেই আমলকে ঈমানের পরিপূর্ণতা হিসেবে গণ্য করা হয়। আর যদি আমলকে মূল ঈমানের (পরিপূর্ণতার পরিবর্তে) রোকন হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে খারেজী এবং মুতাযিলাদের দোষ কী? যারা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত মনে করে; ফলস্বরূপ [নেক আমলের বিপরীত] কবিরা গুনাহকে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করে থাকে।[515]

---

[515] শরহুল ওয়াসিয়্যাহ

ঈমান ভঙ্গের কারণ

কয়েকটি কারণে কালেমা ভঙ্গ হয়; যা বেশি ঘটমান; কারণ দশটি, যা আহলে ইলমগণ বর্ণনা করেছেন।[516]

প্রথম কারণ: ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ঈমান ভঙ্গের কারণ যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ

“নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তার সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন”[517]

অপর আয়াতে তিনি বলেন,

إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ

“নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই”[518]

কয়েকটি শির্কী ইবাদাত, যেমন মৃতদের নিকট দো'আ করা, তাদের নিকট ফরিয়াদ করা, কিছু তলব করা এবং তাদের জন্য মান্নত ও জবেহ করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কারণ: আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করা, তাদেরকে আহ্বান করা, তাদের নিকট সুপারিশ তলব করা ও তাদের ওপর তাওয়াক্কুল করা ঈমান ভঙ্গের কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ قُلۡ أَتُنَبِّ‍ُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, ‘এরা আল্লাহর নিকট

---

[516] দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজওয়াবাতিন নাজদিয়্যাহ) :২/২৩২

[517] সূরা আন-নিসা, ১১৬

[518] সূরা আল-মায়েদা,৭২

আমাদের সুপারিশকারী'আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও জমিনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন'? তিনি পবিত্র এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে"[519]

তৃতীয় কারণ: মুশরিকদের কাফির না বলা ও তাদের কুফুরী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঈমান ভঙ্গের কারণ।

চতুর্থ কারণ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অপেক্ষা অন্য কারো আদর্শকে পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা থেকে অন্য কারো ফয়সালা উত্তম জানা ঈমান ভঙ্গের কারণ, যারা তাগুতের ফয়সালাকে প্রাধান্য দেয় তারা এ শ্রেণিভুক্ত।

পঞ্চম কারণ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দীনের কোনো বিধানকে অপছন্দ করা ঈমান ভঙ্গের কারণ, যদিও সে তার ওপর আমল করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ

"তা এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন"[520]

ষষ্ঠ কারণ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দীনের কোনো বিধান অথবা তাতে প্রমাণিত সাওয়াব বা শাস্তি নিয়ে ব্যঙ্গ করা ঈমান ভঙ্গের কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَئِن سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ

"আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। আপনি বলুন, 'আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার রাসূলের সাথে কি তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না, তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফুরী করেছ"[521]

---

519 সূরা ইউনুস: ১৮

520 সূরা মুহাম্মাদ ৯

521 সূরা আত-তাওবাহ, ৬৫-৬৬

সপ্তম কারণ: জাদু ও জাদুর অন্তর্ভুক্ত সারফ (আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ) ও 'আতফ ঈমান ভঙ্গের কারণ। যে জাদু করে বা জাদুর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সে কাফির কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ

"আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষা সুতরাং তোমরা কুফুরী কর না"[522]

অষ্টম কারণ: মুশরিকদের পক্ষ গ্রহণ করা ও মুসলিমদের বিপক্ষে তাদেরকে সাহায্য করা ঈমান ভঙ্গের কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদের একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কাওমকে হিদায়াত দেন না"[523]

নবম কারণ: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন পালন না করার অবকাশ কতক মানুষের রয়েছে বিশ্বাস করা ঈমান ভঙ্গের কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায় তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"[524]

দশম কারণ: আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ থাকা কুফুরী, ঈমান ভঙ্গের কারণ যে আল্লাহর দীন শিখে না ও তার ওপর আমল করে না সে কাফির।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

---

[522] সূরা আল-বাকারা, ১০২

[523] সূরা আল-মায়েদা ৫১

[524] সূরা আলে ইমরান, ৮৫

“আর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী” [525]

এ দশটি বিষয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ তাওহীদের কালেমা ভঙ্গকারী। যে কেউ এ দশটি থেকে কোনো একটিতে পতিত হল তার ঈমান শেষ। এরূপ ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা উপকৃত হবে না। আহলে-ইলমগণ আরও স্পষ্ট বলেছেন, এসব কাজ হাসি ঠাট্টায় করুক, ইচ্ছায় করুক বা ভয়ে করুক কোনো পার্থক্য নেই, তবে যাকে বাধ্য করা হয় সে ব্যতীত। ঈমান ভঙ্গকারী প্রত্যেকটি বস্তু খুব ভয়ানক, আমাদের সমাজে যা সচরাচর সংঘটিত হয়। মুসলিমদের এসব থেকে দূরে থাকা ও কুফরের আশঙ্কায় ভীত থাকা জরুরি। আমরা আল্লাহর নিকট তার গোস্বা ও শাস্তির উপকরণ থেকে পানাহ চাই, তিনি আমাদের সবাইকে তার পছন্দনীয় বস্তুর তাওফিক দিন, আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে তার সঠিক পথের হিদায়াত দান করুন।

---

[525] সূরা আস-সাজদাহ, ২২

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন,

وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ.

> ‘আর আমরা প্রত্যেক সৎ ও পাপী মুসলিমের পিছনে সালাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মৃত মুসলিমের জন্য জানাযার সালাত আদায় করার পক্ষে মত প্রদান করি।’

وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .

> ‘আমরা তাদের কাউকে জান্নাতী ও জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করব না এবং তাদের কারও বিরুদ্ধে আমরা কুফুরী ও শিরক অথবা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করব না, যতক্ষণ না এগুলির কোনো একটি তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমরা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেই।’

وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ.

> ‘আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের কারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার পক্ষে মত দেই না, যদি না এমন কেউ হয় যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ওয়াজিব’[526]

وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل فَرِيضَةً، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ

---

[526] ওয়াজিব হয় তিনটি কারণে। এক. বিবাহিত লোকের ব্যভিচারের কারণে, দ্বিতীয়. কোনো সম্মানিত মানুষকে হত্যা করার কারণে, তিন. দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে কাফির হওয়ার কারণে যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ৬৮৭৮; সহীহ মুসলিম ১৬৭৬

‘আমীর ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না, যদিও তারা অত্যাচার করে। আমরা তাদের অভিশাপ দিব না এবং আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিব না। তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সাপেক্ষে ফরয, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যচরণের আদেশ দেয়। আমরা তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দো‘আ করব।’

وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ.

‘আমরা সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসরণ করব। আমরা জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং জামা‘আতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকব।’

وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ.

‘আমরা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসব এবং অন্যায়কারী ও আমানতের খিয়ানতকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করব।’

দরসুল আকিদা

সূচী

- ইফতিরাক [Confliction] পরিচিতি-পরিণাম
- ইফতিরাকের কতিপয় উদাহরণ
- ইখতিলাফ [Difference of opinion and thought] পরিচিতি
- ইখতিলাফ [মতভেদ] এবং ইফতিরাক [বিভক্তি] এর পার্থক্য
- ফিক্বহী মাযহাবের বিভিন্নতা বনাম ইফতিরাক
- হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধগুলোর প্রকৃত কারণ

ইফতিরাক[Confliction]; পরিচিতি

‘ইফতিরাক’, ‘-ফারক’; ইত্যাদির শব্দের মূল অর্থ; পার্থক্য, পৃথক, বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন হওয়া বা করা। তাফররুক, বিভক্তি বা দলাদলি মূলত পারস্পরিক শত্রুতার একটি অবস্থা।

জামাআত বা ঐক্যের বিপরীতে কুরআন ও হাদীসে তাফাররুক ও ইফতিরাক এসেছে- এবং নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বলা হয়েছে।

পরিণাম

কুরআন-হাদীসে বারবার বিভক্তি, ফিরকাবাজি বা দলাদলি থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

“তোমরা আল্লাহ্ রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর ঐক্যবদ্ধভাবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর: তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন।[527]

এ আয়াতে ‘জামঅ’ (ঐক্যবদ্ধতা) শব্দকে ‘তার্ফারুক’ (বিভক্তি বা দলাদলি)-র বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, বিভক্তিমুক্ত ঐক্যের অবস্থাই জামাআত। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, জামাআত বা ঐক্যের অবস্থাই উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব এবং পরস্পর সম্প্রীতির অবস্থা এবং ‘পরস্পর শত্রুতা’-র অবস্থাই তার্ফারুক বা দলাদলির অবস্থা। আরো জানা যায় যে, শত্রুতা ও দলাদলি জাহান্নামের প্রান্তে নিয়ে যায় এবং ঐক্য, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব তা থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন হাদীসে মুসলিম উম্মাহকে জামাআতের মধ্যে থাকতে

---

527 আল-ইমরান: ১০৩

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কখনো জামাআত বলতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবদ্ধতা এবং কখনো উম্মাহর সাধারণ ঐক্যবদ্ধতা বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" [528]

وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।"[529]

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা তাদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।" [530]

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না।"[531]

---

[528] সূরা আল-ইমরান: ১০৫

[529] সূরা রূম: ৩০-৩২

[530] সূরা আন'আম: ১৫৯

[531] সূরা শুরা ১৩

হাদীস

১. হারিস আশ‘আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-

أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلا أَنْ يَرْجِعَ

“আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলির নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন: শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত ও জামা‘আত (ঐক্য); কারণ যে ব্যক্তি জামা‘আত (ঐক্য) থেকে এক বিঘত সরে গেল সে ইসলামের রজ্জু নিজের গলা থেকে খুলে ফেলল, যদি না ফিরে আসে।”[532]

২. উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

عليكم بالجماعةِ، وإيَّاكُم والفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنين أبعدُ، مَنْ أَراد بُحْبُوحَةَ الجنة فليلزم الجماعةَ

“তোমরা জামাআত (ঐক্য) আকড়ে ধরে থাকবে এবং দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থাকবে। কারণ শয়তান একক ব্যক্তির সাথে এবং সে দু’জন থেকে অধিক দূরে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ততা চায় সে জামাআত (ঐক্য) আঁকড়ে ধরুক। তিরমিযী

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ (لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ) إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা‘আতের (সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।” [বুখারী ও মুসলিম

[532] তিরমিযী

৩. নুমান ইবন বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: (الجماعة رحمة والفرقة عذاب) "ঐক্য রহমত এবং বিভক্তি আযাব।" [মুসনাদ আহমদ, আলবানী সাহীহুত তারগীবে হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।]

ইফতিরাকের কতিপয় উদাহরণ

- দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ না হওয়া, ইসলামের বিরোধিতা করা বা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া এগুলো সর্বাবস্থায় দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা।
- তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়, যেগুলোকে পরিভাষায় 'জরূরিয়াতে দ্বীন' বলে, তার কোনো একটির অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা হচ্ছে ইরতিদাদ (মুরতাদ হওয়া] দ্বীনের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার জঘন্যতম প্রকার। এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় দ্বীন ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা।
- দ্বীনে ইসলাম গ্রহণের পর কুরআনসুন্নাহ ও ইসলামী আকীদাসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে খেয়ালখুশির অনুসরণ করে সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। এটাও বিচ্ছিন্নতা হাদীস শরীফে কঠিন ভাষায় এর নিন্দা করা হয়েছে এবং তা থেকে বাচার জন্য দুটি জিনিসকে দৃঢ়ভাবে ধারণের আদেশ করা হয়েছে 'আসসুন্নাহ' এবং 'আলজামাআ'। এ কারণে যে জামাত সিরাতে মুসতাকীমের উপর অটল থাকে তাদের নাম 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।'তাদের পথ থেকে যারাই বিচ্যুত হয়েছে তারাই এই বিভেদ বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে। অতপর কোনো দল ও ফের্কার জন্ম দিলে তা তো আরো মারাত্মক।
- আলজামাআর ব্যাখ্যায় উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির কোনো একটি ভঙ্গ করা কিংবা কোনো একটি থেকে বিচ্যুত হওয়া পরিষ্কার বিচ্ছিন্নতা।
- আর 'আলজামাআর' ব্যাখ্যায় মুসলিম সমাজের ইজতিমায়ী রূপরেখা বিনষ্ট করা বা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে তা বিনষ্ট হয় তাও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার শামিল।
- তেমনি ফিকহী মাযহাবের অনুসারী কোনো ব্যক্তি বা দল যদি মাযহাবকে জাহেলী আসাবিয়াত ও দলাদলির কারণ বানায় তাহলে তার/তাদের এই কাজও নিঃসন্দেহে ঐক্যের পরিপন্থী এবং বিভেদবিচ্ছিন্নতার শামিল।

`মুহাজিরীন’ ও ‘আনসার’ কত সুন্দর দুটি নাম এবং কত মর্যাদাবান দুটি জামাত। উভয় জামাতের প্রশংসা কুরআন মজীদে রয়েছে। কিন্তু এক ঘটনায় যখন এ দুই নামের ভুল ব্যবহার হয়েছে তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করেছেন।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, এক সফরে এক মুহাজির তরুণ ও এক আনসারী তরুণের মাঝে কোনো বিষয়ে ঝগড়া হয়। মুহাজির আনসারীকে একটি আঘাত করল। তখন আনসারী ডাক দিল, يا للأنصار! হে আনসারীরা!; মুহাজির তরুণও ডাক দিল- يا للمهاجرين! হে মুহাজিররা!; আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আওয়াজ শোনামাত্র বললেন-ما بال دعوى الجاهلية এ কেমন জাহেলী ডাক! কী হয়েছে?উপরোক্ত ঘটনায় আনসারী মুহাজিরদেরকেও ডাকতে পারতেন এবং মুহাজির আনসারীদেরকে ডাকতে পারতেন। কিংবা ভাইসব! মুসলমান ভাইরা! বলেও ডাকা যেত। কিন্তু এমন কোনো ডাক মুসলমানের জন্য শোভন নয়, যা থেকে আসাবিয়ত ও দলাদলির দুর্গন্ধ আসে। কারণ তা ছিল জাহেলী যুগের প্রবণতা। ঐ সময় সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তি ছিল বংশীয় বা গোত্রীয় পরিচয়।

নিম্নের গুলি ইফতিরাক এর অন্তর্ভূক্ত নয়

সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ঐ বিষয়গুলোও মনে রাখা চাই যেগুলোকে কোনো লোক ঐক্যের পরিপন্থী মনে করতে পারে অথচ তা উম্মাহর ঐক্য রক্ষার জন্যই জরুরি। যেমন

- ❑ আহলে কুফর ও আহলে শিরক থেকে আলাদা থাকা। তাদের বাতিল বিষয়াদিতে সঙ্গ না দেওয়া। তাদের জাতীয় নিদর্শন ও সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা। তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা না রাখা। রাজনৈতিক প্রয়োজনে (মুসলিম উম্মাহর রাজনীতি হবে সর্বদা দ্বীনের অধীন) তাদের সাথে সন্ধির প্রয়োজন হলে তা শরীয়তের বিধান মোতাবেক হতে পারে। ‘আহলুল বিদআ ওয়াল ফুরকা’র সাথে তাদের বিদআত ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে একমত না হওয়া। তালীম-তরবিয়ত, সুলুক ও তাযকিয়ার প্রয়োজনে তাদের সাহচর্য গ্রহণ না

করা। কারণ সাহচর্যের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। 'আহলুল আহওয়া'র সাহচর্য গ্রহণ করার বিষয়ে সাহাবা-তাবেয়ীন নিষেধ করেছেন।

- প্রকাশ্যে ফিসক-ফুজুরে লিপ্ত ব্যক্তিদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা।
- অন্যায় ও ভুল কাজে কারো সাহায্য না করা। আসাবিয়ত ও দলাদলির ক্ষেত্রে কাউকে সঙ্গ না দেওয়া।
- 'যাল্লাত' (যেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ভুল হয়েছে এমন) ক্ষেত্রে আকাবির ও মাশাইখের তাকলীদ না করা।
- জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখা।
- শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুযায়ী আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার করা।
- ইলমী আদব রক্ষা করে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে মতভেদপূর্ণ ইজতিহাদী বিষয়াদিতে দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা-পর্যালোচনা করা।
- কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনে শরীক না হওয়া, কিংবা বলুন, পশ্চিমাদের পদ্ধতিতে রাজনীতিকারী কোনো সংগঠনে শামিল না হওয়া।

হাদীস শরীফে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের দুটি মানদন্ড উল্লেখ করা হয়েছে : আসসুন্নাহ এবং আলজামাআহ। এ কারণে এ দলের স্বীকৃত উপাধি, যা সাহাবা-যুগ থেকে চলে আসছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন নিজেদের মাঝে উভয় মানদন্ড ধারণ করি। অন্য সকল ফের্কা হচ্ছে আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা। এখন আমরা যেন নিজেদেরকে তৃতীয় দল-'আহলুস সুন্নাতি ওয়াল ফিরকা' না বানিয়ে ফেলি। কারণ শুধু ফিরকা ও বিভেদও ঐ কঠিন হুঁশিয়ারির মধ্যে নিক্ষেপ করে যা হাদীস শরীফে এসেছে- من شذ شذ في النار এবং কেবল বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাও মারাত্মক পর্যায়ের সুন্নাহবিরোধী কাজ। তাই শুধু এ কারণেও সুন্নাহর মানদন্ড হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল ফুরকা'র অর্থও দাঁড়াবে আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা।

ইখতিলাফ [Difference of opinion and thought]

পরিচয়

আর ইখতিলাফ অর্থ মতভেদ করা। পক্ষান্তরে ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা দলে দলে বিভক্ত হওয়া। (যদিও বর্তমানে) ইখতিলাফ বা মতভেদ ইফতিরাক বা বিভক্তির অন্যতম কারণ, তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মতভেদ মানবীয় প্রকৃতি। দুজন মানুষ কখনোই শতভাগ একমত হতে পারেন না। স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্র থেকে শুরু করে পরিবার বা সমাজ সর্বত্রই মতভেদ বিদ্যমান। কিন্তু সকল মতভেদ শত্রুতা, বিদ্বেষ, বিভক্তি বা দলাদলি নয়। মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন নিজের মতকেই একমাত্র ‘হক্ক’ ও অন্য মতকে বাতিল মনে করেন এবং অন্যমতের অনুসারীদের ‘অন্যদল’ মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা ‘বিচ্ছিন্নতা’-য় পরিণত হয়।

উল্লেখ্য উপরোক্ত হাদীসসমূহে ‘আলজামাআ’র বিপরীতে এসেছে ‘আলফুরকা’; ‘আলইখতিলাফ’ নয়।

395- দরসুল আকিদা

ইখতিলাফ [মতভেদ] এবং ইফতিরাক [বিভক্তি] উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

ক্র নং	ইখতিলাফ [মতভেদ]	ইফতিরাক [মতবিরোধ]
০১	ইখতিলাফ কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নিষিদ্ধ নয় জায়েয। এবং অনেক সময় তা প্রশস্ততা সৃষ্টি করে।	ইফতিরাক কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নিষিদ্ধ কর্ম। কারন ইফতিরাক বা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সকল ক্ষেত্রেই শত্রুতা সৃষ্টি করে।
০২	ইখতিলাফ কারি যে কোন সময় মত পাল্টতে পারে।	ইফতিরাক কোন সময় মত পাল্টায় না এটাই তার চূড়ান্ত রায়।
০৩	ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক [দলাদলি] সৃষ্টি করে না।	ইফতিরাক মানুষে মাধ্য দলাদলি মাধ্যমে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে।
০৪	ইখতিলাফকারী আলিম নিন্দিত নন, বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরস্কার প্রাপ্ত। মুজতাহিদ ভুল করলে একটি পুরস্কার ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে দুটি পুরস্কার লাভ করেন। [বুখারী]	ইফতিরাককারী সব সময় নিন্দিত কারন সে আল্লাহ আদেশ লংঘন দ্বীদে বিভক্তি করে, তার মতবাদ নিয়ে খুশি। (সূরা মু'মিনূন ২৩:৫৩-৫৪)
০৫	ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলিল। দলিলের ভুল বুঝতে পেরে অন্যের মতও গ্রহন করতে পারে।	ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ এবং ইখলাসের অনুপস্থিতি।ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব।
০৬	ইলম, ইখলাস, ইসলামীভ্রাতৃতবোধ ও ভালবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে।	ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃতবোধ ও ভালবাসা বিপরীতে নিজের মত প্রতিষ্ঠা আশাই কেবল ইফতিরাক জন্ম নেয়।

ফিক্বহী মাযহাবের বিভিন্নতা বনাম ইফতিরাক

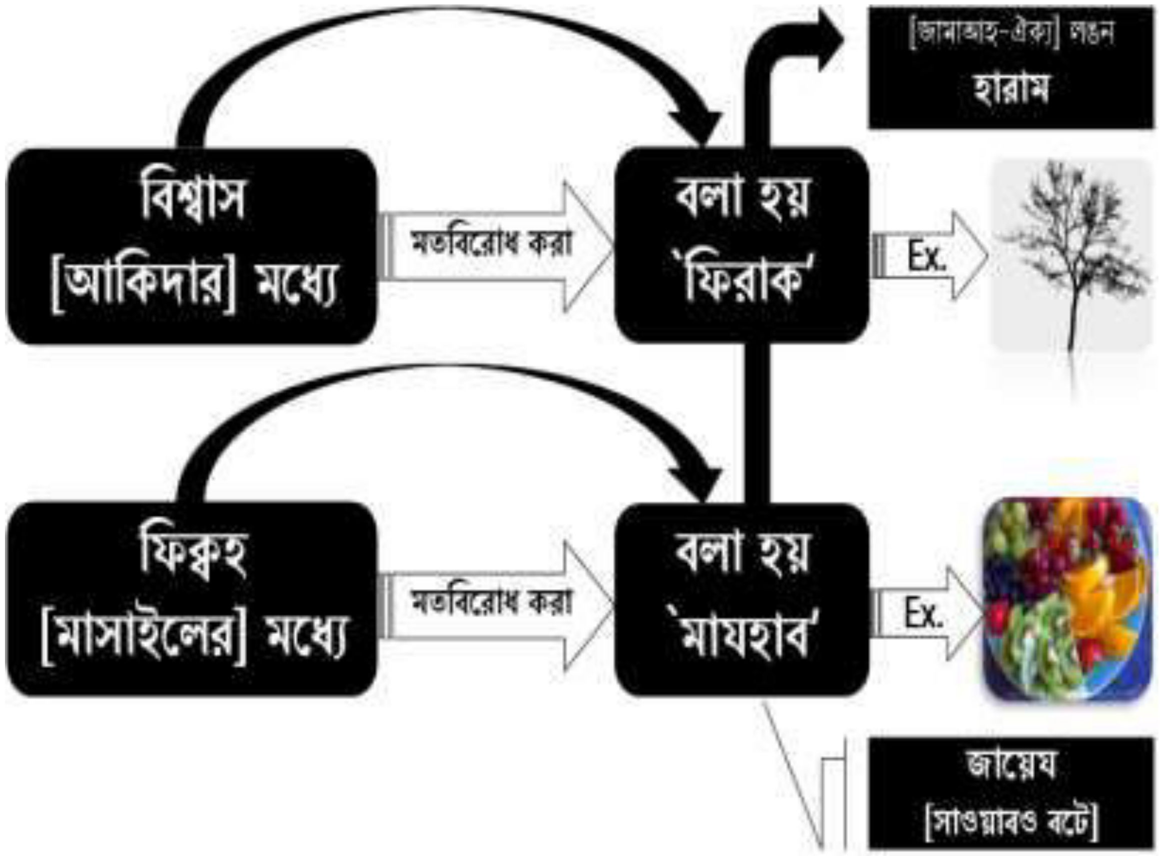

ফিকহী ইখতিলাফ

কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী নবী ও রাসূলদের মাঝে কোনো বিভেদ ছিল না। তারা পরস্পর অভিন্ন ছিলেন। যদিও শরীয়তের বিধিবিধান সবার এক ছিল না, পার্থক্য ও বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু তা ছিল দলিলভিত্তিক, খেয়ালখুশি ভিত্তিক নাউযুবিল্লাহ- ছিল না। সুতরাং বোঝা গেল, ফুরূ বা শাখাগত বিষয়ে দলিলভিত্তিক মতপার্থক্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়।

দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.ও নবী ছিলেন। এক মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে দুজনের মাঝে [ইজতিহাদগত] মতপার্থক্য হল। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তাদের মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সুলায়মান আ.এর ইজতিহাদ যে তাঁর মানশা মোতাবেক ছিল সেদিকেও ইশারা

করেছেন। তবে পিতাপুত্র উভয়ের প্রশংসা করেছেন।[533] এখানে ফুরূয়ী মাসাইল বা শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের যে মতপার্থক্য, যাকে ফিকহী মাযহাবের মতপার্থক্য বলে, তা দ্বীনের বিষয়ে বিচ্ছিন্নতা নয়। কারণ ফিকহের এই মাযহাবগুলো তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামগণেরই মাযহাব। এগুলো 'বিচ্ছিন্নতা নয়; বরং গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ, যা স্বয়ং গন্তব্যের মালিকের পক্ষ হতে স্বীকৃত ও অনুমোদিত। ফির্কা ও ফিকহী মাযহাবের পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ হওয়া খুবই দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়।

ইজতিহাদের পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু বিভেদ হয়নি। এই পার্থক্যের আগেও যেমন পিতাপুত্র দুই নবী এক ছিলেন, তেমনি পার্থক্যের পরও।

সাহাবায়ে কেরামের যুগেও ফিকহের মাযহাব ও ফিকহের মতপার্থক্য ছিল, অথচ তাঁরা খেয়ালখুশির মতভেদ কখনো সহ্য করতেন না। তাদের কাছে এ জাতীয় মতভেদকারীদের উপাধি ছিল 'আহলুল আহওয়া', 'আহলুল বিদা ওয়াদ দ্বলালাহ' এবং 'আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা'।

কোনো ব্যক্তি বা দল যদি শাখাগত মতভিন্নতার ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুসরণ না করে উম্মাহর মাঝে কলহ-বিবাদ ছড়ায় তাহলে সে উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাই আমাদেরকে এসব নীতি ও বিধান জানতে হবে এবং শাখাগত মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সুন্নাহ অনুসরণের এবং সুন্নাহর প্রতি দাওয়াতের মাসনুন ও মুতাওয়ারাছ তথা সুন্নাহসম্মত ও অনুসৃত পন্থা জানতে হবে। যেন ঐসব নীতি ও বিধানের বিরোধিতার কারণে বিচ্ছিন্নতার শিকার না হয়ে যাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কোনো কোনো বন্ধু বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামদের ফিকহী মাযহাবের উপর বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তির আপত্তি তুলছেন তারা একটুও চিন্তা করছেন না যে, নির্ভরযোগ্য ফিকহি মাযহাবের মতভিন্নতা সম্পূর্ণ বৈধ ও শরীয়তসম্মত। এটি নিষিদ্ধ বিভেদ বিচ্ছিন্নতার আওতাভুক্ত নয়। অন্যদিকে তারা হাদীস ও সুন্নহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারী ফিকহের মাযহাবগুলোকে হাদীসের

[533] দেখুন: সূরা আম্বিয়া (২১) :৭৮-৭৯) তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী (১১/৩০৭-৩১৯)

বিপরীতে দাঁড় করিয়ে তার সম্পর্কে লোকদেরকে বিরূপ করে এবং বৈধ মতভিন্নতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন তারা নিজেরাই বিভেদ বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত।

ফিকহি মাসায়েলের প্রকারসমূহ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর যে কোনো ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, সকল মাসায়েল মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত

১. ঐ সকল মাসাইল, যার বিধান সকল মাযহাবে এক ও অভিন্ন।

ইবাদত থেকে মীরাছ পর্যন্ত শত শত নয়; হাজার হাজার মাসআলা আছেযা 'মুজমা আলাইহি'। অর্থাৎ এসব মাসআলায় গোটা উম্মাহর;বা মুজতাহিদ ইমামগণের ইজমা রয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে ভিন্ন বিধান পাওয়া যাবে না। এসব বিষয়ে ইজমা এ কারণেই হয়েছে যে, এই বিধানগুলো হয়তো কোনো আয়াত বা মুতাওয়াতির সুন্নাহয় সরাসরি বিদ্যমান আছে। কিংবা এমন কোনো সহীহ হাদীসে আছে, যা উসূলে হাদীসের মানদন্ডে দলিলযোগ্য হওয়ার বিষয়ে হাদিস বিচারক মুহাদ্দিসদের মাঝে কোনো মতভিন্নতা নেই। অথবা সাহাবাতাবেয়ীনের যুগে কিংবা পরবর্তী ফকীহগণের মাঝে ঐ বিষয়ে ইজমা সংগঠিত হয়েছিল।

২. ঐ সকল মাসাইল, যাতে ইমামগণের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে।

এই মতভিন্নতা সম্পর্কে কিছু মানুষের মাঝে এই কুধারণা লক্ষ্য করা যায় যে, এ মতভিন্নতার সূচনা হয়েছে খায়রুল করুনের পর। অনেককে বলতে শুনা যায়; তা হয়েছে হাদীস বিষয়ে ইমামগণের অজ্ঞতা কিংবা হাদীস অনুসরণে অনীহার কারণে। অথচ ইসলামী ফিকহের ইতিহাস যারা পড়েছেন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মর্যাদা, ইলম আমল ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে যারা অবগত অথবা অন্তত ফিকহের দীর্ঘ ও দলিল প্রমাণের আলোচনা সম্বলিত কিতাবাদি অধ্যয়নের সুযোগ যাদের হয়েছে তারা জানেন, এই কুধারণা কত জঘণ্য ও অবাস্তব। বাস্তবতা এই যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে যেসব মাসআলায় মতভিন্নতা পাওয়া যায় তার অধিকাংশেই সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের যুগ থেকেই মতভিন্নতা চলে আসছে কিংবা

বিষয়টিই এমনযাতে কোনো আয়াত বা সহীহ হাদীস নেই, এমনকি এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অথবা কোনো আছারও পাওয়া যায় না। মুজতাহিদ ইমামগণ শরঈ কিয়াসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে এসব সমাধান বের করেছেন।
হ্যাঁ, ফিকহের কিতাবসমূহে হাতে গোনা কিছু মাসআলা পাওয়া যাবে, যেগুলোকে 'যাল্লাহ' (বিচ্যুতি), শায, কিংবা আলইখতিলাফু গায়রুস সায়েগ (অগ্রহণযোগ্য মতভেদ) বলা হয়। এসব মাসাআলায় কোন কোন মুজতাহিদ থেকে নিশ্চিত ভ্রান্তি হয়ে গেছে। এজন্য উসূলে ফিকহ ও উসূলে ইফতার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব মাসআলা 'মামুল বিহী ফিকহ' (আমলযোগ্য ফিকহ) ও 'মুফতা বিহী কওল' (ফতওয়া প্রদানযোগ্য সিদ্ধান্ত) নয়। কোনো মাযহাবের দায়িত্বশীল কোনো মুফতী এসব মাসআলা অনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করেন না। এ ধরনের হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র।
নামায প্রসঙ্গে হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ যাদের খোলার অভিজ্ঞতা হয়েছে, অন্তত সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী এবং মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় যারা নামাযপ্রসঙ্গ অধ্যয়ন করেছেন, অথবা শুধু যদি শরহু মাআনিল আছারেও (তহাবী শরীফ) নামাযের হাদীসসমূহ পড়ে থাকেন তাহলে তাদের জানতে বাকি থাকেনি যে, অনেক বিষয়েই হাদীস শরীফে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অথচ হাদীসের উৎস হল ওহী আর ওহীর ইলমের মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষায় স্ববিরোধিতা থাকা একেবারেই অসম্ভব। অতএব প্রকৃত বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।
দেখা যায়, এক রেওয়ায়েতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন না-করার কথা আছে তো অপর রেওয়ায়েতে আরো দুই জায়গায় তা করার কথা এসেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে আরো অধিক স্থানে করার কথা। কোথাও 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার কথা আছে, কোথাও আছে জোরে পড়ার কথা। কোথাও আমীন আস্তে বলার কথা আছে, আবার কোথাও জোরে পড়ার কথা।
কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া চাই অথচ অন্যান্য রেওয়ায়েতে এসেছে কিরাত (ফাতিহা ও সূরা) না পড়ার কথা?

কোনো হাদীসে তাশাহহুদের পাঠ একরকম, অন্য হাদীসে অন্য রকম। তদ্রূপ ছানা, তাসবীহাত, দরূদ ও দুআয়ে কুনূতেরও বিভিন্ন পাঠ রয়েছে। এ ধরনের আরো বহু বিরোধ ও বৈচিত্র্য।

তো প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল নন তারা কখনও কখনও দিশেহারা বোধ করে থাকেন। আর এটাই স্বাভাবিক। তবে বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, এখানে বাহ্যত যে বিরোধগুলো দেখা যাচ্ছে তা এজন্য সৃষ্টি হয়নি যে, -নাউযুবিল্লাহ-ওহীর শিক্ষাতেই কোনো বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। কিংবা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে স্ববিরোধী নির্দেশনা দিয়েছেন! না, কক্ষনও না।

হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধগুলোর প্রকৃত কারণ

১. সুন্নাহর বিভিন্নতা। অর্থাৎ অনেক বিষয়ে একাধিক মাসনূন তরীকা রয়েছে। এই হাদীসে যে পন্থাটা এসেছে সেটাও মাসনূন এবং অন্য হাদীসে যা এসেছে তা-ও মাসনূন। যেমন ছানাতে ‘সুবহানাকা ...’ পড়াও সুন্নাহ, আবার ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী ওয়াজজাহতু...’পড়াও সুন্নাহ। কুনূতে ‘আল্লাহুম্মাহিদনী...’ পড়াও সুন্নাহ আবার ‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা’ পড়াও সুন্নাহ। কওমাতে ‘রাববানা লাকাল হামদ’ও বলা যায়, ‘রাববানা ওয়ালাকাল হামদ’ও বলা যায়, ‘আল্লাহুম্মা রাববানা’ লাকাল হামদও বলা যায়। তদ্রূপ হাদিসে বর্ণিত অন্য দুআও পড়া যায়। সবগুলোই সুন্নাহ।

২. বহু বিরোধ এমন রয়েছে যেখানে দুটো বিষয়ই হাদীস শরীফ কিংবা কোনো শরয়ী দলীলের দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ দুটোরই উৎস সুন্নাহ, কিন্তু বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে কোনো ফকীহ তাদের একটিকে উত্তম ও অগ্রগণ্য মনে করেন আর অন্যটিকে মনে করেন বৈধ ও অনুমোদিত। আবার অন্য ফকীহ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। এটাও মূলত ‘সুন্নাহর বিভিন্নতা’রই অন্তর্ভুক্ত। রাফয়ে ইয়াদাইন [রুকুতে যাওয় এবং উঠার সময় তাকবীর বলে হাত উত্তোলন] আমীন জোরে-আস্তে পড়া; ইত্যাদি বিষয়গুলো এই শ্রেণীর।

৩. কিছু দৃষ্টান্ত এমনও রয়েছে যে, প্রথমে একটা বিষয় 'মাসনূন' বা 'মুবাহ' ছিল পরে তা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। এর স্থলে অন্য একটি পদ্ধতি প্রদান করা হয় আর প্রথম পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয় বা সেটা 'মাসনূনে'র পর্যায় থেকে 'মুবাহ' বা 'বৈধতা'র পর্যায়ে নেমে আসে। পরিভাষায় একে নাসিখ মানসূখ বলে। ইসলামের প্রথম যুগে নামাযে সালামের জওয়াব দেওয়া যেত। এটা বৈধ ছিল। তখন প্রয়োজনীয় কথা বলারও অবকাশ ছিল। কিন্তু পরে তা মানসূখ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث أن لا نكلوا في الصلاة[534].

তদ্রূপ একটা সময় পর্যন্ত রুকুতে দুই হাত একত্র করে দুই হাটুর মধ্যে রাখা ছিল মাসনূন পদ্ধতি। পরে দুই হাতের আঙুল দ্বারা দুই হাটু ধরা মাসনূন সাব্যস্ত হয়। তবে প্রথম পদ্ধতি নাজায়েয করা হয়নি।

৪. কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একটি পদ্ধতি হল সুন্নাহ আর অন্যটি করা হয়েছিল ওজরবশত। কিন্তু কেউ কেউ একেও সুন্নাহ মনে করলেন। যেমন শেষ বৈঠকে বসার একটি মাসনূন পদ্ধতি রয়েছে যা কারো অজানা নয়। আরেকটি পদ্ধতি হল যেটা মহিলাদের জন্য মাসনূন। কোনো কোনো বর্ণনায় চারজানু হয়েও বসার কথা এসেছে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক সকল হাদীস সামনে রাখলে এবং নামাযের পদ্ধতি প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ও ধারা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যায় যে, পুরুষের জন্য ওই প্রসিদ্ধ পদ্ধতিটাই মাসনূন তরীকা। অন্য পদ্ধতিগুলোও কখনো কখনো অনুসরণ করা হয়েছিল ওজরবশত কিংবা শুধু বৈধতা বোঝানোর জন্য।

৫. এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে যেখানে মাসনূন তরীকা একটিই, বিভিন্ন হাদীসে যা উল্লেখিত হয়েছে। আর ভিন্ন পদ্ধতি যা কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় সেটা সহীহ হাদীস নয়, বর্ণনাকারীর ভ্রান্তি। কিন্তু কোনটা সহীহ হাদীস আর কোনটা বর্ণনাকারীর ভুল এই সিদ্ধান্ত শুধু হাদীসবিশারদ ইমামগণই দিতে পারেন। তাঁরা যদি একমত হয়ে কোনো ফয়সালা প্রদান করেন তবে সেটাই

---

[534] সহীহ বুখারী ৪২; সুনানে আবু দাউদ ৯২০

নির্ধারিত। আর যেখানে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়, এবং অবশ্যই তা যুক্তিসংগত মতভেদ, সেখানে প্রাজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোনো এক মত অবলম্বন করবেন। সাধারণ মানুষ অনুসরণ করবেন কোনো একজনের সিদ্ধান্ত।

এবার চিন্তা করুন: এই বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা উদঘাটন করা যে, কোনটা সুন্নাহর বিভিন্নতা আর কোনটা উত্তম-অনুত্তমের পার্থক্য আর কোথায় সুন্নাহ বনাম ওজরের প্রসঙ্গ-এটা অবশ্যই দলীলের ভিত্তিতেই হতে হবে। কিন্তু এই দলীল, আলামত ও লক্ষণগুলো এত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয় যে, যে কারো পক্ষে তা অনুধাবন করা এবং তার আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এটা এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ইজতিহাদ ও ফিকহী প্রজ্ঞা অপরিহার্য। **প্রথম থেকেই এই গুরু দায়িত্ব উম্মাহর ফকীহ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের উপরই ন্যস্ত ছিল এবং এটা ফিকহে ইসলামীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ।** আর যেহেতু এই ক্ষেত্রগুলো ইজতিহাদ-নির্ভর তাই এখানে দ্বিমত সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

৬. অনেক বিষয়ে মতভেদ শুধু এজন্য হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা কোনো একটি ব্যাখ্যাকে শুধু অগ্রগণ্যই বলা যায়, এই ব্যাখ্যাটাই সুনিশ্চিত আর অন্যটা ভুল-এটা বলা যায় না। এ ধরনের ক্ষেত্রেও কিতাব ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ ফুকাহায়ে উম্মাহর (আইম্মায়ে মুজতাহিদীন) মাঝে মতভেদ হওয়া অবশ্যম্ভবী।

কোনো কোনো 'নুসূসে শরইয়্যাহ' তে (দলীলের পাঠ, আয়াত হোক বা হাদীস) একাধিক ব্যাখ্যার যে অবকাশ থাকে সেটা কখনও লুগাত বা ভাষাগত কারণে হয়। অর্থাৎ আরবী ভাষাতেই সে শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ রয়েছে। কখনও এজন্যও হয় যে, আলোচ্য বিষয়ে এই 'নস' ছাড়াও অন্যান্য দলীল ও 'নস' বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো সামনে রাখা হলে দেখা যায়, প্রথমে ওই নসের যে অর্থ বোঝা যাচ্ছিল তা আর নিশ্চিত থাকছে না। অন্য ব্যাখ্যারও অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে।

এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ ও আলামতের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন ব্যাখ্যাটা অধিক উপযোগী বা অধিক সামঞ্জস্যশীল। বলাবাহুল্য, যখন লক্ষণ বিভিন্ন হবে তো নসের ব্যাখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এ ধরনের মতভেদের দৃষ্টান্ত নবীযুগেও বিদ্যমান ছিল। যেমন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দকের যুদ্ধ)-এর মতো কঠিন গযওয়া থেকে ফিরে আসলেন এবং হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন। ইতিমধ্যে হযরত জিব্রীল আ. এসে বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর কসম! আমরা তো এখনও পর্যন্ত অস্ত্র ছাড়িনি। জলদি চলুন। এটাই আল্লাহর আদেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন দিকে যাব? জিব্রীল আ. বনু কুরাইযার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওই দিকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বের হলেন এবং হযরত বিলাল রা.-কে ঘোষণা দিতে বললেন-

من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.

'যে রাসূলুল্লাহর বাধ্য ও অনুগত সে যেন বনু কুরাইযায় যেয়েই আছরের নামায পড়ে।'

ঘোষণা শোনামাত্র সবাই অস্ত্র হাতে রওনা হয়ে গেলেন। অনেকেই সময়মতো পৌঁছে গেলেন। আর কিছু সাহাবী রাস্তায় ছিলেন। এদিকে আছরের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এঁদের মধ্যে মতভেদ হল যে, নামায কোথায় পড়া হবে। কিছু সাহাবী বললেন, আমরা সেখানেই নামায পড়ব যেখানে পড়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন। অন্যরা বললেন, রাসূলুল্লাহর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা নামায কাযা করি। শেষে কিছু সাহাবী পথিমধ্যেই নামায পড়ে রওনা হলেন, অন্যরা বনু কুরাইযায় পৌঁছে নামায পড়লেন। তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালন করেছি। অতএব আমাদের কোনো অপরাধ নেই। বর্ণনাকারী বলেন,

فصلت طائفة إيمانا واحتسابا وتركت طائفة إيمانا واحتسابا

অর্থাৎ যারা পথিমধ্যে নামায পড়েছেন তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের কারণে ছওয়াবের আশায় নামায পড়েছেন আর যারা কাযা করেছেন তারাও রাসূলুল্লাহর আদেশের উপর ঈমান ও ছওয়াবের আশায় কাযা করেছেন।

পরিশেষে এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থাপিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই ভৎর্সনা করলেন না।[535]

এই মতভেদ যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের অর্থ নির্ধারণ নিয়ে হয়েছিল এবং প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল নবীজীর আনুগত্য ও আদেশ পালন তাই কোনো দলকেই তিরস্কার করা হয়নি।

ইবনুল কাইয়েম রাহ. ‘‘যাদুল মাআদ’’ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যে, বাস্তবে কাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, যারা নামায কাযা করেননি তাদের সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক। তারা দুই ছওয়াবের অধিকারী। আর অন্যরাও যেহেতু ‘নস’-এর বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করেছেন এবং তাদেরও লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহর আনুগত্যই তাই তারা ‘মাযূর’ এবং এক ছওয়াবের অধিকারী।[536]

‘শরয়ী নস’-এর অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও সাহাবা-যুগেও মতভেদ হয়েছে এবং যেহেতু তা যুক্তিসংগত ছিল তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো উপরই আপত্তি করেননি।

প্রসঙ্গত, শরীয়তের রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা নেই তারা মতভেদ শব্দটি শোনামাত্রই ভ্রূকুঞ্চিত করেন এবং কিছুটা যেন বিব্রত হয়ে পড়েন, বিশেষত নামাযের মতো মৌলিক ইবাদতের বিষয়ে মতভেদ, যা ঈমানের পর ইসলামের সবচেয়ে বড় রোকন, তাদের পক্ষে একেবারেই যেন অসহনীয়!

তাদের জানা থাকা উচিত যে, মতভেদমাত্রই পরিত্যাজ্য নয়। কেননা কিছু মতভেদ আছে, যার প্রেরণা দলীলের অনুসরণ। স্বয়ং দলীলই ওই মতভেদের উৎস। আর কিছু মতভেদ আছে যা সৃষ্টি হয় মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে। দলীল সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা দলীলের শাসন মানতে অস্বীকৃতিই এই মতভেদের উৎস। প্রথম মতভেদ শরীয়তে স্বীকৃত আর দ্বিতীয়টা নিন্দিত। বিষয়গত দিক থেকে ঈমানিয়াত ও আকাইদ অর্থাৎ ইসলামের সকল মৌলিক আকীদা এবং শরীয়তের

---

[535] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৪১১৯; সহীহ মুসলিম ১৭৭০; সীরাতে ইবনে হিশাম খ. ৬, পৃ. ২৮২, ২৮৪

[536] যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ সা. খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯; হাদয়ুহূ ফিল আমান

সকল অকাট্য মাসআলা ওই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে দলীলভিত্তিক কোনো ইখতিলাফ-মতভেদ হতেই পারে না। এজন্য দেখবেন, এসব বিষয়ে আইম্মায়ে দ্বীনের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এক্ষেত্রে কেউ মতভেদ করলে তা অবশ্যই হঠকারিতা। আর ওই মতভেদকারী হয় মুবতাদি (বিদআতী) কিংবা মুলহিদ (বেদ্বীন) কিন্তু ফুরূয়ী মাসাইল, এতেও শ্রেণীভেদ রয়েছে, এর ধরনটা ভিন্ন। এখানে দলীলভিত্তিক মতভেদ হতে পারে এবং হয়েছে। শরীয়তে এটা স্বীকৃত এবং শরীয়তই একে বহাল রেখেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং সাহাবা ও তাবেয়ীন যুগেও এটা ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এই মতভেদের বিষয়ে শরীয়তের বিধান হল তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা ভুল এবং একে বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যম বানানো অপরাধ। দলীলভিত্তিক মতভেদ স্বীকৃত; বরং নন্দিত, কিন্তু বিবাদ-বিসংবাদ হারাম ও নিষিদ্ধ।

এই শ্রেণীর ফুরূয়ী ইখতিলাফ (শাখাগত বিষয়ে মতভেদ) প্রকৃতপক্ষে গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ। সিরাতে মুস্তাকীমেরই বিভিন্ন পথরেখা। এগুলোর কোনোটাকেই প্রত্যাখ্যান করা কিংবা অনুসরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এটা ইলাহী নীতির বিরোধী, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যবান মুবারকে উচ্চারিত হয়েছে-

كلاكما حسن فاقرءا فما عنف واحدا من الفريقين

'দুজনই সঠিক, অতএব পড়তে থাক।' অতঃপর কোনো দলকেই তিনি ভৎর্সনা করলেন না।[537]

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, এই মতভেদ বিদ্যমান রাখার তাৎপর্য কী, তাহলে এর সুনিশ্চিত ও বিস্তারিত উত্তর তো আখিরাতেই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জানা যেতে পারে। অভিন্ন গন্তব্যের জন্য বিভিন্ন পথ কেন নির্দেশ করলেন, সিরাতে মুস্তাকীমে বিচিত্র পথ-রেখার সমাবেশ কেন তিনি ঘটালেন? তিনি কি ইচ্ছা করলে সিরাতে মুস্তাকীমের একটিমাত্র ধারাই জারি করতে পারতেন না? অবশ্যই

[537] সহীহ বুখারী ৫০৬২

পারতেন। কিন্তু এখানে রয়েছে প্রজ্ঞার অতল গভীরতা, যার সবটা জেনে ফেলার আকাঙ্খাই হাস্যকর। তবে যতটুকু তিনি বান্দাদের সামনে প্রকাশ করেছেন তা-ও প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দান করুন। এবং সুন্নাহের ভিত্তিতে উম্মাহর ঐক্য বা জামাআহ রক্ষা করার তাওফিক দান করুন। আমিন

বিস্তারিত দেখুন…[538]

¤ [538] কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য (ডা.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রাহি.)

¤ http://assunnahtrust.com/product/quran-sunnahr-aloke-jamat-o-okko/

¤ উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা (শায়খ আব্দুল মালেক হাফি.)

¤ পর্ব ১ https://www.alkawsar.com/bn/article/590/

¤ পর্ব ২ https://www.alkawsar.com/bn/article/632/

¤ পর্ব ৩ https://www.alkawsar.com/bn/article/762/

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন,

وَنَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

‘যে সব বিষয়ে; আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট সে সব বিষয়ে আমরা বলব, ‘‘আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অধিক জানেন।’

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ.

‘সফরে ও নিজ বাসস্থানে অবস্থানকালে; আমরা মোজার উপরে মাসেহ করার পক্ষে মত প্রদান করি। যেমন হাদীসে এর উল্লেখ এসেছে’

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا.

‘হজ্ব-জিহাদ দুটিই ফরয; যা মুসলিম শাষকের অধীনে কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে; চাই সে সৎকর্মশীল হোক বা অসৎকর্মশীল। এ দু’টি জিনিসকে কোনো কিছুই বাতিল কিংবা রহিত করতে পারবে না। ’

وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ

‘আমরা কিরামান-কাতিবীন (সম্মানিত লেখকবৃন্দ) ফেরেশ্তাদের ওপর ঈমান রাখি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমাদের ওপর পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।’

وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ، الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ.

‘আমরা মালাকুল মাউতের (মৃত্যুর ফিরিশতার) ওপরও ঈমান রাখি। যাকে সৃষ্টিকুলের রূহসমূহ কবয করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।’

وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ، عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَعَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .

‘আমরা শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য কবরের আযাব ও তার শাস্তির প্রতি ঈমান রাখি এবং এও ঈমান রাখি যে, কবরের মুনকার ও নাকীর (দুই ফিরিশতা) মৃত ব্যক্তির রব, দ্বীন, ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের নিকট থেকে বহু হাদীস ও উক্তি বর্ণিত হয়েছে।’

وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ .

‘কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহ হতে একটি উদ্যান অথবা তা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত।’

وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ

‘আমরা পুনরুত্থান, কিয়ামাত দিবসে আমলের প্রতিফল, (আল্লাহর সমীপে) পেশ করা, হিসাব নিকাশ, আমলনামা পাঠ, সওয়াব, (প্রতিদান) শাস্তি, পুলসিরাত এবং মীযান এসবের উপর ঈমান রাখি।’

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ، لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ، وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ، وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ، وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فَرِغَ لَهُ، وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ.

‘(আরও ঈমান রাখি যে,) জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতে সৃষ্ট হয়ে আছে। এ দু’টি কোনো দিন লয় প্রাপ্ত হবে না এবং ক্ষয় প্রাপ্তও হবে না। আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত ও জাহান্নামকে অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্য বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর তা হবে তার ন্যায় বিচার। প্রত্যেকেই সেই কাজ করবে যা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানেই সে যাবে।

وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ.

> ‘ভালো ও মন্দ উভয়ই বান্দার জন্য নির্দিষ্ট করে লেখা হয়েছে।’

وَالِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ، فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ، وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .

> ‘‘সামর্থ্য’’- (যা প্রত্যেক কর্মের জন্য অপরিহার্য। আর তা) দু’ধরণের- (১) যে সামর্থ্য বান্দার কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট (কর্ম বাস্তবায়িত করার সময় থাকা অপরিহার্য) যেমন কাজটির তাওফীক (যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ) তা কোনো সৃষ্টির গুণ হতে পারে না, (বরং তা কেবল আল্লাহর হাতে আর তাঁরই গুণ) এ ধরনের সামর্থ্য কেবল কার্য সম্পাদনের সময়েই অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে (২) যে ‘‘সামর্থ্য’’ বলতে বুঝায় বান্দার সুস্থতা, সচ্ছলতা, সক্ষমতা, অঙ্গ প্রতঙ্গের নিরাপত্তা, তা অবশ্যই কর্মের পূর্বেই থাকা প্রয়োজন আর এটার সাথেই তাকলীফ (তথা বান্দার জন্য আল্লাহর নির্দেশনা) সম্পৃক্ত। (অর্থাৎ এটা থাকলেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধ তার উপর প্রযোজ্য হয় নতুবা নয়) আর এটা যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,
>
> لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ

‘‘তিনি কাউকে তার সামর্থ্যের উর্ধ্বে দায়িত্ব দেন না।’’ সূরা আল-বাকারা, ২৮৬

وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ، وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ

বান্দাদের যাবতীয় কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি এবং তা বান্দাদের উপার্জন।

وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، وَهُوَ تَفْسِيرُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ". نَقُولُ: لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا حَرَكَةَ لِأَحَدٍ، وَلَا تَحَوُّلَ لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللَّهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ .

'আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর তাদের সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। আর তারাও ততটুকুই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে যতটুকু বোঝা আল্লাহ তাদের উপর চাপিয়ে থাকেন। আর এটাই হচ্ছে

لا حول ولا قوة إلا بالله

''আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো সৎ কর্ম করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা কারও নেই।'' এ বাণীর তাফসীর বা ব্যাখ্যা।'

'এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য ছাড়া কারো কোনো অপরাধ থেকে বাঁচার এবং নড়া-চড়া করার ক্ষমতা নেই। অনুরূপভাবে, আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য বরণ করার এবং তার উপরে দৃঢ় থাকার সাধ্য কারও নেই। '

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا، وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الْحِيَلَ كُلَّهَا، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾

'পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ফায়সালা এবং তাঁর বিধান অনুসারেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা সমস্ত ইচ্ছার উপরে। তাঁর ফায়সালা সমস্ত কৌশলের উর্ধ্বে। যা ইচ্ছা তিনি তাই করেন। তিনি কখনও অত্যাচার করেন না। তিনি সর্ব প্রকার কলুষ ও কালিমা হতে পবিত্র এবং সব রকমের দোষ ত্রুটি হতে বিমুক্ত। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। পক্ষান্তরে, অন্য সবই স্বীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[539]

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ.

'জীবিত ব্যক্তিদের দো'আ এবং দান-খয়রাত দ্বারা মৃত বক্তিরা উপকৃত হয়ে থাকে।'

---

[539] সূরা আল-আম্বিয়া ২৩

وَاللَّهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ .

> ‘আল্লাহ তা‘আলা দো‘আ কবুল করেন এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন।’

وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ، وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ .

> ‘আল্লাহ তা‘আলা সব কিছুরই মালিক এবং তাঁর মালিক কেউ নয়। মুহূর্তের জন্যও কারো পক্ষে আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মুহূর্তের জন্য আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হতে চাবে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং লাঞ্ছিত হবে।’

وَاللَّهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى، لَا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى.

‘আল্লাহ তা‘আলা ক্রুদ্ধ এবং রুষ্ট হন, তবে তা মাখলুকের ন্যায় নয়।’

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ نُفْرِطُ في حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُم؛ وَلاَ نَتَبَرَّأَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُم، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نُذْكُرُهُم إِلاَّ بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُم دِينٌ وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ.

> ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসি, তবে তাদের কারও ভালোবাসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কারও থেকে বিমুক্তি ঘোষণা করি না। তাদের সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা যারা তাদেরকে অসম্মানজনকভাবে স্মরণ করে আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। আমরা তাদেরকে শুধু কল্যাণের সাথেই স্মরণ করি। তাদের সঙ্গে মহব্বত রাখা দীন ও ঈমান এবং ইহসানের অংশ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, কুফুরী, মুনাফিকী এবং সীমালংঘন করার পর্যায়ভুক্ত।’

وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، ثُمَّ لِعُثْمَانَ رضي الله عنه، ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ .

> ‘আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বপ্রথম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খেলাফতকে স্বীকৃতি দেই। অতঃপর পর্যায়েক্রমে উমর ইবন খাত্তাব, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমকে খলীফা বলে স্বীকার করি। তারাই ছিলেন সুপথগামী খলীফা ও হিদায়াতপ্রাপ্ত নেতা।’

وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ.

> ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের সম্পর্কে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। কারণ, এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দান করেছেন এবং তাঁর উক্তি সত্য। তাঁরা হলেনঃ (১) আবু বকর রাযি. (২) উমর রাযি. (৩) উসমান রাযি. (৪) আলী রাযি. (৫) তালহা রাযি. (৬) যুবাইর রাযি. (৭) সা‘দ রাযি. (৮) সা‘ঈদ রাযি. (৯) আবদুর রহমান ইবন আউফ রাযি. (১০) আমীনুল উম্মাহ (জাতির বিশ্বাসভাজন) আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম (আল্লাহ তাদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন)

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

> যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ও সম্মানিত বংশধরদের সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করে সে মুনাফিকী থেকে নিষ্কৃতি পায়।’

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ -أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ-، لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ

> ‘পূর্বে গত হওয়া সালাফে সালেহীন (নেককার পূর্বসূরী) আলেমগণ এবং তাঁদের যথাযথ পদাঙ্ক অনুসারী কল্যাণের অধিকারী হাদীসবিদগণ ও ফিকহের জ্ঞানের অধিকারী গবেষকগণকে আমরা যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি আর যারা এদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তারা সঠিক পথের পথিক নয়।’

وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَام، وَنَقُولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ .

وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ.

> <u>‘আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর ওপর প্রাধান্য দেই না বরং আমরা বলি, যে কোনো একজন রাসূল সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ। ওলীদের কারামত সম্পর্কে যে খবরাখবর আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং যা বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আমরা তার উপর ঈমান রাখি।’</u>

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ: مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّال، ونُزُولِ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّماءِ، وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

> **<u>‘আমরা কিয়ামাতের নিম্নলিখিত নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান রাখি: দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ আর আমরা পশ্চিম গগনে সূর্যোদয় এবং দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর স্বীয় স্থান হতে আবির্ভাবের ওপরও ঈমান রাখি’</u>**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূচী

- কিয়ামাতের আলামত সমূহের প্রকার
- বড় আলামত সমূহ
- ছোট আলামত সমূহ

কিয়ামাতের আলামত সমূহের প্রকার

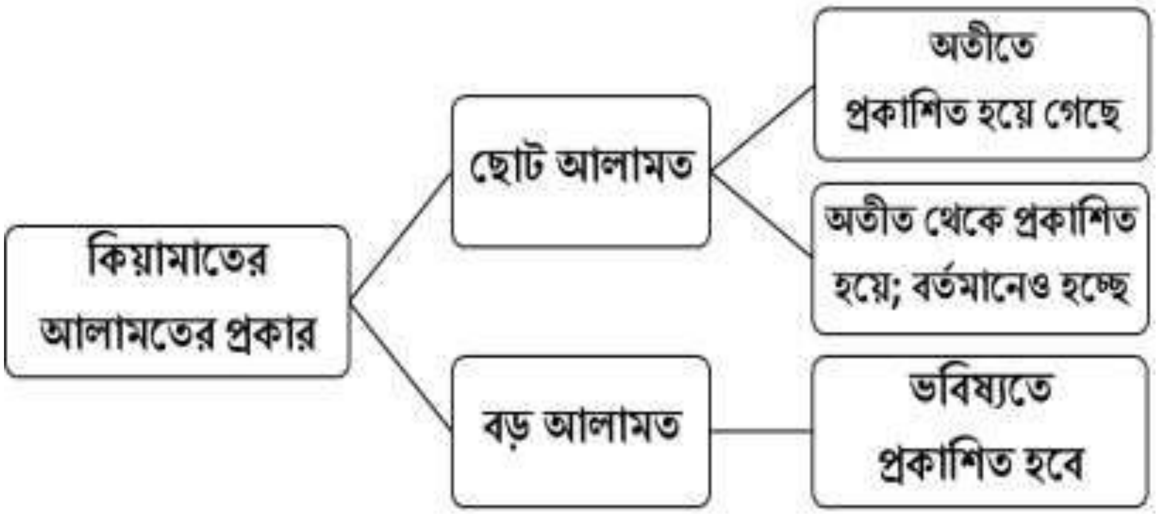

বড় আলামত সমূহ

হযরত হুযায়ফা রাঃ বলেন: আমরা পরস্পর আলাপ রত অবস্থায় ছিলাম, নবী করীম সাঃ এসে জিজ্ঞাসা করলেন; তোমরা কী প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে?

قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان، والدجال، ..…تطرد الناس إلى محشرهم"

সবাই বলল; কিয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবী করীম সাঃ এরশাদ করলেন" কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি (বড়) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করবে,

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ, কাবা শরীফ ধ্বংস এবং মানুষের অন্তর থেকে কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নেয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

ছোট আলামত > অতীতে প্রকাশিত হয়ে গেছে

1) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর আগমণ ও মৃত্যু বরণ।

2) চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া।

3) বায়তুল মাকদিস (ফিলিস্তীন) বিজয়।

4) ভন্ড ও মিথ্যুক নবীদের আগমণ।

5) হেজায অঞ্চল থেকে বিরাট একটি আগুন বের হওয়া[540]

অতীতে প্রকাশিত হয়ে; বর্তমানেও হচ্ছে[541]

বিভিন্ন হাদিস থেকে নেওয়া অন্যতম কয়েকটি হলো,

6) কিয়ামতের পূর্বে অনেক ফিতনার আবির্ভাব হওয়া। নানারকম গোলযোগ (ফিতনা) সৃষ্টি হওয়া। যেমন ইসলামের শুরুর দিকে উসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া, জঙ্গে জামাল ও সিফফিন এর যুদ্ধ, খারেজিদের আবির্ভাব, হাররার যুদ্ধ, কুরআন আল্লাহর একটি সৃষ্টি এই মতবাদের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি।

7) ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া

8) আমানতের খেয়ানত হবে

9) দ্বীনী ইল্ম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে

10) অন্যায়ভাবে যুলুম-নির্যাতনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

11) যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে

12) সুদখোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

13) গান বাজনা এবং গায়িকার সংখ্যা বেড়ে যাবে

14) মদ্যপান হালাল মনে করবে

15) মসজিদ নিয়ে লোকেরা গর্ব করবে

---

540 সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি ৬৫৪হিঃ তে এই আগুন প্রকাশিত হয়েছে। এটা ছিল মহাঅগ্নি। তৎকালীন ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এই আগুনের বিবরণ দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

541 এখানে মাত্র 50 টির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; আরো বিস্তারিত দেখতে ড. আব্দুর রহমান আরেফী হাফি. এর ‘মহাপ্রলয়‘ বইটি দ্রষ্টব্য।

16) দালান-কোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে

17) দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে[542]

18) মোহরের মূল্য বৃদ্ধি অত.পর হ্রাস

19) দ্রুত গতিতে সময় পার

20) মুসলমানেরা শিরিকে লিপ্ত হবে

21) ঘন ঘন বাজার হবে

22) সকালে মুমিন কিন্তু বিকালে কাফির হয়ে যাবে; এমন কালের আগমন

23) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে

24) লোকেরা কালো রং দিয়ে চুল-দাড়ি রাঙ্গাবে

25) কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে

26) ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে

27) ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে

28) ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির শাস্তি দেখা দিবে

29) পরিচিত লোকদেরকেই সালাম দেয়া হবে

30) বেপর্দা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

31) মুমিনের স্বপ্ন সত্য হবে

32) সুন্নাতী আমল সম্পর্কে গাফিলতী করবে

33) মিথ্যা কথা বলার প্রচলন বৃদ্ধি পাবে

34) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন ঘটবে

35) মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে

36) হঠাৎ মৃত্যুর বরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

37) আরব উপদ্বীপ নদ-নদী এবং গাছপালায় পূর্ণ হয়ে যাবে

38) প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, ফসল হবেনা

---

[542] এই মর্মে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। এই হাদিসের অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। ইবনে হাজার যে অর্থটি নির্বাচন করেছেন সেটি হচ্ছে- সন্তানদের মাঝে পিতামাতার অবাধ্যতা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়া। সন্তান তার মায়ের সাথে এমন অবমাননাকর ও অসম্মানজনক আচরণ করা যা একজন মনিব তার দাসীর সাথে করে থাকে।

39) ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় বের হবে
40) জড় পদার্থ এবং হিংস্র পশু মানুষের সাথে কথা বলবে
41) ফিতনায় পতিত হয়ে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে
42) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রয়োগ পরিত্যাগ
43) স্যাটেলাইট-টিভি চ্যানেলের আবির্ভাব
44) সমাজের উচ্চ পদস্থ ব্যাক্তি কর্তৃক গরিবদের মাল-সম্পদ কৌশলে লুট
45) কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ
46) ছোট ও স্বল্প জ্ঞানীদের কাছে ইলম অন্বেষন
47) কুরআন ছেড়ে অন্যান্য গ্রন্থাদির প্রসার
48) ব্যাপকহারে লেখালেখি ও পুস্তক প্রসার
49) মায়ের অবাধ্য হয়ে স্বামী স্ত্রীর আনুগত্য করবে
50) মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে সকল কুফর বিধর্মী রাষ্ট্রের অবস্থান

আক্বিদাতুত ত্বাহাবী

وَلاَ نُصَدِّقُ كَاهِناً وَلاَ عَرَّافاً، وَلاَ مَنْ يَدَّعِي شَيْئاً يُخَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ وإجْمَاعَ الأُمَّةِ.

'আমরা কোনো ভবিষ্যৎ বক্তা অথবা কোনো জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না এবং ঐ বক্তিকেও সত্য বলে মনে করি না, যে আল্লাহর কিতাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে।'

وَنَرَى الجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَاباً، والفُرْقَةَ زَيْغاً وَعَذاباً.

'আমরা (মুসলিম জাতির) ঐক্যকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং তা হতে বিচ্ছিন্নতাকে বক্রতা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করি'

وَدِينُ الله في الأرضِ وَالسَّماءِ وَاحِدٌ، وهُو دينُ الإسْلاَمِ، قال الله تعالى 'إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وقال تعالى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর দীন এক ও অভিন্ন। তা হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ

''নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।'' [সুরা আলে ইমরান, ১৯]

অন্যত্র তিনি আরও বলেন,

وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا

''এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম''[543]

وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْيَأسِ .

'ইসলাম মধ্যপন্থী দীন। (নবী-রাসূল, সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ ও শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে) বাড়াবাড়ি ও কমতির মাঝামাঝি তার অবস্থান, (আল্লাহর সত্তা,

---

[543] সূরা আল-মায়েদা, ৩

নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সেগুলোতে তাশবীহ তথা) সাদৃশ্য স্থাপন কিংবা (সে নাম ও গুণগুলোকে তা‘তীল তথা) অর্থহীন করার মাঝে তার অবস্থান, (সৃষ্টিকুলের তাকদীরের ব্যাপারে তাদেরকে জবর তথা) ক্ষমতাহীন বাধ্য ও (কাদর তথা) নির্ধারণহীন মুক্ত এ দু’য়ের মাঝে তার অবস্থান। অনুরূপ (আল্লাহর ভয় ও ক্ষমার ব্যাপারে) নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মধ্যবর্তীতে তার অবস্থান।’

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بُرَآءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ .

‘এগুলোই হচ্ছে আমাদের দীন এবং আমাদের আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাস। প্রকাশ্যে এবং অন্তরে তাই আমরা ধারণ করি। উপরে যা আমরা উল্লেখ করলাম এবং বর্ণনা করলাম যারাই তার কোনো কিছুর বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই।’

وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ، وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ، وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ، مِثْلَ الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَحَالَفُوا الضَّلَالَةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَآءٌ، وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَاءُ .

‘আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং আমাদের জীবনাবসান ঈমানের সাথে করেন। আর তিনি যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন বিভিন্ন প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও বিবিধ মতামতের অনুসরণ থেকে এবং মুশাব্বিহা, মু‘তাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, ক্বাদরিয়া প্রভৃতি বাতিল মতবাদসমূহ থেকে। যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং যারা বিভ্রান্ত মত ও পথের পক্ষ নিয়েছে আমরা তাদের থেকে আমাদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি। তারা আমাদের মতে পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট।’

وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ

‘আল্লাহর নিকটেই যাবতীয় ভ্রান্তি হতে নিরাপত্তা এবং সৎপথে চলার তাওফীক কামনা করছি।’